এই লেখকের

উপন্যাস

মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
মানুষ গড়ার কারিগর
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি !
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমাব ফাঁসি হল

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোবিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

নাটক

নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো (দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত)

গল্প

গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
মায়াকন্যা
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের ?
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২
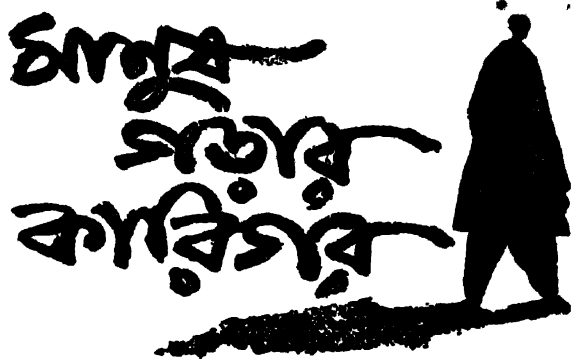
দ্বিতীয় মুদ্রণ—জুলাই, ১৯৬০
প্রথম প্রকাশ—মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

প্রচ্ছদ-চিত্র
শ্রীকানাই পাল

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

শ্রীমান মনীষী ও শ্রীমতী নন্দিতাকে

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৬৬

॥ এক ॥

সে কি আজকের কথা ?

মহিম বি. এ. পাশ করলেন। অঙ্কে অনার্স পেয়েছেন। মহিমা-রঞ্জন সেন বি. এ. (হনস্)। নামের শেষে লেখে না কেউ এসব, রেওয়াজ উঠে গেছে। কিন্তু য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রি—লিখবার এক্তিয়ার আছে ষোলআনা।

গাঁয়ের ছেলে, আলতাপোল গ্রামে বাড়ি। পাশও করেছেন মফস্বল-শহর থেকে। খবর বেরুনোর পরে পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি থেকে পায়েসটা তালক্ষীরটা খাবার নিমন্ত্রণ আসছে। মা বললেন, এত দিনের কষ্ট সার্থক হল বাবা। কাজটাজ ধরতে হবে এইবারে একটা। পায়েস-পিঠে খেয়ে হাসিখুশিতে যাতে চিরকাল কাটে। চাকরির যোগাড় দেখ—যেমন তেমন চাকরি ঘী-ভাত। মাছনার সাতু ঘোষ বাপের শ্রাদ্ধে বাড়ি এসেছে, তার কাছে যা একদিন। সে যদি কিছু করে দেয়।

সাতকড়ি ঘোষ কলকাতায় থাকেন। নানা রকমের ব্যবসা, সেই সূত্রে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম। রোজগারও ভাল—বাপের শ্রাদ্ধের আয়োজন দেখে বোঝা যাচ্ছে। চার গ্রামের সমাজ ডেকে বসেছেন। এ হেন সাতু ঘোষ চেষ্টা করলে কোন একখানে কি লাগিয়ে দিতে পারবেন না ? ঠিক পারবেন।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটলে মহিম একদিন গেলেন মাছনায় সাতু ঘোষের কাছে। শুনে সাতু ঘোষ মহিমের পিঠে সশব্দে এক থাবা ঝেড়ে বললেন, সাবাস! আমাদের গৌরব তুমি, ফার্স্টক্লাস অনার্স পেয়েছ। আমার সঙ্গে চল, আমার কাছে থাকবে। কোন চিন্তা নেই। ও মা, ও পিসিমা, ও মেজদিদি, দেখে যাও তোমরা। খুশিটা গেল কোথায়, একটু চা করে দিলেও তো পারে। ও, তুমি চা খাও না ? তবে

থাক। দেখ মা, বি. এ. পাশ করেছে এই ছেলে অনার্স নিয়ে। বিদ্যের জাহাজ। আর চেহারাটাও দেখ—রাজপুত্তুর। এক্সারসাইজ করে থাক ঠিক—ডাম্বেল, মুগুর, হরাইজেণ্টাল-বার? নয়তো এমন চেহারা খোলে না। আছি আমি আরও হপ্তা দুই। কারো গোলামি করি নে, ইচ্ছাসুখে ঘুরে বেড়াব। যাবার আগে তোমায় খবর দেব। একসঙ্গে যাব দু-জনে।

এতেই হল না। একদিন সকালবেলা সাতকড়ি হাঁটতে হাঁটতে নিজে চলে এলেন আলতাপোলে। মহিমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলেন: খুড়িমা, কাজেকর্মে শহরে পড়ে থাকি। অনেক দিন পরে পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি এলাম। তারপরে কেমন আছেন আপনারা সব?

মহিমের মা পিঁড়ি পেতে বসতে দিলেন। ছেলের কথা তুললেন: তুমি বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। চেষ্টা করে যদি একটা কাজকর্ম করে দিতে পার।

পরশু যাচ্ছি, সেই খবরটাই দিতে এলাম। বলি, লোক পাঠিয়ে খবর দেবার কি, নিজে যাই না কেন হাঁটতে হাঁটতে। খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে সামনাসামনি কথাবার্তা বলে আসি। আপনি বোধ হয় জানেন না খুড়িমা, কলকাতায় গিয়ে প্রথম আমি রঙ্গলাল কাকার বাসায় উঠি। মুখ্যু মানুষ আমি, 'ক' অক্ষর গোমাংস—তবু যে অমন শহর জায়গায় করে খাচ্ছি, গোড়ায় তাঁর খুব সাহায্য পেয়েছিলাম সেই জন্য। সে কথা ভুলতে পারি নে। তিনি রান্না করতেন, আমি কলতলায় জল ধরে আনতাম, বাটনা করতাম। এনামেলের ডিসে ভাত বেড়ে খেতাম দু-জনে। উঃ, আজকের কথা! মহিম তখনও পাঠশালায় যাবার মতো হয় নি। তারপরে রঙ্গলাল কাকা একটা কাঠের আড়তে ঢুকিয়ে দিলেন। তিন টাকা মাইনে আর খাওয়া। আমি লোকটা মুখ্যু হই যা-ই হই, উপকারের কথা মনে রাখি। সেই কাঠের আড়তের সঙ্গে সম্পর্ক আজও বজায়

আছে, তাদের দিয়ে অনেক কাজকর্ম করাই। মহিমকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, নিজের কাছে রাখব। আমারও একজন শিক্ষিত লোকের দরকার। ব্যবসা বড় হয়ে যাচ্ছে, নানান জায়গায় ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে হয়। আজকালকার ব্যবসায়ে অনেক রকম ব্যাপার —বাইরের লোককে ঘাঁতঘোত কেন শেখাতে যাব? নিজের লোক পেয়ে গেলাম, ভাল হল।

একগাদা কথার তুফান বইয়ে দিয়ে সাতু ঘোষ উঠলেন। মহিমের বিধবা বড় বোন সুধা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেন, এত খাতির কি জন্যে বুঝতে পার মা?

উনি যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, পরের জন্য বিস্তর করে গেছেন। ওঁর কাছে সাতু ঘোষ উপকার পেয়েছিল।

সুধা হেসে বলেন, উঁহু। কবে ঘী খেয়েছে, সেই গন্ধ বুঝি এতকাল লেগে থাকে মা। সাতুর এক সোমত্ত ছোট বোন আছে, খুশি-খুশি করে সবাই ডাকে, সেই মেয়ে গছাবার তালে আছে। পশ্চিম-বাড়ির ছোটবউ হল মাছনার মেয়ে। তার কাছে সমস্ত শুনলাম। খাঁদা-নাক চ্যাপসা গড়নের মেয়ে, রং কালো—

মা ঘাড় নেড়ে বলেন, সে হবে না। কিছুতে নয়। এক ছেলে আমার। তোমাদেরও একটি ভাজ। টুকটুকে বউ ছাড়া ঘরে আনব না। সাতু ঘোষ যতই করুক, এ কাজ হবে না। যাক গে, এখন রা কাড়বে না কেউ। বিয়ের কথাবার্তা মুখের আগায় আনবে না। চলে যাক মহিম, কাজকর্মে লেগে পড়ুক। তার পরে ওসব।

সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম রওনা হয়ে গেলেন। বাপ রঙ্গলাল কলকাতায় থাকতেন। নানান ঘাটের জল খেয়ে হাইকোর্টের এক বাঙালি জজের বাড়ি স্থিতি হয়েছিল তাঁর অবশেষে। কায়েমি ভাবে থাকলেন সেখানে। অনেকগুলো বাড়ি জজ সাহেবের—বাড়ি-ভাড়া আদায়, বাড়ি মেরামত, বাড়ি সম্পর্কিত মামলা-মকদ্দমা, এইগুলো প্রধান কাজ। বাড়তি ঘরোয়া কাজকর্মও ছিল, জজগিন্নি বড়

ভালবাসতেন রঙ্গলালকে, তাঁর অনেক ফাইফরমাশ থাকত। রঙ্গলাল যখন দেশে আসতেন স্ত্রীর জন্য শাড়ি-সিঁদুর-আলতা কিনে দিতেন জজগিন্নি।

ছেলে হল না, বংশলোপ হয়ে যায় বলে মনে দুঃখ। অবশেষে বুড়া বয়সের ছেলে মহিম। মহিমের বয়স যখন ছয়, চাকরি ছেড়ে সাংঘাতিক অসুখ নিয়ে রঙ্গলাল আলতাপোল চলে এলেন। জ্বর, কাশি, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ওঠে—কেউ বলে রক্তপিত্ত, কেউ বলে যক্ষ্মা। বছর দুই ভুগে নাবালক ছেলে এবং দুই অবিবাহিত মেয়ে রেখে তিনি চোখ বুঁজলেন। তারপরে সেনগিন্নি দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে বি. এ. অবধি পড়ালেন। বুদ্ধিমতী এবং শক্ত মেয়েমানুষ তিনি। সেইজন্যে পেরেছেন।

রঙ্গলাল সেন—যিনি বলতে গেলে কলকাতার উপর জীবন কাটিয়ে গেছেন—তাঁরই বি. এ. পাশ-করা ছেলে মহিম শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। চোখে বুঝি পলক পড়ে না।

সাতু ঘোষ বলেন, হল কি তোমার?

এত মানুষজন যাচ্ছে কোথায়?

সাতকড়ি অবাক হলেন। বি. এ. পাশ করল—কলকাতায় না আসুক, এতাবৎ কালের মধ্যে লোকের মুখেও শোনে নি শহর-কলকাতা কি বিরাট বস্তু!

হাসি চেপে নিয়ে বললেন, যাচ্ছে ওরা রথের মেলায়।

হাঁদারাম তবু ধরতে পারেন নি। বিড়বিড় করে হিসাব করে নিয়ে বললেন, রথ এখন কোথায়? আরও তো এক মাসের উপর বাকি।

সাতু ঘোষ বলেন, নিত্যিরোজ রথের মেলা এই শহরে। বারোমাস, তিরিশ দিন।

মনে মনে হতাশ হলেন তিনি। একেবারে উৎকট গেঁয়ো—এ মানুষকে দিয়ে ব্যবসার কাজ কদ্দুর হবে কে জানে!

মেসে থাকেন সাতু ঘোষ। জাঁদরেল নাম মেসের—ইম্পিরিয়াল লজ। রাস্তার উপরের ছোট একখানা ঘর সম্পূর্ণ নিয়ে সাতু ঘোষ আছেন। সেই রাস্তার দরজার উপর তাঁর নিজস্ব আলাদা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড : ঘোষ এণ্ড কোম্পানি, কণ্ট্রাক্টর্স, বিলডার্স, ব্যাঙ্কার্স, জেনারেল মার্চাণ্টস, অর্ডার সাপ্লায়ার্স—ছোট অক্ষরে হিজিবিজি আরও অনেক সব লেখা। যত রকম ব্যবসার কথা মানুষের মাথায় আসে, লিখতে বোধ হয় বাকি নেই। সাতু বলেন, কেন লিখব না? সাইনবোর্ডের মাপ হিসাবে দাম। কথা দুটো বেশি হল কি কম হল, দামের তাতে হেরফের হয় না।

সরু একটা দরজা দিয়ে ভিতরের উঠানে ঢুকে সাতকড়ি ওদিককার দরজার চাবি খুলে ফেললেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন : ও ঠাকুর, ফ্রেণ্ড আছে আমার একজন। পার্মানেণ্ট ফ্রেণ্ড। খেয়াল রেখো।

ঘরে ঢুকে বাইরের দিককার দরজা খুললেন না। বলেন, রাতের বেলা এখন শয়নকক্ষ। দিনমানে অফিস—সেই সময় ও-দরজা খুলি। বাইরের লোকজন আসে।

চেয়ারগুলো ঠেলে ঠেলে একপাশে করছেন। একটুখানি জায়গা বেরুল। মাদুর পেতে ফেললেন মেঝেয়। বালিশ-চাদর কাঠের আলমারির ভিতরে থাকে, তা-ও বেরুল।

বলছেন, ঘর একেবারে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি দুখানা ঘর হলে হয়—একটায় অফিস, একটা বেডরুম। তোমায় বলব কি ভাই, চার বচ্ছর আজ পা লম্বা করে শুই নি। সরিয়ে ঘুরিয়ে বিস্তর দেখেছি, এর বেশি আর জায়গা বেরোয় না। বাড়ি গিয়ে এদ্দিন পরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচলাম।

মহিম সবিস্ময়ে বলেন, কিন্তু যে দিকে তাকাচ্ছি শুধুই তো বাড়ি। ভাবছি, এত ইট পেল কোথায়? তবু বলছেন, লোকের ঘর জোটে না?

লোকও যে পোকার মতন কিলবিল করছে। কত লোক ফুট-

পাথে পড়ে থাকে, রাত্তিরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে দেখো। বেরতেও হবে তো মাঝে মাঝে।

খাওয়াদাওয়া সেরে পান চিবাতে চিবাতে সাতকড়ি মহিমের জায়গা দেখিয়ে দেন : আমার পাশে ঐখানটায় তুমি গড়িয়ে পড়। বাব্বা, ছাতি যা চওড়া—চিৎ হয়ে শুলে তো পাক্কা দু-হাত ভুঁই লেগে যাবে তোমার। মুশকিল! টেবিলটা আরও একটু ঠেলে দাও দিকি। কাজকর্ম সেরে শুতে শুতে ক-ঘণ্টাই বা বাকি থাকে! কত লোকে তো বসে বসেই ঘুমোয়। সেই রকম মনে করে নাও। তারপরে মা গন্ধেশ্বরী আর বাবা গণেশের দয়ায় ব্যবসায়ে উন্নতি হয় তো তখন দু-পাশে দুই পাশবালিশ নিয়ে গদিয়ান হয়ে শোব। কি বল?

সাইনবোর্ডে ভারি ভারি কাজকারবারের নাম দেখে মহিম ভেবেছিলেন না জানি কত বড় ব্যাপার। শোওয়ার গতিক দেখে মুষড়ে গেলেন। শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, অনেক কথা শুনলেন ব্যবসা সম্পর্কে। হাতেগাঁটে একটি পয়সা এবং পেটে একফোঁটা বিদ্যে না নিয়ে শুধুমাত্র অধ্যবসায়ের জোরে সাতু ঘোষ এতদূর গড়ে তুলেছেন। আশা পর্বতপ্রমাণ বলেই সাইনবোর্ডে বড় বড় কাজের ফিরিস্তি। একদিন ঐ সমস্ত করবেন নিশ্চয়ই, সাইনবোর্ডের লেখা ষোলআনা সত্য হবে। মহিমের মতো শিক্ষিত আপনার লোক পাবার পরে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। আপন লোকের এই জন্য দরকার যে ব্যবসায়ের গুহ্যকথা মরে গেলেও বাইরে চাউর হবে না। কলকাতা শহর হল চালিয়াতের জায়গা—খদ্দের চালিয়াত, ব্যবসাদার চালিয়াত, দালাল-মহাজন সবাই চালিয়াত। ভিতরের অবস্থা যা-ই হোক, লম্বা লম্বা বচন ছাড়ে—ওর থেকে খোলা বাদ দিয়ে সারটুকু বুঝে নিতে হয়। সেই খোলার পরিমাণ সাড়ে-পনের আনাই কোন কোন ক্ষেত্রে।

আলো-নেবানো অন্ধকার ঘর বলে সাতু ঘোষ দেখতে পেলেন

না, শহরের মানুষের রকম শুনে মহিমের মুখ আমসি পারা হয়ে গেছে। কী সর্বনাশ, সকলের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে বেড়াতে হবে? মিথ্যাচার অহরহ?

সাতকড়ি বলে যাচ্ছেন, পাড়াগাঁয়ের মানুষ তুমি। গোড়ায় গোড়ায় অসুবিধা লাগবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। একদিন আমারই উপর দিয়ে চলবে, এই বলে রাখলাম। শহরের জলের গুণ আছে। ঘুমোও এখন তুমি, সকালবেলা কাজে নিয়ে যাব।

সকালবেলা সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম কাজ দেখতে বেরলেন। কাঠের আড়তে গেলেন, সাতু ঘোষের সর্বপ্রথম চাকরি যেখানে।

অনেক দিন তো ছিলাম না, বাক্সগুলো কদ্দূর?

প্রায় হয়ে গেছে। এই মাসের ভিতর ডেলিভারি দেব।

খুব খাতির দেখা গেল সাতুর। যাওয়া মাত্র সিগারেট এনে দিল, চায়ের ফরমাশ হয়ে গেল। দরোয়ান সঙ্গে করে পিছন দিকে নিমগাছতলায় গেলেন। চৌকো সাইজের পাইপের মতন জিনিসটা—কাঠ দিয়ে বানানো। পনের-বিশ হাত লম্বা—ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে অক্লেশে এদিক-ওদিক করা যায়। বাক্স হল এর নাম?

বাক্সই বলে। সুন্দরবন অঞ্চলে সাহেবের আবাদের অর্ডার। বাঁধ বেঁধে নদীর নোনাজল ঠেকায়—সেই বাঁধের মাঝে মাঝে বাক্স বসিয়ে দেয় এই রকম। আবাদের খোলে জল বেশি হয়ে গেলে দরকার মতো বের করে দেওয়া চলে। কিন্তু নদীর নোনাজল এক ফোঁটাও ভিতরে ঢুকবে না, বাক্সের মুখ আটকে যাবে জলের চাপে।

হঠাৎ এক টুকরা কাঠ তুলে নিয়ে সাতকড়ি গরম হয়ে বলেন, এটা কি হচ্ছে, সেগুন লাগাতে কে বলল? এই রকম বর্মা-সেগুন?

হেঁ-হেঁ করে হাত কচলাচ্ছে—লোকটা আড়তের মালিকই বোধ হয়। বলল, সেগুনকাঠের বাক্স বলে অর্ডার—তাই ভাবলাম, অন্তত বাক্সর বাইরের মুখটায় দু-চার টুকরো সেগুন থাকা ভাল।

সাতকড়ি বলেন, ভাবাভাবির তো আপনার কিছু নেই মশায়। অর্ডার সেগুনের তো হবেই। নয়তো দাম বাড়বে কিসে? আপনাকে জারুল দিতে বলা হয়েছে, তাই দেবেন। থাকবে বাঁধের নিচে, সেখানে জারুল কি সেগুন কে দেখতে যাচ্ছে?

জারুল কাঠেরই হল তো আগাগোড়া। বাক্সের মুখটা বাইরে থাকছে—সেইজন্যে ভয় হল, কি জানি, কাঠের কারচুপি সাহেবের যদি নজরে পড়ে যায়।

ভয়ের কিচ্ছু নেই। বলতে বলতে এবারে সাতু হেসে ফেললেন: সাহেবের নজর পড়বে না, তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। কেউ আঙুল দিয়ে দেখাবে—এইটে সেগুন এইটে জারুল, তবেই তো নজর পড়বে। কেউ তা করতে যাবে না, সব মুখে ছিপি-আঁটা। কেউ পনের কেউ বিশ—যে মুখের যেরকম খোল। দামি কাঠকুটো সরিয়ে ফেলুন মশায়, মিস্তিরি ভুল করে হয়তো বা লাগিয়ে বসল দু-একখানা।

সেখান থেকে নিয়ে চললেন, ওঁদের বন্দোবস্তে একটা বাড়ি বানানো হচ্ছে সেই জায়গায়। ট্রামে চলেছেন। বেজার মুখে সাতকড়ি বলেন, এইরকম ভিড় ঠেলে কাজকর্ম হয় নাকি? একদিন জুড়িগাড়ি হাঁকাব, দেখ না। কোচোয়ান জুতো ঠুকে ঘণ্টা বাজিয়ে পথের লোক সরাবে। গাড়ি থামলে উর্দি-পরা সহিস দোর খুলে দেবে পিছন থেকে নেমে এসে। তাড়াতাড়ি কাজকর্মগুলো শিখে নাও, সোজাসুজি আমরা কন্‌ট্রাক্ট ধরব।

ব্যবসার হালচাল মুখে মুখে কিছু শুনিয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় কোম্পানি আছে, তাদের অনেক টাকা, বিস্তর তোড়জোড়—যত কন্‌ট্রাক্ট তারাই বাগিয়ে নেয়। নিয়ে তারপর সাব-কন্‌ট্রাক্ট দিল আর একজনকে। কিছুই না করে ফুক্কুড়ি মেরে কিছু পয়সাকড়ি বের করে নিল। সাব-কন্‌ট্রাক্টরেরও নিজে করতে বয়ে গেছে। কাজ ভাগ ভাগ করে একে খানিকটা ওকে খানিকটা দিয়ে দেয়। আমার ঘোষ

কোম্পানি হল এরও দু-তিন ধাপ নিচে, আমার নিচে আর নেই। রস আগে থেকে সব চুমুক মেরে নিয়েছে—আমার হলগে, কাজকর্ম নিজে দেখাশুনো করে শিটে নিংড়ে যদি কিছু বের করতে পারি। ভাঁড়ে মা-ভবানী যে—খালি হাতে কত আর খেল দেখাব? তবে এ দশা থাকবে না বেশি দিন। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে—কায়দা শিখে গেছি, তোড়জোড় করে ধরে নেওয়ার ওয়াস্তা।

একদিন খুব রাত করে ফিরলেন সাতু ঘোষ। মহিম খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সাতকড়ি ফিসফিসিয়ে ডাকেন, শোন। ঘুমিয়ে পড়লে এর মধ্যে? উঠতে হবে, কাজ আছে।

মহিম ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সাতকড়ি বলেন, নতুন রাস্তায় যে চারতলা বাড়িটা হচ্ছে, সেইখানে চলে যাও। মোড়ের কাছে লরী দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভারের পাশে উঠে বোসোগে। এই চাবি নাও গুদোমের। তোমায় কিছু করতে হবে না। লরীতে কুলিরা আছে, যা করবার তারাই সব করবে।

যন্ত্রচালিতের মতো মহিম হাত পেতে চাবি নিলেন। লরী গেল নতুন রাস্তায়। ঠিক রাস্তার উপর নয়, পাশের আধ-অন্ধকার গলিতে। ড্রাইভার নেমে গিয়ে বড় রাস্তায় সতর্ক ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ একবার এসে ফিসফিসিয়ে বলে, খুলুন এইবারে গুদোম। তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি।

গুদামের দরজা গলিতেই। চাবি খুলে ফেলে বস্তা বস্তা সিমেণ্ট লরীতে তুলে ফেলছে। আঁটি আঁটি লোহার রড। গা কাঁপে মহিমের। সাদা কথায় এর নাম চুরি। আজকের আমদানি এইসব মাল। দিনমানে এই লরীতেই বয়ে এনে হিসাবপত্র করে তুলেছে, রাত্রিবেলা সরিয়ে দিচ্ছে। সাতু ঘোষ নিজে না এসে তাঁকে পাঠালেন। ধরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে জেল। লেখাপড়া শিখে শেষটা সাতু ঘোষের চুরির কারবারে এসে ভিড়লেন। এ কাজে

থাকলে আজ না হোক কাল জেল আছে অদৃষ্টে। চালাক মানুষ সাতকড়ি—তিনি নিজে এগোন না, পর অপর দিয়ে সারেন। মরতে হয় তো মর তোমরা, উনি সাচ্চা থেকে যাবেন। সাংঘাতিক মানুষ!

ঘণ্টা তিনেক পরে লরী আবার মহিমকে মোড়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেল, যেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেসের দরজায় গিয়ে টোকা দিলেন। মৃদু টোকা দেবার কথা, কড়া নাড়তে মানা করেছেন সাতকড়ি। জেগে বসে আছেন তিনি, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। মহিমের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছিল, ধড়ে প্রাণ এল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে বাঁচলেন।

সাতকড়ি বলেন, হয়ে গেল সব? মাল পৌঁছে গেছে বর্মণ মশায়ের ঘরে?

মহিম বলেন, পিতৃপুণ্যে বেঁচে এসেছি দাদা।

সাতু ঘোষ হাসেন: ভয় পেয়ে গেছ। মফস্বলের মানুষ কিনা! ব্যবসার মধ্যে ঢুকে যাও ভাল করে, তখন আর এসব থাকবে না।

কিছু উত্তেজিত হয়ে মহিম বলেন, ব্যবসা কি বলছেন—এ তো চুরি! স্পষ্টাস্পষ্টি চুরির ব্যাপার। আইন সদরে মফস্বলে এক। ধরতে পারলে জেলে নিয়ে পুরবে।

ধরতে পারবে না। সেইটে জেনে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর। ব্যবসাই হল তো এই।

দেখুন, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি—সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সাচ্চাপথে কাজ করে যান, আপনি উন্নতি হবে।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে সাতু ঘোষ মহিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এই সেরেছে! ঐ সমস্ত পড়ে এসেছ বুঝি বইতে? মাথার মধ্যে গজগজ করছে। ভুলে যাও, ভুলে যাও। নয়তো কিছু করতে পারবে না জীবনে। ওসব একজামিন পাশ করতে লাগে,

সাংসারিক কাজকর্মে পদে পদে বাগড়া দেবে। মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেল।

মহিম সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, আমায় কি এই কাজের জন্যে নিয়ে এলেন দাদা ?

দায়ে-বেদায়ে করতে হবে বইকি! কণ্ট্রাক্টরি লাইনে নতুন আসছি, এখন যেখানে জল পড়বে সেইখানে ছাতা মেলে ধরতে হবে। আমি এই করব তুমি ওই করবে—ভাগ করে বসে থাকলে হবে না। জমিয়ে নিই একবার, তখন ফাইল সাজিয়ে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বোসো। দরদাম ঠিক করে বর্মণের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে এসেছি—পাঁচ টন মাটি আর বারো হন্দর রড রাতের ভিতর পৌঁছে যাবে। সকালে এই মালই হয়তো অন্য কোথাও সাপ্লাই দেবে বর্মণ।

হেসে ফেলে বললেন, হয়তো বা আমাদেরই কাছে। সকাল-বেলা আমাদেরই গুদোমে আবার এসে উঠবে।

দেখুন, বড্ড ভয় করছিল আমার—

সাতু ঘোষ উদার ভাবে বললেন, গোড়ায় গোড়ায় করবে এইরকম। আমাদেরই কি করত না ? কিন্তু যে বিয়ের যে মন্তোর। ধুকপুকানি থাকলে কাজ হবে কি করে ?

মহিম বলেন, জানেন না দাদা। দুটো কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছিল নতুন রাস্তার ঐ জায়গাটায়।

অনেক বাড়ি উঠছে ঐ তল্লাটে। একটা কথা উঠেছে, রাতে নাকি গুদোমের মাল পাচার হয়ে যায়। বাড়ির মালিকের বড্ড সন্দেহ-বাতিক, পুলিশে তদ্বির করে বাড়তি কনেস্টবলের ব্যবস্থা হয়েছে ওদিকটা। কিন্তু কনেস্টবলে যদি মাল ঠেকানো যেত !

মহিম বলেন টহল দিতে দিতে কনেস্টবলরা অন্য দিকে চলে গেল, তাই। ড্রাইভার এসে বলল, এই ফাঁকে—

অন্য দিকে গেল তো! যাবেই।

মানে?

নয়তো ফাঁক বুঝে তোমরা মাল সরাবে কেমন করে? ভাল লোক ওরা। অবস্থা বিবেচনা করে সরে পড়ল।

মহিম ভেবে দেখছেন, সেই রকমই বটে! কিন্তু সিমেণ্ট পাচার হয়ে গেল তো গাঁথনি হবে কিসে?

যা আছে তাই দিয়ে হবে। কাল থেকে দশটা বালিতে একটা সিমেণ্ট দেবে। তোমায় বলা রইল।

তিনটেয় একটা দেবার কথা। সেই স্পেসিফিকেশনে কাজ হয়ে আসছে। বাড়িওয়ালার তরফে এতদিন ওভারশিয়ার ছিল, তার মাথার উপরে পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার বসিয়েছে একজন। কাজকর্ম ভাল করে বুঝে নেবার জন্য।

সাতু ঘোষ বিরস মুখে বলেন, সেই তো বিপদ। খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। ওভারশিয়ারের পঁচিশ টাকা বরাদ্দ তো ইঞ্জিনিয়ারের পজিসন বড়—তাঁর হবে একশ টাকা। তার মানে আরও মাল সরাতে হবে। লোকের পর লোক এনে মাথায় বসাচ্ছে—এর পরে তো শুধু-বালির গাঁথনি দিয়েও পোষানো যাবে না।

মাস দুয়েক কাটল। আর পারেন না মহিম। লেখাপড়া শেখা এইজন্য? কলেজের ছাত্র ছিলেন চারু-দা—অনেক দিন ধরেই নাম টেনে যাচ্ছেন কলেজে। মহিমরা গাঁয়ের ইস্কুলে পড়তেন তখন। গ্রীষ্মের ছুটি আর পূজোর ছুটিতে চারু-দা আলতাপোল আসতেন বাইরে থেকে একরাশ নতুন আলো নিয়ে। দুপুরবেলা গোপন ক্লাস করতেন চারু-দা। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দের বই—এই সমস্ত পড়া হত। আলোচনাও হত অনেক রকম। চরিত্র-গঠনের কথা, সাধু সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হবার কথা, দেশের প্রয়োজনে প্রাণ-বিসর্জনের সঙ্কল্প। শরীর-চর্চাও

হত খুব। সেই অভ্যাসটা কলকাতা আসার আগে পর্যন্ত মহিম বজায় রেখেছেন—এমন সুঠাম দেহখানি সেইজন্য। চারু-দা মুখে যা বলতেন, দেখা গেল, নিজের জীবনে ঠিক তাই করলেন। গুলিতে প্রাণ দিলেন তিনি।

সামান্য মানুষ মহিম অত দূর না পারুন—সাতু ঘোষের সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। রীতিমতো পাপচক্র। যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক। লক্ষ্য করেছেন, কারসাজির সময়টা উপরের কর্তাব্যক্তিরা চট করে একদিকে সরে পড়ে, মুখের উপরে মৃদু হাসি খেলে যায় কেমন। কেউ ভাল নয় এ দলের। উপরে নিচে একটি সৎমানুষ নেই।

মহিম বলেন, পেরে উঠছিনে দাদা। আমায় অব্যাহতি দিন।

সাতকড়ি হেসে সান্ত্বনা দেন: পারবে, পারবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন? দু-মাসে হল না, কুছ পরোয়া নেই—লাগুক না দু-বছর।

তাতেও হবে না। আপনি অন্য লোক দেখে নিন।

সে লোক পাব কোথায়? এইসব গুহ্য ব্যাপার বাইরে প্রকাশ হলে সর্বনাশ। নয়তো তোমায় এত করে বলছি কেন? খাঁটি কথা বল দিকি। পোষাচ্ছে না, মাইনে-বৃদ্ধি চাই?

কাজই করব না। মাইনের কথা কাজ করলে তবে তো!

সাতু ঘোষ দরাজ ভাবে বললেন, পাঁচটাকা মাইনে বাড়াচ্ছি আসছে মাস থেকে। আর মাইনে তো রইলই—মন দিয়ে কাজকর্ম কর, কারবারের একআনা বখরা দিয়ে দেব ওর উপর। বুঝে দেখ ঠাণ্ডা মাথায়। কারবার কত বড় হতে চলল। তোমার একআনা অংশে কম-সে-কম বছরে পাঁচ হাজার উঠতে পারে।

মহিম চুপ করে আছেন।

কি ঠিক করলে বল।

আমায় মাপ করুন। টাকার জন্য মনুষ্যত্ব বেচতে পারিনে।

এ সমস্ত অনেক কাল আগেকার কথা। নতুন বয়স মহিমের। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে সোয়াস্তি বোধ করলেন।

সাতকড়ি শুনে গুম হয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ, পিছনে লোক লেগেছে। তা মনুষ্যত্ব বজায় রেখে কোন কর্ম করা হবে শুনি ?

ঠিক কিছু হয়নি। রমেন আমাদের সঙ্গে পড়ত, করপোরেশনে ঢুকেছে। তার শ্বশুর হলেন লাইসেন্স-অফিসার। চেষ্টাচরিত্র করে লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর একটা হয়তো হয়ে যেতে পারে।

সাতু ঘোষ তারিপ করে ওঠেন : ভাল চাকরি। করপোরেশনের নিয়ম হল—চাকরি একটা দিয়ে ছেড়ে দিল, তারপরে তুমি চরে খাওগে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যে তুবড়ে যাবে ভাই। দোকানদারদের প্যাঁচে ফেললে তবেই তারা পয়সা বের করে। এক বস্তা সিমেণ্ট লরীতে তুলতেই তোমার মাথা ঘোরে—মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্যাঁচ কষতে পেরে উঠবে কি ?

ব্যঙ্গের সুরে বলেন, পারবে না, উপোস করে মরবে। ইস্কুল-মাস্টারি হল তোমার কাজ—মানুষ গড়ার মহাব্রত। বারো বছর যে কাজ করলে গাধা হয়ে যায়। তোমার অতদিন লাগবে না, এখনই অর্ধেক হয়ে আছ। নইলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ এমন !

পরবর্তী কালে মহিম আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন এইসব কথা। যেন দৈববাণী। একটা তৃতীয় নেত্র ছিল যেন সাতু ঘোষের। ব্যবসা বিষম জাঁকিয়ে তুললেন দু-পাঁচ বছরের ভিতরে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বলে, তা নয়—উনি শালগাছ। আর মহিমা-রঞ্জন সেন বি. এ. মানুষ তৈরির মহাব্রত নিলেন ভারতী ইনস্টিট্যুশনের শিক্ষক হয়ে।

॥ দুই ॥

প্রভাতকুমার পালিত স্বনামধন্য ব্যক্তি। ভাল লেখাপড়া শিখেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার, বাইরের প্রাকটিশও ভাল। তাছাড়া খুব নাম-করা বনেদি বংশের সন্তান, জমিদারির আয়ও নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়। প্রাকটিশের ফাঁকে ফাঁকে ইদানীং আবার দশের কাজও করছেন। খবরের কাগজে নাম ওঠে হামেশাই। বহুকাল পূর্বে একদা তিনিও শিশু ছিলেন। তখন নাকি মহিমের স্বর্গীয় পিতৃদেব রঙ্গলাল এ-বি-সি পড়িয়েছিলেন তাঁকে দিনকতক। গল্পটা শোনা ছিল মায়ের কাছে। মা গর্বভরে বলতেন, ওই যে প্রভাত পালিতের নাম শোন, উনি মাস্টার ছিলেন তার, ওঁর কাছে পড়েছে। কে জানে কতদিন ধরে পড়িয়েছেন, কি দরের মাস্টার ছিলেন রঙ্গলাল। মা তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন না।

সাতু ঘোষের কাজ ছেড়ে দিয়ে মহিম সেই মেসেই পুরো মেম্বার হয়ে আছেন। এবং সাতু ঘোষ ইতিমধ্যে জোড়া ঘর পেয়ে ঘোষ এণ্ড কোম্পানি তুলে নিয়ে গেছেন মেস থেকে। রমেন ও তার অফিসার শ্বশুরের পিছনে ঘোরাঘুরি করে বিশেষ কোন আশা পাওয়া যায় না। কলকাতা শহর হঠাৎ যেন অকূল সমুদ্র হয়ে দাঁড়াল। সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রভাত পালিত মশায় অনেক দূর-থেকে-দেখা আলোকস্তম্ভ। ঐ আশ্রয়ে উঠতে পারলে হয়তো সুরাহা হবে একটা।

যা থাকে কপালে—মহিম সাহস করে একদিন ঢুকে পড়লেন পালিতের সুবিশাল কম্পাউণ্ডের ভিতরে। ড্রইংরুমের বাইরে বেঞ্চির উপরে বসে থাকেন। ক'দিন এসে এসে বসছেন এমনি। পাঁচুলাল-বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা কাল চেহারার মাঝ-বয়সি মানুষটা—পোর্টকমিশনার অফিসে চাকরি করেন, বাকি সময়

পালিত-বাড়ি পড়ে থাকেন। খাওয়া-দাওয়াও এখানে। শনিবারে শনিবারে দেশের বাড়ি গিয়ে বউ-ছেলেপুলে দেখে আসেন। কমিশনার সাহেবকে বলে প্রভাতই তাঁর চাকরি করে দিয়েছেন। প্রভাতের পরিবারের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি। অতি-দূর একটু আত্মীয়তাও আছে বুঝি। প্রভাতের নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ হয় না—বাড়ির দেখাশুনার ভার পাঁচুলালের উপর অনেকটা। দেখাশুনা আর কি—মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে যাওয়া। এই একমাত্র কাজ তাঁর।

পাঁচুলাল কোনদিকে যাচ্ছিলেন, ঘুরে এসে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন: কী বাপু, কি দরকার বল দিকি তোমার? ক'দিনই দেখছি, বসে বসে থাক।

মহিম তখন পরিচয় দিলেন: বাবা মারা গেলেন, আট বছর বয়স আমার তখন।—মা'র মুখে শোনা কথা, সত্যি-মিথ্যে জানি নে। মিথ্যে যদিও হয়, কাজকর্ম একটা করে দিতে হবে। নইলে শহরে থাকা হয় না। দেশে ফেরত গিয়ে কি খাব, তা জানি নে। আমায় পড়াতে আর দিদির বিয়ে দিতে দেনা হয়ে গেছে অনেক।

সরল কথাবার্তা পাঁচুলালের খুব ভাল লাগল, করুণা হল মহিমের উপর। প্রভাতকে গিয়ে বললেন, রঙ্গলাল সেন বলে কারো কাছে পড়েছেন আপনি?

রঙ্গলাল···রঙ্গলাল···হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল প্রভাতের। রঙ্গলালই নাম ছিল বটে। কি চায় তাঁর ছেলে? তা বেশ, মামলাটা নিয়ে এ ক'দিন তো বড্ড ঝামেলা—সোমবারে নয়, মঙ্গলেও নয়, বুধবারে আসতে বলে দিন।

বুধবারে মহিম এল। ভোরবেলা থেকে বসে আছে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা—সেই সময় টের পেল, সাহেব এইবার নিচেয় এসে বসেছেন। তার পরে কত মানুষ এল, কতজনে দেখা করতে গেল ভিতরে, কথাবার্তা সেরে ফিরে চলে গেল। মহিম বসেই

আছেন। স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথমে মহিম—নেমে আসবার অনেক আগে। প্রতিক্ষণ মনে হচ্ছে, এইবারে বেয়ারা বুঝি তাঁর স্লিপ হাতে করে আসে—তাঁর ডাক পড়েছে। টং করে ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজে, আর প্রভাত ফের দোতলায় উঠে গেলেন। বসে বসে মহিম সমস্ত বুঝতে পারছেন। বেয়ারা এসে বলে, চলে যান বাবু, আজকে আর হবে না।

পরের দিন এলেন। এসে অমনি বসে আছেন। পাঁচুলাল দেখতে পেলেন : ও, দেখা হয় নি বুঝি ? বড্ড কাজের চাপ কিনা! আচ্ছা, আমি বলব আর একবার।

ক'দিন চলল এমনি। বসে বসে মহিম ফিরে চলে যান। একদিন বেয়ারার কথা শুনলেন না, চলে যেতে বলল তবু বসে আছেন একভাবে। প্রভাতের মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে—পিছনের সিটে প্রভাত, পাশে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক। সামনে ড্রাইভারের পাশে আর একজন অমনি। দারোয়ান গেট খুলে গাড়ি বেরনোর রাস্তা করে দিচ্ছে। মহিম সেইখানে ছুটে এসে মোটরে মুখ ঢোকালেন।

মুহূর্তে এক কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। প্রভাতের পাশের লোক এবং সামনের সিটের লোক পাঞ্জাবির নিচে থেকে দুই রিভলভার বের করে তাক করল মহিমের দিকে। হয়ে যায় আর কি! অনেক-গুলো স্বদেশি মামলা চলছে তখন আদালতে। আগেও কয়েকটা হয়ে গেছে। প্রভাত পালিত সরকারের পক্ষে। একজনের ফাঁসি হয়েছে ইতিপূর্বে, কয়েকজনের দ্বীপান্তর। পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাসকে আদালতের প্রাঙ্গণে গুলি করল, সেই থেকে সরকারি নানা সতর্ক ব্যবস্থা। সামাল হয়ে চলাফেরা করেন এঁরা, সাদা পোশাকে সশস্ত্র পুলিশ সর্বদা আগুপিছু থাকে।

চাকরি করা হয়ে যাচ্ছিল এখনই মহিমের। প্রভাত 'উহুঁ' বলে মানা করে উঠলেন। অস্ত্র দুটো তখনই আবার পাঞ্জাবির নিচে চলে

গেল। শামুক যেমন পলকের মধ্যে খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে নেয়। মুহূর্তে আবার নিরীহ দুটি ভদ্রলোক প্রভাত পালিতের পাশে এবং সামনে।

প্রভাত লক্ষ্য করেছেন, ছেলেটা দিনের পর দিন এসে বসে থাকে। পাঁচুলালের কাছে শুনে আন্দাজে চিনে নিয়েছেন মহিমকে। বললেন, তুমি তো রঙ্গলাল বাবুর ছেলে? চাকরির যা বাজার, বুঝতে পারছ। সোমবারে এস। দেখা যাক কি করতে পারি।

নিজের মুখে দিন বলে দিলেন। মহিমের কথা প্রভাত তবে একটু মনে নিয়েছেন। আহা, বেচারির প্রাণটা যাচ্ছিল—অন্নের জন্য রক্ষা হয়েছে। গেট থেকে বেরিয়ে মোটর চলতে আরম্ভ করেছে। প্রভাত ভাবছেন, সত্যিই কিছু করা যায় কিনা ছেলেটার সম্বন্ধে। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের প্রেসিডেন্ট তিনি। একটা চিঠি হয়তো লেখা যায় হেডমাস্টারকে। মস্তবড় ইস্কুল—কলকাতার সেরা ইস্কুলগুলোর একটি।

মুখ বাড়িয়ে ইশারায় মহিমকে কাছে ডাকলেন: সোমবারে সন্ধ্যাবেলা এস তুমি—

পাঁচুলাল যে ঘরটায় থাকেন, মহিম সেখানে গেলেন। পাঁচুলাল ব্যাপার শুনেছেন, তিনি বকে উঠলেন: একেবারে গেঁয়ো তুমি—ছি-ছি, অত বড় লোকের কাছে অমনি ভাবে ধেয়ে যায় কখনো!

বেকুবি হয়েছে সেটা এখন বুঝতে পারছেন মহিম। লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করলেন।

কিছু নরম হয়ে পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করেন, কি বললেন উনি?

সোমবার সন্ধ্যায় আসতে বলেছেন। চেষ্টা করে দেখবেন।

পাঁচুলাল বললেন, ছুটে গিয়ে তবে তো ভালই হয়েছে দেখছি। চেষ্টা করবেন বলেছেন তো? তার মানে হয়ে গেছে। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে এখন। গবর্নমেণ্টে বিষম খাতির—এক কথায়

এক্ষুণি তোমায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর যে কোন চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারেন। কিংবা অন্য কোথাও। ভারি ক্ষমতা। আর, ও-মানুষ বাজে কথা বলবেন না কখনো।

পাঁচুলালের পাঁচখানা মুখ হলেও প্রভাতের গুণ-ব্যাখ্যান শেষ হত না। বলেন, কী দরের মানুষ—কোন সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা! তার মধ্যেও দেখ, ছেলেবয়সে কে-একজন কি-একটু পড়িয়েছিলেন তাঁর কথা মনে রেখেছেন। কত শ্রদ্ধা সেই প্রথম মাস্টারের উপর! গুণ না থাকলে এমনি এমনি মানুষ বড় হয়!

মহিম ঘাড় নাড়েন। বিষম বদনাম প্রভাত পালিতের। ইংরেজের পা-চাটা, যারা স্বদেশি করে তাদের তিনি চিরশত্রু। মহিম যখন কলেজে পড়তেন, ছেলেরা থুতু ফেলত তাঁর নামে। কাগজে প্রবন্ধ লিখে বিপ্লবীদের তিনি গালি পাড়েন—দেশের সর্বনাশ করছে নাকি তারা ইংরেজ ক্ষেপিয়ে দিয়ে। ইংরেজের অনেক গুণ—লোকের ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ হয়েছে তাদের শাসন-গুণে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তারা চলে যায়, তাসের ঘরের মতো শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে-চুরে পড়বে।

এই সঙ্গে সূর্যকান্ত মাস্টারমশায়ের নাম মনে পড়ে মহিমের। মহিম তাঁর প্রিয় ছাত্র। আলতাপোল থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে ঘোষগাঁতি গ্রামে বাড়ি। সে আমলে আলতাপোলে মাস্টারি করবার সময় সূর্যবাবু শনিবারে শনিবারে বাড়ি চলে যেতেন, সোমবার ফিরতেন। আজ তাঁর কী দুর্গতি! সংসার বলতে দুই মেয়ে—রানী আর লীলা। রানীর তুলনা ছিল না, বুড়া বাপকে চোখে হারাত। তার কাছে থাকতেন সূর্যবাবু। কিন্তু ভাগ্য খারাপ—রানী মারা গেল, জামাই বিয়ে করল আবার। তখন সূর্যবাবু ছোট মেয়ে লীলার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠলেন। লীলার অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, জামাইটা কিছু করে না। শাশুড়ি মুখ বেজার করেন সর্বদা, বেহাইয়ের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলেন না। কিন্তু উপায় কি—বুড়া বয়সে

আশ্রয় চাই একটা। সামান্য সঞ্চয় ভেঙে হাটবাজার করে ওদের মন রাখেন। আর চুপচাপ পড়ে থাকেন বাইরের ঘরে।

ক্লাসে তখন একটা বই পড়ানো হত—ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্কস ইন ইণ্ডিয়া। য়্যুনিভার্সিটি থেকে বের করেছিল বইটা, ইতিহাসের মাস্টার সূর্যকান্ত পড়াতেন। প্রভাত পালিত যা সমস্ত বলে থাকেন, অবিকল তাই—ইংরেজের গুণের ফিরিস্তি বইয়ে ঠাসা। তার ভিতরের একটা অধ্যায় ভাল করে পড়িয়ে সংক্ষেপ করে লিখিয়ে দিয়ে সূর্যবাবু বলতেন, মুখস্থ করে রাখ বাপসকল। ভাল নম্বর পাবে। কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না। বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।

প্রভাতের ঠিক উল্টো। তিনি মুখেই শুধু বলেন না, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। নয়তো উদ্যোগ করে কাগজে প্রবন্ধ ছাপতে যাবেন কেন? বাইরের এমন প্রাকটিশ সত্ত্বেও সরকারের মাইনে খেয়ে স্বদেশি ছেলের পিছনে লাগেন কেন এমন করে? এক-একটা মামলা নিয়ে এমন পরিশ্রম করেন, যেন একটি আসামিকে লটকে দিতে পারলে চতুর্বর্গ লাভ হবে তাঁর জীবনে। সর্বসাধারণ এই জন্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ছাড়ে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু আজকে মহিম একটা নতুন দিক দেখতে পেলেন। দুর্লভ ক্ষমতাবান পুরুষ—নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিচারের উপর অটল আস্থা। যা তিনি বিশ্বাস করেন, গলা ফাটিয়ে দশের মধ্যে প্রকাশ করতে ভয় পান না প্রতিক্ষণ জীবন বিপন্ন জেনেও।

মহিম বললেন, উনি আমায় সোমবার সন্ধ্যেবেলা আসতে বললেন।

পাঁচুলাল বলেন, এস তাই।

তারিখটা একটু সরিয়ে রবিবার করে দেওয়া যায় না? আমার বড্ড সুবিধা হয়। একটা টুইশানি পেয়েছি—টালিগঞ্জে নতুন যে রাস্তা বেরচ্ছে সেইখানে। অনেকটা দূর। নতুন জায়গা বলে কামাই করতে ভয় লাগে। টুইশানিটা চলে গেলে মেসের খরচ চালাতে পারব না। রবিবার হলে কোন অসুবিধা হত না।

পাঁচুলাল বললেন, রবিবারে আসবে কি ! ওদিনে সাহেব বাড়ি থাকেন না।

তাহলে শনিবার সন্ধ্যেয়। শনিবারে ইস্কুল তুটোয় ছুটি হয়ে যায়। ছাত্রকে বলে রাখব, তুপুরবেলা পড়িয়ে আসব ওইদিন। কথাটা শুনবে বোধ হয়।

সতীশ টাইপিস্ট। পাঁচুলাল একটা চিঠি টাইপ করতে দিয়েছিলেন, সেটা হাতে করে সে এল। সতীশ বলে, শনিবারে কোর্টের পর সাহেব বেরিয়ে যান, আসেন সোমবার সকালবেলা। এসেই কাজকর্মে লেগে পড়েন।

বড়লোকের ব্যাপারে মাথা গলানো উচিত নয়। কিন্তু যতই হোক, মহিম পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন—না ভেবেচিন্তে ফস করে প্রশ্ন করে বসেন, কোথায় যান তিনি ?

প্রশ্নটা সতীশকে। কিন্তু সে শুনতে পায় না। টাইপ-করা চিঠিটা পাঁচুলালের হাতে দিয়ে চোখে অর্থপূর্ণ হাসি ঝলসে তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেল।

পাঁচুলাল চটে গিয়ে বলেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি শুনি ? তোমার কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে ? সন্ধ্যেবেলা না পেরে ওঠ তো এসই না মোটে। জোরজার কিছু নেই।

বেকুব হয়ে গিয়ে মহিম বললেন, আজ্ঞে না। আসব বই কি ! জীবনে ভুলব না আপনাদের দয়া।

কপাল খুলল অবশেষে। প্রভাত সোমবারে সন্ধ্যার পর মহিম আর সতীশকে একসঙ্গে ভিতরে ডাকলেন। বললেন, ভারতী ইনস্টিট্যুশন জান ? চিঠি দিয়ে দিচ্ছি হেডমাস্টারকে। মাস্টারের যদি এখন দরকার থাকে, তোমায় কয়েকটা দিন পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখ, শিক্ষাবৃত্তির মতো পুণ্যকর্ম নেই। দেশের কাজও বটে। দেশের ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলা—

এর চেয়ে দায়িত্বের ব্যাপার আর কি হতে পারে! জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বল, মিনিস্টার বল, এমন কি গবর্নর বল, শিক্ষকের মতো সম্মান কারো নয়। গোখলে মাস্টার ছিলেন, বিদ্যাসাগরও তো সংস্কৃত কলেজের মাস্টার। আমার ছেলেমেয়েদের আমি মাঝে মাঝে পড়িয়ে থাকি। বড় ভাল লাগে। কিন্তু কি করব—অবসর পাইনে মোটে।

ভাল মেজাজে ছিলেন। ভূমিকাটুকু শেষ করে সতীশকে বলেন, নাও—

বলে যাচ্ছেন, সতীশ নোটবই বের করে সর্টহ্যাণ্ডে নিয়ে নিল। প্রভাত বললেন, টাইপ করে আন, সই করে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে কাল হেডমাস্টারের কাছে চলে যাবে তুমি। দেখ, কি হয়।

বলে মামলার ফাইল খুলে মাথা নিচু করে বসলেন। অর্থাৎ কাজ চুকেছে, বেরিয়ে পড় এবার। চিঠি নিয়ে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন, এই সময় পাঁচুলালের সঙ্গে দেখা: বাঃ রে, আমায় দেখালে না?

খাম খুলে একবার নজর বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পাঁচুলাল বলেন, কপাল বটে তোমার ছোকরা! আর, সাহেব মানুষটা কি রকম তা-ও বুঝে দেখ। এক কথায় চাকরি।

মহিম বিরস মুখে বললেন, চাকরি আর হল কোথায়? ওঁদের মাস্টারের দরকার থাকে, তবে তো! শুধুমাত্র পরীক্ষা করে দেখতে লিখেছেন—তা-ও তো দু-চার দিনের জন্য।

হো-হো করে হেসে উঠলেন পাঁচুলাল: দিয়ে দেখই না এ চিঠি। খোদ প্রেসিডেণ্ট লিখছেন, মাস্টারের দরকার নেই কি রকম! পড়ানোর পরীক্ষা করতে বলছেন—খবর চলে আসবে, এমন মাস্টার ভূভারতে কখনো জন্মে নি। দু-চার দিন কি, যাবৎ চন্দ্রসূর্য এই মাস্টার রাখবে তারা ইস্কুলে। বলি, হেডমাস্টারের একটা আখের নেই? তিনিও চান, দশ-বিশ টাকা মাইনে বাড়ুক, বুড়ো হয়েছেন

বলে ঝটপট তাড়িয়ে না দেয় তাঁকে। চলে যাও ড্যাংড্যাং করে, গিয়ে দেখগে কী ব্যাপার।

অনেক রাত্রি অবধি মহিমের ঘুম আসে না। সাতু ঘোষ ব্যঙ্গ করে যা-ই বলুন, বড় কাজ করবার সুযোগ এই চাকরিতে। চারু-দাকে মনে পড়ল। সর্বত্যাগী সেই তরুণ দাদার উদ্দেশে মনে মনে বলছেন, বড় গরিব আমরা। একরাশ ধারদেনা করে মা আমার মুখ চেয়ে আছেন। অন্ধের যষ্টির মতন আমি। তোমাদের পথ নিতে পারলাম না চারু-দা। কিন্তু দশটা মানুষ তোমরা চলে গিয়ে থাক তো ঠিক তোমাদেরই মতন দু-শ জন আমি তৈরি করে পাঠাব। এই আমার ব্রত। সূর্যবাবুর কাছে পড়েছেন চারু-দাও। যত্ন করে পড়ানোর পর সশব্দে বই বন্ধ করে ফেলা : যা পড়ালাম বাপসকল, সমস্ত মিথ্যে কথা। ইস্কুলের মাস্টার সূর্যবাবু—এমনি সব মাস্টার ইস্কুলে থাকতে ইংরেজ স্পাই লাগিয়ে পুলিশ দিয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে কি করবে? পারে তো ইস্কুল-কলেজগুলো তুলে দিক, মাস্টার-প্রফেসারগুলো আটক করুক।

॥ তিন ॥

ভারতী ইনস্টিট্যুশন বনেদি ইস্কুল। বয়সে অতি প্রবীণ। সুবর্ণ-জয়ন্তী হয়ে গেছে ও-বছর। ইস্কুলের যখন জন্ম, চতুর্দিকে পতিত জলাভূমি জঙ্গল কাঁচা-নর্দমা। এ তল্লাটে মানুষও ছিল কত সামান্য! অত জায়গাজমি তাই ইস্কুলবাড়ির। এখনকার দিনে ওর সিকির সিকি পরিমাণ জমি নিতে হলে আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। এক-একটা বাড়ি আছে, তিন-চার পুরুষ ধরে পড়ছে এই ভারতী-ইস্কুলে। পিতামহ পিতা পুত্র—এমন কি প্রপিতামহ কোন কোন ক্ষেত্রে। দিকপাল অনেকে শৈশবকালে ছাত্র ছিলেন এখানকার। মাস্টার মশায়রা সেইসব কৃতী ছাত্রের নাম করে পাশাপাশি নতুন ইস্কুল-গুলোকে দুয়ো দেন। ইস্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে ওই বাঁধি গৎ ছাপা হয়ে আসছে একাদিক্রমে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে।

প্রভাত পালিতের চিঠি নিয়ে মহিম ইস্কুলে ঢুকলেন। বড় সকাল-সকাল এসে পড়েছেন, ইস্কুল বসবার দেরি আছে। ছেলে কত রে বাবা, আসছে তো আসছেই। একতলা দোতলা তেতলা বোঝাই হয়ে গেল। আরও আসছে। সামনে ছোট একটু উঠানের ফালি, পিছনে বড় উঠান। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ বড় সময়ের অপব্যয় করে না। ক্লাসের বেঞ্চিতে ধপাস করে বই ছুঁড়ে দিয়েই বাইরে ছোটে। মার্বেলের গুলি বেরোয় পকেট থেকে, বল বেরোয়। বিনা সরঞ্জামে চোর-পুলিশও খেলছে ছুটাছুটি করে। আর এক খেলা, কলের মুখ চেপে ধরে ফোয়ারার মতন জল ছিটিয়ে দেওয়া। এক-পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা হচ্ছিল ওদিকটা—জলের ধারায় কাপড় ভিজিয়ে দিল তো খেলা ছেড়ে ঘুসি বাগিয়ে এসেছে একটা ছেলে—

সহসা যেন মন্ত্রবলে সব স্তব্ধ। সামনের সরু উঠানের চেঁচামেচি

একেবারে নেই। পরম সভ্যভব্য ছেলেপুলে পিলপিল করে ক্লাসে ঢুকছে। হেডসার, হেডসার—চোখ-মুখের ইশারায় চাপা গলায় কথা।

গম্ভীর পদক্ষেপে হেডমাস্টার ডি-ডি-ডি এসে ঢুকলেন। পুরো নাম দিব্যেন্দুধর দাশ। গৌরবর্ণ দীর্ঘমূর্তি, মাথা-জোড়া টাক—হাজার লোকের মধ্যেও আলাদা করে নেওয়া যায়। কুচকুচে কালো রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে, গলায় পেঁচানো সূতি চাদর, পায়ে স্প্রিং-দেওয়া চীনেবাড়ির সু। যেমন যেমন এগুচ্ছেন, সামনে ও দু-পাশে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। মসমস করে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। লাইব্রেরি-ঘরে শিক্ষকেরা বসে দাঁড়িয়ে—তর্কাতর্কি কথাবার্তা রঙ্গরসিকতা তুমুল বেগে চলেছে। কেউ কেউ ওর মধ্যে ঘুমিয়েও নিচ্ছেন বসে বসে। দরজার বাইরে হেডমাস্টারকে দেখে সকলে তটস্থ হলেন, চোখ-বোঁজা মানুষ ক'টি তাড়াতাড়ি চোখ খুললেন। দুখিরাম বেয়ারা ছুটে এসে হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে নিল। হেডমাস্টারের জন্য আলাদা একটা কামরা—কামরার দরজা খুলে পাখায় জোর বাড়িয়ে দিল।

কামরায় ঢুকে যেতেই চতুর্দিকে আবার যেমন-কে-তেমন। ঘুসি বাগিয়ে এসে যে ছেলেটা হাত তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়েছিল, হাত বের করে সে ধাঁই করে মেরে দিল কলের ধারের ছেলেটার উপর। নবীন পণ্ডিত বলছিলেন, সুভাষের সঙ্গে নরীম্যানের তুলনা? উঁ, ঢাকের কাছে—ওইখানে থেমে গিয়ে খবরের কাগজে মনোযোগ করেছিলেন। ডি-ডি-ডি ঘরে ঢুকে যেতেই মুখ তুলে উপমাটা শেষ করলেন: ঢাকের কাছে ট্যামটেমি?

টেবিলে কি চিঠিপত্র আছে, হেডমাস্টার নেড়েচেড়ে দেখছেন। অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার চিত্তরঞ্জন গুপ্ত ঘরে ঢুকে বেঁটে সাইজের বেঢপ মোটা একখানা খাতা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। অ্যারেঞ্জমেণ্ট-বুক—মাস্টাররা যমের মতো ডরান ঐ খাতাকে। যাঁরা কামাই করছেন, ক্লাস তাঁদের খালি যাবে না। অন্য মাস্টারের লিসার-ঘণ্টা

কেটে নিয়ে সেখানে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সেই সেই মাস্টার অবসর পেলেন না আর সেদিন। এই বেঁটেখাতায় তার ব্যবস্থা।

খাতা নিয়ে বেজার মুখে চিত্তবাবু বলছেন, চারজন আসবেন না, এখন অবধি খবর পেলাম। কি করে কাজ চলবে নিত্যি দিন এমন হতে থাকলে ?

ডি-ডি-ডি বললেন, বিশ্রী আইন করে রেখেছে—বছরে পনের দিন ক্যাজুয়াল ছুটি। সেই সুযোগ নিচ্ছে। পড়াশুনো কিছু আর হতে দেবে কি ? আপনাকে বলা রইল, কামাই করার পরে কেউ যখন ফের ইস্কুলে আসবেন একনাগাড়ে চার-পাঁচ দিন তাঁর লিসার কেটে যাবেন। সমুচিত শিক্ষা হবে তাহলে।

তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে দাও দুখিরাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিত্তবাবু বললেন, তিন মিনিট আছে সার এখনো।

ডি-ডি-ডি বললেন, হোকগে। গোলমালে মাথার টনক নড়ে যাচ্ছে। ছেলেরা আর কতটুকু গোল করে! মাস্টারমশায়রা, দেখুনগে, লাইব্রেরি-ঘরে মেছো-হাট বসিয়ে দিয়েছেন।

জবরদস্ত হেডমাস্টার। গার্জেনরা শতমুখ ডি-ডি-ডি'র প্রশংসায়। দেড় হাজার ছেলে কী রকম ভেড়ার পাল হয়ে আছে, দেখে এস একদিন ইস্কুলের সময় গিয়ে। কমিটিও খুশি—বিশেষ করে সেক্রেটারি। মিষ্টি কথার রাজা হলেন তিনি—মাস্টাররা দায়ে-দরকারে গেলে খুব খাতির করে বসান : ইস্কুল তো আপনাদেরই। কমিটি কিংবা একা হেডমাস্টার কী করতে পারেন উৎকৃষ্ট শিক্ষক যদি না থাকেন। এর পরে দশরকম কথার মারপ্যাঁচে বের করে ফেলেন হেডমাস্টার সম্বন্ধে মাস্টারদের কি রকম মনোভাব। খুশি হন মনে মনে : হাঁ, মাস্টারগুলোকে কেমন ঠাণ্ডা করে রেখেছেন, এই না হলে হেডমাস্টার!

ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন—মন্দিরের আরতির মতন দুখিরাম লম্বা বারাণ্ডা ধরে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্নিং-এর প্রথম ঘণ্টা : ছেলেরা সব

ক্লাসে ঢুকে যাও, ঘর থেকে বেরিয়ে টিচাররা ক্লাসমুখো রওনা হন এবারে। এর পরে ঢং-ঢং করে পেটা-ঘড়ি বাজবে। ইস্কুল বসে গেল তখন, ক্লাসে ক্লাসে পাঠগুঞ্জন। ফ্যাক্টরির কল চালু হয়ে যাবার মতন। পিরিয়ডের পর পিরিয়ড পার হয়ে অলস ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে টিকোতে টিকোতে এখন চলল পশ্চিমের প্রকাণ্ড লাল বাড়িটার আড়ালে সূর্য অদৃশ্য না হওয়া অবধি।

ডি-ডি-ডি অফিস-ঘরের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, নজর চতুর্দিকে পাক খাচ্ছে। মাস্টারমশায়রা তাড়াতাড়ি খড়ি-ঝাড়ন নিয়ে নিলেন, বই নিয়েছেন কেউ কেউ, ভূগোলের মাস্টাররা গোটানো ম্যাপ আর লাঠির আকারের পয়েন্টার, এবং অঙ্কের মাস্টাররা দীর্ঘ স্কেল নিয়েছেন হাতে। হাতিয়ারপত্তরে সজ্জিত হয়ে ক্লাসে চললেন। ভূদেববাবু এর মধ্যে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন হেডমাস্টারের দিকে। তিন-তিনটে মিনিট জুলুম করে আজ খেয়ে দিল। কী অটুট স্বাস্থ্য, অসুখও একদিন করতে নেই! সেই দিন তোমার ইস্কুলের কী হাল করি, বুঝবে।

মহিম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। ডি-ডি-ডি'র নজর পড়ল : ইউ বয়, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং—ক্লাসে না গিয়ে ঘুরছ কেন ওখানে?

ছাত্র ভেবেছেন মহিমকে। এসব অনেক দিনের কথা—ফুটফুটে সতেজ চেহারা তখন। বি. এ. পাশ করেছেন, তবু ইস্কুলের উপরের ক্লাসের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে বেমানান দেখাবে না বোধহয়।

ইউ বয়, গো অ্যাটওয়ান্স টু স্থ ক্লাস—

মহিম কাছে গিয়ে প্রভাত পালিতের চিঠিটা দিলেন।

কিসের চিঠি? সকাল সকাল ছুটি—

চিঠি পড়ে চোখ তুলে তাকালেন মহিমের দিকে। আর একবার পড়লেন। পাশের বড় ঘরটা দেখিয়ে বললেন, যান, লাইব্রেরিতে গিয়ে বসুনগে। চিত্তবাবু, বাইরে আসুন একটু, এই দেখুন।

অতএব মহিম লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে গেলেন। লাইব্রেরি আছে যখন ইস্কুলে, বইটই বেশ পড়া যাবে। বই মহিমের বড় প্রিয়, বই মুখে ধরে থাকতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। উঃ, সাতু ঘোষের সঙ্গে কী নাগপাশে আটক হয়ে পড়েছিলেন। বই পড়া সাতু হাস্যকর খেয়াল বলে মনে করে, ওটা বোকা মানুষের লক্ষণ। শুধুমাত্র পয়সাই চিনেছে, পয়সার পিছনে ছোটা ছাড়া জীবনে ওদের অন্য লক্ষ্য নেই। লেখাপড়ার আবহাওয়ায় এসে মহিম পুনর্জীবন পেয়ে গেলেন যেন।

কিন্তু দেড় হাজার ছাত্র এবং এতগুলো শিক্ষকের জন্য গোণাগুণতি চারটে আলমারি। অন্য কোন ঘরে আছে বোধহয় আরও। এক-দিককার দেয়াল ঘেঁষে আলমারিগুলো, মাঝখানে টানা টেবিল, টেবিলের এদিকে-ওদিকে সারবন্দি চেয়ার। মাস্টারমশায়রা ক্লাসে চলে গেছেন, চেয়ার প্রায় সমস্ত খালি। যাঁদের এখন ক্লাস নেই, তাঁদেরই জন কয়েক রয়েছেন। দু-জন তার মধ্যে লম্বা হয়ে পড়েছেন টেবিলের উপর। পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে পড়ে আরামে চোখ বুজেছেন। মহিম আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের নাম পড়েন। এনসাইক্লো-পেডিয়া ব্রিটেনিকা আঠার শ'-পঁচানব্বুই সালের এডিসন। অপর বইগুলোও দস্তুরমতো প্রাচীন। ইস্কুলের গোড়ার দিকে দিকপালেরা সেই যখন ছাত্ররূপে এখানে ঢুকেছিলেন, তখনই উৎসাহ বশে বোধহয় বই কেনা হয়েছিল। পরবর্তী কালে আর উদ্যোগ হয়নি। কাচের বাইরে থেকে চেহারা দেখে অন্তত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এমনি সময় বেঁটেখাতা নিয়ে দুখিরাম এসে পড়ল। মাস্টারদের দেখিয়ে দেখিয়ে সই করিয়ে ঘুরছে। অমুক পিরিয়ডে যে লিসার আছে, তমুক ক্লাসটা নিতে হবে সেই সময়।

ঘুমচ্ছিলেন গগনবিহারীবাবু, টেবিলের উপর তড়াক করে উঠে বসলেন: এসে গেল চিত্রগুপ্তের খাতা? কই, আমার কোথায় হে? আমায় বাদ দিলে তো ইস্কুল তোমাদের উঠে যাবে।

দুখিরাম বলে, আপনার আজ নেই মাস্টারমশায়।

অবাক কাণ্ড! দু-দুটো লিসার-ঘণ্টায় চিত্রগুপ্তের ছোঁয়া পড়ল না? কলি উলটে গেল নাকি?

ধপাস করে শুয়ে পড়লেন; চোখ বুঁজলেন পূর্ববৎ।

দুখিরাম বলে, পতাকীবাবু আপনার আছে। টিফিনের পরের ঘণ্টায়। দেখে নিন।

খাতা মেলে ধরল পতাকীচরণের সামনে। সই মেরে দিলেন পতাকী। হেসে উঠে বলেন, বিলকুল ছুটি আজকে। বাঁচা গেল।

দাশুর বয়স কম, অল্পদিন ঢুকেছেন। ভাল নাম দাশরথি—দাশু দাশু করে সবাই ডাকে। বুঝতে না পেরে তিনি বলেন, ছুটি হয়ে গেল কি রকম?

প্রিন্সিপল নিয়ে চলি আমি ভায়া। যেদিন লিসার মারবে, সব ক'টা পিরিয়ড সেদিন ছুটি করে নেব। কিচ্ছু করব না কোন ক্লাসে গিয়ে। দশ বছর মাস্টারি হয়ে গেল, তিনটে ইস্কুল ঘুরে এসেছি। অনিচ্ছেয় আমায় দিয়ে কাজ করাবে, এমন তো কোন বাপের বেটা দেখি নে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গগনবিহারী বলেন, আঃ, বাপ তোল কেন পতাকী? ওটা কি ভাল?

পতাকী থতমত খেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন। দাশুর দিকেও তাকালেন একবার। শোনা যায়, দাশু হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে লাগানি-ভাঙানি করেন। এমনি ভাবে চাকরির উন্নতির চেষ্টা। কথা একটা বলে ফেলে পতাকীচরণ গিলে নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছেন: ডি-ডি-ডি কিংবা চিত্তবাবু ওঁদের কথা বলছি নে তো। টিচার কামাই করলে কারো-না-কারো লিসার যাবেই। ওঁরা করবেন কি? বলছিলাম ছোঁড়াগুলোর কথা। সেকেণ্ড-সি'র এত বদনাম শোনেন—ভূদেববাবুর ক্লাসে পর্যন্ত মেজেয় পা ঠোকে। আমি তো কাল এক প্যাসেজ ট্রানশ্লেসন দিয়ে চা খেতে নেমে এলাম—

মরে আছে কি বেঁচে আছে, বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, মুখে রক্ত তুলে পড়িয়ে তবে ক্লাসের ছেলেপুলে ঠাণ্ডা রাখতে হবে, এ কেমন কথা!

অবান্তর এমনি সব বলে বেফাঁস কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা। ত্বখিরাম ওদিকে বেঁটেখাতার পাতাটা পড়তে পড়তে হিমসিম হচ্ছে। বলে, দেখুন তো দাশুবাবু, এই যে—এম-আর-এস এই মাস্টারমশায় কে বলুন দিকি?

এম-আর-এস—তাই তো! পতাকীবাবু, এম-আর-এস কে আমাদের ভিতর?

করালীকান্ত এসে ঢুকলেন। কটকটে কালো রং, ছিপছিপে দেহ, ধবধবে কাপড়জামা, মাথায় এলবার্ট-টেড়ি—চড়কডাঙার দত্তবাড়ির ছেলে বলে জাহির করেন সর্বদা। হেডমাস্টার, চিত্তবাবু এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বৃদ্ধ গঙ্গাপদবাবু পদমর্যাদায় বড়। করালীবাবুও খানিকটা কাছ ঘেঁষে যান ওঁদের। ইস্কুলের কেয়ারটেকার ও লাইব্রেরিয়ান। কালি-নিব-খড়ি ফুরিয়ে গেছে, পায়খানায় চুনকাম করতে হবে, বেঞ্চিটার ঠ্যাং ভেঙেছে ইত্যাদি যাবতীয় দায়ঝক্কি কেয়ারটেকারের। ভাতা এই বাবদে মাসিক পাঁচ টাকা। এবং প্রাচীন আলমারি চতুষ্টয়ের দায়িত্ব বহন করায় অতিরিক্ত ভাতা আরও পাঁচ। তা ছাড়াও ঘণ্টা কয়েক বেশি লিসার অন্যদের চেয়ে। ঐ লিসার পিরিয়ডগুলো নিয়ে করালীকান্ত সর্বদা সশঙ্ক—কখন কাটা পড়ে যায় চিত্তবাবুর কলমের খোঁচায়। বেঁটেখাতা লেখার সময় সেইজন্য ঘুণ হয়ে বসে থাকেন তাঁর পাশে। উঁহু, করছেন কি—ঐ সময়টা চুনের মিস্তিরি আসবে, দেখিয়েশুনিয়ে দিতে হবে। ক্লাসে ঢুকে থাকলে কেমন করে চলবে? আজকেও ছিলেন এতক্ষণ, ফাঁড়া কাটিয়ে হাসিমুখে এখন এসে বসছেন।

এম-আর-এস কে হলেন করালীবাবু?

ওই যে, মহিমবাবু—নতুন যিনি এলেন আজকে। দাঁড়িয়ে কি

করেন মশায়—আসুন, আলাপসালাপ করি। প্রেসিডেন্টকে কি করে বাগালেন বলুন দেখি?

দু-তিন জনে প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন, অ্যাঁ—প্রেসিডেন্ট?

করালী বলেন, খোদ হাইকোর্ট থেকে ফরমান নিয়ে এসেছেন, রোখে কে আপনাকে মশায়। কোন ক্লাস দিচ্ছিস রে দুখিরাম—এইটথ-বি? চিত্তবাবুকে বললাম, প্রেসিডেন্টের লোককে রৌরব-কুম্ভীপাক ঘোরাচ্ছেন কি জন্যে? বললেন, টুইশানিওয়ালারা কেউ যেতে চায় না—নিচের মাস্টারকে কেউ নাকি পড়াতে ডাকে না। নতুন লোক উনি, টুইশানির টান নেই—ঘোরাঘুরি করুন না এখন দিনকতক।

দুখিরাম বেরিয়ে গিয়ে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরছিল। দ্রুতপায়ে ফিরে এল: গগনবিহারীবাবু, উঠুন—দেখতে পাই নি সে সময়।

আছে তো? বল সেই কথা। চিত্রগুপ্ত সাধে নাম দিয়েছি! চিত্ত গুপ্ত নয়, চিত্রগুপ্ত—যমরাজার ম্যানেজার। বার মাস তিরিশ দিন এই কাণ্ড চলেছে। গোটা মানুষটা মারতে পারেন না, তা হলে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে—লিসার মেরে মেরে তাই হাতের সুখ করে নেন। কি বলেন পতাকীবাবু?

পতাকীচরণ সমদুঃখী বটে, কিন্তু আপাতত আর এ সবের মধ্যে নেই। দাশু এখনো বসে রয়েছেন, তার উপরে করালীকান্ত। নতুন আবার এই উদয় হয়েছেন প্রেসিডেন্টের লোক। ত্র্যহস্পর্শ-যোগ। পকেট থেকে বিড়ি বের করে নীরবে একটি ধরিয়ে নিলেন।

ঘণ্টা পড়ল। সেকেণ্ড পিরিয়ড। মহিম ক্লাসে যাবেন এবারে। ইস্কুল-কলেজে পড়েই এসেছেন এতদিন, জীবনে এই প্রথম ইস্কুলে পড়ানো। কতকাল আগেকার কথা! সেদিনের এইটথ ক্লাসের সেই আধো-আধো কথা-বলা শিশুগুলো এখন ছেলেপুলের বাপ। বলা যায় না, পিতামহও হতে পারে কেউ কেউ।

ঘণ্টা পড়লে মাস্টারমশায়রা সব ফিরছেন লাইব্রেরি-ঘরে। গোটা চারেক কুঁজো, কুঁজোর মাথায় গেলাস বসানো। ঢকঢক করে সব জল খেয়ে নিচ্ছেন, বিড়ি ধরাচ্ছেন। বেয়ারাদের ঘরের পাশে জানলাহীন আধ-অন্ধকার ছোট্ট একটা ঘরও আছে, সেখানে হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা। হুঁকো বিনে যাঁদের চলে না, তাঁরা সব ছুটলেন সেদিকে। উঃ, কতগুলো মাস্টার রে বাবা, চিনে নিতে মাসখানেক লাগবে অন্তত। মহিম পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে পড়েছেন, এমন বিরাট কাণ্ডকারখানা তাঁর ধারণায় আসে না।

স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গঙ্গাপদবাবু—খুনখুনে বুড়ো, দেহ নুয়ে পড়েছে, মাথায় একটা কাঁচা চুল নেই—বলছেন, কী বাবাজি, আজ থেকে লাগলে বুঝি? কোন ক্লাসে এখন? ভাল, খুব ভাল। দেখ, নিচের ক্লাস বলে তাচ্ছিল্য করে মাস্টার পাঠানো হয়। ঠিক উল্টো। ভিত তৈরি হয় ওখানে—হেডমাস্টারেরই যাওয়া উচিত। উপরের ক্লাসে আমরা তো একটুখানি বাহার করে ছেড়ে দিই। ভিত কাঁচা থাকলে উপরের চাপে নড়বড় করে, ধ্বসে পড়ে ফাইন্যালের সময়। ভিত ভাল থাকলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হয় না। এই দুখিরাম, ক-ছটাক জল রাখিস রে কুঁজোয়, গেলাসে ঢালতে ফুরিয়ে যায়। তুমি-তুমি করে বলছি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না।

মহিম বলেন, বলবেন বইকি! ছাত্রতুল্য তো আমি।

তুল্য কেন বলছ? আমার অনেক ছাত্রের ছেলে তোমার চেয়ে বড়। একটা কথা বলি বাবাজি—বড় পুণ্যকর্ম এটা। হাসিভরা মুখ আর পবিত্র মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবে। দুখিরাম, নতুন মাস্টার-মশায়কে ক্লাসটা দেখিয়ে দিয়ে আয় বাবা। নয়তো খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে বেচারি।

বুড়ো হয়ে বেশি কথা বলেন গঙ্গাপদবাবু। বকতে বকতেই ছুটলেন আবার ক্লাসে। ছুটবার সময় দেহ কুঁজো থাকে না, সরলরেখার মতো খাড়া হয়ে ওঠেন।

লম্বা একটা ঘর। এক ঘরের মধ্যে এইটথ ক্লাসের দুটো সেকশন—'এ' আর 'বি'। 'সি' আর 'ডি' সেকসন ঠিক এমনি মাপের উল্টো দিককার ঘরে। পার্টিশন নেই মাঝে। আরে, পার্টিশনে যে জায়গা যাবে সেখানেই কোন না দশটা ছেলে বসে আছে। ইস্কুলে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না—জায়গা থাকলে দেড় হাজার ছেলে স্বচ্ছন্দে আড়াই হাজারে তোলা যেত। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের খুব নাম বাজারে।

হাতাওয়ালা মান্ধাতার আমলের ভারী চেয়ার। টেবিল দেখে মনে হবে, আস্ত চারটে গুঁড়ির উপর পেরেক ঠুকে এই পুরু পুরু তক্তা বসিয়ে দিয়েছে। পাকাপোক্ত কাজ। পঞ্চাশ বছর আগে ইস্কুলের জন্মকালে এইসব আসবাব গড়া হয়ে থাকে তো হেসে-খেলে আরও অমন দুই পঞ্চাশ কেটে যাবে।

কি হবে তোমাদের এ ঘণ্টায়?

পয়লা বেঞ্চিতে সকলের প্রথম-বসা ছেলেটা বলে, বাংলা হবে সার।

অন্য সকলে কলরব করে ওঠে, গল্প—গল্প হবে।

গল্পের নামে ওদিককার 'এ' সেকসনের ছেলেগুলোও সচকিত হয়েছে। নতুন সার যখন, নিশ্চয় বেশ নরম আছেন; তাঁর কাছে আবদার চলবে। তারাও চেঁচিয়ে দল ভারী করে: গল্প সার।

মহিম প্রশ্ন করেন, কে আছেন তোমাদের সেকসনে?

রামকিঙ্করবাবু। তিনি আসেননি।

মহিম বললেন, আচ্ছা, গল্পই হবে। চেঁচিয়ে গল্প করব, তোমরাও শুনতে পাবে। তার আগে পড়াটা হয়ে যাক। ততক্ষণ তোমরা কিন্তু চুপ করে থাকবে। কোথায় পড়া?

সামনের বেঞ্চির সেই ভাল ছেলেটা বলে, ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর।

ও, সেই যে পোষা কুকুরের সঙ্গে বনের বাঘের দেখা। কুকুর খায়-দায় ভাল, কিন্তু গলায় শিকলের দাগ—সেই তো? আচ্ছা,

পড়ার গল্পই হবে আগে। ভাল খাবে জেনেও কেন বাঘ গৃহস্থ-বাড়ি যেতে চাইল না, সেইটে বলব।

ভাল ছেলেটা বলে, কাল জগদীশ্বরবাবু সার পড়িয়ে গেছেন। সমস্ত কথার মানে লিখে আনতে বলেছিলেন বাড়ি থেকে। আমি নিয়ে এসেছি।

বাহাদুরি নেবার জন্য খাতা থেকে গড়গড় করে পড়ে শোনাচ্ছে : সমস্ত লিখেছি। ব্যাঘ্র মানে বাঘ, পালিত মানে প্রতিপালিত, কুকুর মানে সারমেয়।

সহসা তুলতুলে একখানা হাত এসে পড়ে মহিমের মুখ ফিরিয়ে ধরছে ওদিকে। দেবশিশুর মতো টুকটুকে এক ছেলে। গল্প শুরুতেই ভেস্তে যায় দেখে থাকতে পারেনি, সিট ছেড়ে উঠে এসেছে। আধো-আধো মিষ্টি সুরে বলে, গল্প সার। ও সমস্ত নয়, গল্প—

দু-তিনটে ছেলে হাত নেড়ে ডাকছে তাকে : চলে আয় মলয়, অমনি করে বুঝি! সারের গায়ে কেউ হাত দেয়?

মহিমকে বলছে, নতুন ছেলে সার, জানে না। পরশুদিন ভর্তি হয়েছে। কখনো ইস্কুলে পড়েনি। ওকে কিছু বলবেন না।

অনেক তো বলবার ইচ্ছে করে কোলের উপর বসিয়ে। ক্লাসের ছেলেগুলো মানা করছে। মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে—আহা, কাউকে এখনো পর ভাবতে শেখেনি। ভালবেসে গায়ে হাত দিয়েছে, একেবারে কিছু না বলে পারা যায় কেমন করে?

বললেন, নাম তোমার মলয়? দিব্যি নাম। ভাই-বোন কজন তোমরা?

তুই হতভাগা চেয়ার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিস। মুখ টিপলে দুধ বেরোয়—কী সাহস রে বাবা! যা, সিটে গিয়ে বোস।

হুঙ্কার দিয়ে রামকিঙ্কর ঘরে ঢুকছেন। মুখ নড়ছে, সর্বক্ষণ সুপারি চিবান। গালের দুই প্রান্তে চিবানো সুপারির কষ বেরিয়ে পড়ছে। ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিমের একেবারে পিছনে

তিনি, 'বি' সেকসনের এলাকার মধ্যে। তাকিয়ে দেখে মহিমও চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

রামকিঙ্কর বলেন, অত এলাকাড়ি দিচ্ছেন কেন মশায়? যা ভাবছেন, সে গুড়ে কিন্তু বালি।

কি ভাবছি?

হি-হি করে হেসে রামকিঙ্কর বলেন, চেহারায় ধরেছেন ঠিকই। ভাল ঘরের ছেলেই বটে, চৌধুরিবাড়ির ছেলে। কিন্তু টোপ গেঁথে গেছে, নজর দিয়ে আর মুনাফা নেই। দাশু পড়াচ্ছে। বয়স কম হলে কি হয়—দাশু খলিফা লোক, মাথায় খুব প্যাঁচ খেলে—ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠিনে। 'বি' সেকসনে বলতে গেলে আমারই বুকের উপরে তিন তিনটে দিন চরে-ফিরে বেড়াল, আমি পারলাম না, দাশু ঠিক বড়শি গেঁথে তুলে নিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্করের তাড়া খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে মলয় জায়গায় গিয়ে বসেছে। আর সে এদিকে তাকায়নি, হয়তো বা কাঁদছে বসে বসে। বিরক্তি চেপে নিয়ে মহিম বললেন, আমি কিন্তু একেবারে কিছু ভাবিনি। ক্লাসে নতুন এসেছি, ছেলেদের সঙ্গে চেনাশুনো করে নিচ্ছি।

হতে পারে। মহিমের আপাদমস্তকে বার দুয়েক দৃষ্টি বুলিয়ে রামকিঙ্কর ভ্রূকুটি করলেন : সদ্য আমদানি! উঁ, গোঁফও তো ওঠেনি ভাল করে। তা বেশ, সবে তো কলির সন্ধ্যে—আজকে ভাবেননি, ভবিষ্যতে বিস্তর ভাবতে হবে। কিন্তু দরজা হাঁ-হাঁ করে কী রকম পড়ানো মশায়! বাইরের গোলমাল ঘরে আসে, ঘরের গোলমাল বাইরে চলে যায়। ক্লাসে এসে দুয়োরটা আগে এঁটে দেবেন। নিজের কায়দা অপরকে দেখতে দেবেন কেন?

নিজ হাতে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হেলতে দুলতে 'এ' সেকসনের দিকে চললেন। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিলেন।

কি আছে রে?

অঙ্ক—

খিঁচিয়ে উঠলেন রামকিঙ্কর : সবে এই ছুটোছুটি করে এলাম, অঙ্ক এখন কিরে ? অঙ্ক হবে বিকেলবেলা।

রুটিনে আছে সার।

থাকবে না কেন ? চিত্তবাবুর রুটিন তো ! নিজে কস্মিনকালে ক্লাসে যাবেন না, একে তাকে পাঠিয়ে কাজ সারেন—বুঝবেন কি করে রোদে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আবার তক্ষুণি বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষানোয় কি ঠ্যালা ! ইতিহাস কখন ?

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সার।

সেইটে এখন হয়ে যাক। বের কর ইতিহাসের বই।

এইটথ ক্লাসের ক্লাসটিচার রামকিঙ্করবাবু—'এ' সেকসনের। চিরকাল ধরে এইটথ আর নাইন্থ ক্লাসে পড়াচ্ছেন, অন্য মাস্টারের মতো অনুযোগ নেই। অন্যের অনুপস্থিতিতে চিত্তবাবু কখনো-সখনো দু-এক ক্লাস উপরে দিতে গেছেন—রামকিঙ্করই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : বয়সকালে দিলেন না, কেন সার বুড়ো বয়সে ঝামেলায় ফেলেন ! জানিই বা কী ! এককালে জানতাম, এখন বেমালুম হজম করে বসে আছি। নতুন ক্লাসে চোখে সর্ষের ফুল দেখব।

অন্য মাস্টাররা বলেন, তা উনি বলবেন বইকি ! তিন ছেলে রোজগেরে। টুইশানি একটা-দুটো হলে ভাল, না হলেও অচল হবে না। রামকিঙ্করবাবুর মতন ভাগ্য কার !

রামকিঙ্কর বলছেন, ইতিহাসের কোন্‌খানে পড়া—শাজাহান ও তাজমহল ? পড়ে এসেছিস ভাল করে ? একটা এদিক-ওদিক হলে পিতৃদত্ত নাম ভুলিয়ে দেব।

ছেলেরা চুপ করে আছে। পিতৃদত্ত নামের মতো শক্ত ব্যাপারের মানে বুঝবার এখনো বয়স হয়নি। রামকিঙ্কর সহসা সদয় হয়ে বললেন, লিখে ফেল ওটা আগাগোড়া। লেখাই আসল। যত্ন করে খুব ধরে ধরে লিখবি।

ইতিহাসের বই খুলে নিল সমস্ত ছেলে। টেবিলের উপর পা আগেই তোলা ছিল, অতঃপর রামকিঙ্কর চোখ বুঁজলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসার ধ্বনি। আবার সামলে নিচ্ছেন। ইতিহাস লেখা বন্ধ করে ছেলেরা কাটাকাটি খেলা শুরু করেছে। প্রয়োজনে পড়ে এরা নানা রকম নিঃশব্দ খেলার আবিষ্কার করেছে। তাতে আপত্তি নেই, শব্দ না হলেই হল। তারপরে সারকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন জেনে সাহস ক্রমশ বেড়ে যায় ওদের। খেলার রকমফের চলছে। এ-ওর পেন্সিল কেড়ে নিচ্ছে, বই ছুঁড়ে দিচ্ছে—বলের মতো লুফে নিচ্ছে আবার। চিমটি কাটছে পরস্পর। জায়গা বদলাবদলি করে এর কাছ থেকে ওর কাছে গিয়ে বসছে। একজনের বই পড়ে গেল এরই মধ্যে মেঝেয়। ঘুমলে কি হবে, ক্ষীণতম শব্দও কানে এড়ায় না। রামকিঙ্কর তাড়া দিয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে, এইও—

ছেলেরা থতমত খেয়ে একবার তাকায়। তারপর যথারীতি খেলা চলতে থাকে। ওটা কিছু নয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ আওয়াজ। চোখ না খুলেই চলে ওটা। তিরিশ বছর ধরে এই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাসে কানামাছি খেল, যা ইচ্ছে কর—শব্দ না হলে শঙ্কার কিছু নেই।

বাইরের কয়েকটা ছেলে অল্পদিন আগে ভর্তি হয়েছে। তারা অতশত বোঝে না। লেখা শেষ করে একটি এসে ডাকছে, সার—

অন্য ছেলেরা হাত নেড়ে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে প্রাণপণে তাকে ডাকছে জায়গায় ফিরে এসে বসবার জন্য। ছেলেটা হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো সকলের আগে লেখা দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে চায় মাস্টার মশায়ের কাছে।

হয়ে গেছে সার।

ঘুমের মধ্যে রামকিঙ্কর সাড়া দিয়ে ওঠেন, উঁ—

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, রামায়ণে আছে। রামকিঙ্কর মাস্টারমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ আসন্ন। চক্ষের পলকে পট-

পরিবর্তন। ছেলেরা যে যার জায়গায় বসে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগে লিখে যাচ্ছে।

সার, লেখা শেষ হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে? দেখি।

একটানে খাতা কেড়ে নিয়ে নিদ্রারক্ত চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে রামকিঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: শাজাহানে কোন্ শ, তাজমহলে কোন্ জ?

ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। তবু দোনলা বন্দুকের দুই গুলি একসঙ্গে তাক করায় ঘাবড়ে গিয়ে বলে, তালব্য-শ—উঁহু, দন্ত্য-স।

মূর্ধন্য-ষ কেন হবে না?

মূর্ধন্য-ষ সার—

আর চিলে যেমন করে ছোঁ মারে, চাদরের নিচে থেকে বাঁ-হাতখানা বেরিয়ে এসে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে আচমকা দিল হেঁচকা টান। ডান হাতের দুটো আঙুল বেঁকে চিমটার মতো হয়ে চেপে ধরেছে তার কনুয়ের কাছটা। চামড়ার উপরে পাক পড়ছে।

লাগছে কেমন—মিষ্টি?

নতুন নিয়মে ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়া বন্ধ। হেডমাস্টারের কড়া নিষেধ। লাইব্রেরি-ঘরের কোণে আলমারির একটু আড়াল করে বিশ-পঁচিশ গাছা বেত থাকত, মাস্টারমশায়রা দরকার মতো নিয়ে যেতেন। বেয়ারাদের এখন সমস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনুনে পোড়ানোর জন্য। বুড়ো শিক্ষকরা মুখ তাকাতাকি করেন: মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি, স্পেয়ার দ্য রড এণ্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড—শাস্ত্রবাক্য রয়েছে। সে বাক্যের অন্যথাচরণ করে দিন-কে-দিন কী হতে চলল! শুধু রামকিঙ্করের দৃকপাত নেই: বয়ে গেছে, বেতের কি গরজ? বলি, আঙুল দুটো তো কেটে নিচ্ছে না! ছেলেরা বলে, রামকিঙ্কর সারের আঙুল নয়—লোহার সাঁড়াশি। আঙুল দিয়ে দেহের উপরে ওই প্রক্রিয়াটির নামকরণও হয়েছে ভাল—মধুমোড়া।

মোড়া দিতে দিতে রামকিঙ্কর প্রশ্ন করেন, মিষ্টি লাগছে তো? মধুর মতো?

এই ব্যাপার হচ্ছে, পিছনে আবার এক হাঁদারাম এসে দাঁড়িয়েছে। আহা রে, বড়-বড় চোখ, থোপা-থোপা চুল—। কিন্তু গতিক বুঝে ছোঁড়াটা এখন সরে পড়বার তালে আছে। সে সুযোগ দিলেন না রামকিঙ্কর। পয়লাটাকে ছেড়ে ধাঁ করে তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন খাতাখানা। যেন সমরে নেমেছেন—যে সামনে এগুবে, কোনমতে তার নিষ্কৃতি নেই। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন খাতায়। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটার দিকে। আবার পড়লেন। কোথাকার হতভাগা রে—একটা ভুল রাখে না। একটা লাইন বাঁকা নেই—ই-কার উ-কার এমন কি একটা মাত্রার অবধি হেরফের নেই। আগাপাস্তলা অভেদ্য বর্ম পরে এসেছে যেন। খাতাটা গোল করে পাকিয়ে তাই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে: সিটে গিয়ে বোস। একবারে হয় না, আরও লেখ। দু-বার তিনবার ধরে ধরে লেখ ভাল করে। তিনবার হয়ে গেলে আসবি, তার আগে নয়।

সমস্ত ক্লাসে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে আয় রে, অন্য কার হল—

কারও হয় নি। হবেও না ঘণ্টার মধ্যে। পুরানো ছেলে তারা, বহুদর্শী—এ দুটোর মতো হালফিলের ভর্তি হওয়া নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে রামকিঙ্কর পুনশ্চ চোখ বুঁজলেন।

ঘণ্টা পড়তে রামকিঙ্কর চোখ মেলে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে যাবার মুখে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন।

ভায়া নতুন এসেছ কিনা—শুনছিলাম তোমার পড়ানো। ক্লাসে গোল হয় কেন? বদনাম হয়ে যাবে।

মহিম বলেন, গোল কোথা? বোঝাচ্ছিলাম। একেবারে শব্দ না করে পড়ানো যাবে কেন?

আমি তবে পড়াই কি করে? তিরিশ বছর হয়ে গেল। কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি। সুখময় চক্কত্তির নাম শুনেছ—ছোট আদালতের জজ। আমার ক্লাসের ছাত্র। হাফ-ইয়ার্লিতে ইংরেজিতে পেল তের। পড়াতে লাগলাম। এন্যুয়েলে উঠে গেল তিরনব্বুই। স্বভাবচরিত্র পালটে গেল। একেবার চুপচাপ থাকে, সাত চড়ে কথা বলে না। হাকিম হয়ে এজলাসে বসে এখনো তাই। সেই অভ্যেস রয়ে গেছে—সারাটা দিন চুপচাপ, রা কাড়ে না মুখে।

মহিমের কাঁধে হাত দিয়ে একসঙ্গে বেরচ্ছেন ক্লাস থেকে। বলেন, তুমি ভাই বড্ড শব্দ করে পড়াও। 'এ' সেকসনের অসুবিধে হয়। ফুসফুস বড্ড খাটাও তুমি। নতুন আনকোরা কিনা, বিষদাঁত ভাঙেনি। লাইনে এসে পড়েছ যখন, তিরিশ-চল্লিশ বছর চালাতে হবে। নেচেকুঁদে একদিনে সব বুঝিয়ে দিলে তো পরে থাকল কি? ফুসফুসেই বা সইবে কেন?

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ডি-ডি-ডি কামরা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। মাস্টাররা এক ক্লাস থেকে বেরিয়ে অন্য ক্লাসে যান—হচ্ছে-হবে করে পরস্পর একটু গল্প-সল্প করে ওরই মধ্যে যে ক'টা মিনিট কাটিয়ে নেওয়া যায়। ছেলেরাও ক্লাস ছেড়ে বেরোয় মাস্টার বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে। হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে থাকলে পেরে ওঠে না তেমন। রামকিঙ্করকে ডি-ডি-ডি ডাক দিলেন, শুনুন এ দিকে। ইস্কুলে ক'টায় এসেছেন?

সাড়ে দশটায়।

লিখেছেন তাই বটে। সাড়ে-দশও নয়, দশটা-পঁচিশ। এসেছেন এগারোটার পরে।

রামকিঙ্কর চুপ করে আছেন।

কি বলেন। ভেবেছেন আমি টের পাইনে?

হাত কচলে রামকিঙ্কর বলেন, আজ্ঞে না। সে কি কথা!

আপনি অন্তর্যামী। আপনার অজান্তে এ ইস্কুলে কোনটা হতে পারে ?

দেরি করে এসে দশটা পঁচিশ কেন তবে লিখলেন ?

ভুল হয়ে গেছে।

কালও দেরি হয়েছিল আপনার। রোজই হয়।

আজ্ঞে—

কেন হয়, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবারে অনেকগুলো কথায় রামকিঙ্কর জবাব দিলেন: বউমা বড়ি দিয়ে বেগুনের ঝোল করেছিলেন। নতুন বেগুন উঠেছে এখন, ঝোল খেতে খাসা লাগে। আবার সামনের উপর বসে বউমা এটা খান ওটা খান করেন। তা মজা করে খাব, তার জো আছে ? ভয়ে ভয়ে মরলাম চিরকাল। আপনার কথা মনে পড়ে গেল—খাওয়া ফেলে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটবার দিশে পাইনে। তবু তো দেরি। এবারটা মাপ করে দিন, আর দেরি হবে না।

মাস্টারদের তিনি আতঙ্ক, ডি-ডি-ডি বড় প্রসন্ন হন শুনে। আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বিশেষ করে এই রামকিঙ্কর—বয়সে অন্তত দেড়গুণ যিনি হেডমাস্টারের। মৃদু হেসে তিনি এগিয়ে গেলেন। অর্থাৎ রামকিঙ্করের ব্যাপার মিটল। দ্রুত খানিকটা এগিয়ে মহিমের কাছে এলেন। বলা নেই কওয়া নেই, নিজের চাদরটা নিয়ে মহিমের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন।

মহিম সবিস্ময়ে তাকান। ডি-ডি-ডি বলেন, কী সর্বনাশ! বিনি চাদরে এতক্ষণ ক্লাস করলেন নাকি ? আজকের দিনটা আমার চাদর নিয়ে ক্লাসে যান। কাল থেকে চাদর নিয়ে আসবেন।

মহিম এইবারে লক্ষ্য করলেন, চাদর সব মাস্টারের কাঁধেই। কনেস্টবলের যেমন কোমরে চাপরাস, মাস্টারের তেমনি চাদর গলায়। ডি-ডি-ডি বলেন, ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের তফাৎ থাকা চাই তো একটা—চাদর হল তাই।

এই এক খেয়াল হেডমাস্টারের। চাদর চাই-ই চাই, নয় যেন ভারিক্কি হয় না। মহিমের ভাল লাগে না। চাদরের সঙ্গে বিশ-ত্রিশ বছর বয়সও যেন বাড়তি চাপিয়ে দিলেন কাঁধের উপর। চপলতা মানা। ইস্কুলের এলাকার ভিতর মুখ গম্ভীর করে থাকতে হবে, এমনি সব নির্দেশও যেন নামাবলীর মতন চাদরের উপর লেখা রয়েছে। বুড়ো না হয়ে পাকা মাস্টার হওয়া যায় না—চাদর জড়িয়ে জবরদস্তি করে যেন তাই বুড়ো করে দেওয়া হল।

সামনের ছোট উঠানের প্রান্তে জলের ঘর। অনেকগুলো কল সারবন্দি—ছেলেরা সব পাশাপাশি জল খাচ্ছে। রামকিঙ্করও জল খাচ্ছেন তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের মতন কলে হাত পেতে। জল খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন, জগদীশ্বরবাবু অদূরে। লিসার বোধহয় তাঁর, দাঁড়িয়ে দেখছেন। অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে রামকিঙ্কর বলেন, আমি মশায় জলটা একটু বেশি খাই। পঞ্চাশজন মাস্টারের জন্য চারটে কুঁজো—জল তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। অমন মাপা গেলাসের জল খেয়ে আমার পোষায় না।

জগদীশ্বর বলেন, ও সমস্ত কি বললেন আপনি হেডমাস্টারের কাছে? কাল আপনার দেরি কোথা? একসঙ্গেই তো দুজনে এলাম।

রামকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন : বটেই তো! দেরি আজকে হয়েছে, কাল হয়নি।

তবে হাঁ বলে ঘাড় নাড়লেন কেন? হেডমাস্টারকে বলতে পারতেন সে কথা।

এক গাল হেসে রামকিঙ্কর বললেন, উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। যা বলে 'হাঁ' দিয়ে যেতে হয়।

বলেছেন কিন্তু আর দেরি হবে না কোনদিন—

রামকিঙ্কর নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বললেন, তিরিশ বছরের চাকরিতে অন্তত পক্ষে তিনশ বার বলেছি অমন। ওঁকে বলছি, ওঁর আগে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন তাঁকে বলেছি কত দিন। তার আগের

জনকেও বলেছি। বউমার পাঁচ ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর নেই—অতগুলোকে সামাল দিয়ে তবে তো রান্না চাপাবেন! সময়ে আসা ভাগ্যিভোগা একদিন হল তো দশ দিন হবে না। ক'দিন আর খাব বলুন মশায়। তাই বলি খেয়ে নিই, ইস্কুল তো আছেই। কিন্তু বুঝিয়ে বলতে গেলে শুনছে কে? ঘাড় নেড়ে দিয়ে সরে পড়া ভাল।

॥ চার ॥

টিফিনের ঘণ্টা একটু ঠুন-ঠুন করেছে কিনা, একতলা দোতলা তেতলার সকলগুলো ঘর থেকে একসঙ্গে তুমুল আওয়াজ। হু-উ-উ-উ—। দেড় হাজার সোডার বোতলের মুখ ফেটে একসঙ্গে জল উৎসারিত হচ্ছে, এই গোছের একটা কথা মনে আসে। তিন ঘণ্টা কাল ছিপি-আঁটা অবস্থায় যেন ক্লাসের বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে সাজানো ছিল, লহমার মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বারান্দা, হল, দুই উঠোন ভরে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি মারামারি। ইস্কুলে আসবার সময় একজন-দুজন পাঁচজন-দশজন করে আসে। ভারতী ইনস্টিট্যুশন যে কত বড় ব্যাপার, পরিমাণটা তখন ধারণায় আসে না।

অজয়-বিজয় দুই ভাই। মুখের চেহারা প্রায় এক রকম—দুই ভাই সেটা বলে দিতে হয় না। দু-ভাই রোজ পোশাকও এক রকমের পরে আসে। সাদা হাফপ্যাণ্ট আর সাদা হাফসার্ট। সদ্য পাট-ভাঙা—ভাঁজগুলো সরলরেখায় স্পষ্ট হয়ে থাকে। ওয়ার্নিং-ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মোটরগাড়ি গেটে এসে দাঁড়ায়; দু-ভাই নেমে পড়ে যেন নাচতে নাচতে দোতলায় উঠে যায়। গাড়ি সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় পলক না ফেলতে। তখন গাড়ির ভিতরে থাকে আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়ে। মাস্টারমশায়রা

অনেকে দেখেছেন। আজকে জগদীশ্বরবাবু হন-হন করে ঢুকছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন অজয়-বিজয়ের গাড়ি। থমকে দাঁড়ালেন অমনি গেটের পাশে। মেয়েটাকে এক নজর দেখে নেওয়া, বয়সের ফারাক তখন মনে থাকে না। এই ব্যাপারে দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল নাম সই করতে। হেডমাস্টার অদূরে, অতএব দশটা সাতাশই লিখলেন, রামকিঙ্করের মতো সময় চুরি করতে যাননি। দেরি হওয়ার দরুন নামের নিচে যথারীতি লাল পেন্সিলের দাগও পড়ল। তবু এক ধরনের তৃপ্তি পলকের ওই দেখে নেওয়ার মধ্যে। কথার কৌশলে জগদীশ্বর ক্লাসের মধ্যে মেয়েটার পরিচয়ও নিয়েছেন। অজয়-বিজয়ের বড় বোন। ভাই দুটোকে ছেড়ে দিয়ে অফিসে চলে যায়, ভাল কাজ করে কোন অফিসে। এত সমস্ত জেনে নিয়েছেন জগদীশ্বরবাবু।

টিফিনের ঘণ্টায় আধবুড়ো একটি লোক অজয়-বিজয়ের টিফিন নিয়ে এসেছে। বেশি কিছু নয়—দুটো করে সন্দেশ আর কাচের কুঁজোয় জল। রোজই দেখা যায় লোকটাকে, এবং রোজই এই এক জিনিস। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে গরম গরম পকৌড়ি ভাজে টিফিনের এই সময়টা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে অনেক ছেলে শালপাতার ঠোঙায় পকৌড়ি কিনে খাচ্ছে। সন্দেশ হাতে নিয়ে বিজয় করুণ চোখে তাকায় সেদিকে। একটা ছেলে বলল, কি গো, লোভ হচ্ছে? খাবে?

বিজয় বলে, সন্দেশ খাও না তুমি একটা।

উঁচু ক্লাসের ছেলে। সে মুখ বাঁকায়: দূর, সন্দেশ কেন খাব? যা নরম—জিভে লেপটে যায় কাদার মতো।

একটু পরে, যেন মহৎ একটা ত্যাগ স্বীকার করছে এমনি ধরনের মুখ করে বলে, তা দাও একটা সন্দেশ। আমি পকৌড়ি দিচ্ছি দুটো। একটার বদলে দুটো দিচ্ছি—খাও।

দুটো পকৌড়ি দু-ভাই তারা ভাগ করে নিয়েছে। পরম আনন্দে

তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। ওদের সেই লোকের দিকে চেয়ে বলল, তুমি তো আর-কিচ্ছু দেখতে পাও না মথুর। সন্দেশ আর সন্দেশ।

মথুর হেসে বলে, মা ঠাকরুন তাই বলেছেন যে। তিতু ময়রার ছু-আনাওয়ালা সন্দেশ নিয়ে যাবে ছুটো করে। তোমরাও কিছু বলনা তো দাদাবাবু।

অজয় বলে, পকৌড়ি ভাল, ডালমুট ভাল, ফুচকা ভাল। আমরা এই সব খাব এখন থেকে, বুঝলে ?

মথুর বলে, শক্ত কিছু নয়—রোজই কিনে আনা যায়। এক একদিন একরকম। তোমাদের খাবার ইচ্ছে, আমি কেন এনে দেব না ? তবে মা টের পেলে আস্ত রাখবেন না। পইপই করে বলেছেন, সন্দেশ ছাড়া অন্য-কিছু তোমাদের পেটে না যায়।

বিজয় বলে, আমরা কিছু বলব না। জিজ্ঞাসা করলে বলব, সন্দেশ খেয়েছি। টের পাবে কেমন করে মা ?

তবুও চিন্তাকুল ভাব মথুরের।

বিজয় বলে, আজকে পকৌড়ি হল যা-হোক একখানা করে। কাল ডালমুট নিয়ে আসবে। কেমন ?

মথুর বলে, মুশকিল হল, মা তো মাত্তোর চার আনা করে পয়সা দেন। চারটে সন্দেশ টায়েটোয়ে হয়ে যায়। কিন্তু ডালমুট চার আনায় কুলোবে কিনা ভাবছি।

অজয় বলে, ফুচকা ?

শিউরে উঠে মথুর বলে, তাতে তো আরো বেশি খরচ।

অজয় অভয় দিল : ভেবো না মথুর-দা, আমার কাছে টাকা আছে। পিসেমশায় পূজোর সময় পাঁচ টাকা বাজার-খরচ দিয়েছিলেন। খরচ করিনি, তোলা আছে। সেই টাকা কাল তোমায় দিয়ে দেব। কাউকে কিছু বলব না। ফুচকা নিয়ে এস তুমি কাল।

মহিমের প্রথম দিন আজ, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পিছন দিকে হাত পড়ল একখানা। তাকিয়ে দেখেন মলয় চৌধুরি হাত রেখেছে তাঁর গায়ে। মুখ মলিন—ঠাহর করলে বুঝি চোখের কোণে জলের আভাস নজরে পড়বে।

তুমি খেলা-টলা করছ না মলয়?

ভাল লাগে না সার। আমি বাড়ি যাব। আপনি একবার দারোয়ানকে বলে দিন। মার জন্য প্রাণ পুড়ছে।

হাত জড়িয়ে ধরে গেটের দিকে নিয়ে চলল মলয়। চললেন মহিম—অমন করে বলছে, হাত ছাড়িয়ে নেবেন কেমন করে?

বাপে- ছেলেয় দারোয়ানি করে। দু-জনে গেটের পাহারায় আছে। ছেলেটা রীতিমতো পালোয়ান, দু-হাতে দুই পাল্লার রড এঁটে ধরে বুক চিতিয়ে আছে—ভাবখানা, কে কত ক্ষমতা ধর এগোও এদিকে। বুড়ো দারোয়ান খানিকটা আগে থেকে ভিড়টা চারিয়ে দিচ্ছে—সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গেটের উপর না পড়ে। হেডমাস্টারের সই-দেওয়া টিফিন-পাশ যাদের আছে, তারাই শুধু বেরতে পারবে। আর বেরবেন মাস্টারমশায় ও গার্জেনরা।

মহিমের কাছে এগিয়ে এসে বুড়ো দারোয়ান হুঙ্কার দেয়, পাশ?

মহিম হতবুদ্ধির মতো তাকালেন। দারোয়ান বলে, পাশ নেহি তো ভাগো। বজ্জাত, বাঁদর—

করালী কখন পিছন দিকে এসেছেন, হো-হো করে হেসে উঠলেন: পাশ লাগবে না দরোয়ানজি, টিচার ইনি। নতুন এলেন। বয়স কম দেখেছে কিনা, ছাত্র বলে ধরে নিয়েছে। কাঁধে চাদরটা ছিল, সেইটে রেখে এসেই গোলমাল। বাইরে বেরবেন বুঝি? আমি বেরচ্ছি, আসুন।

নাঃ, আমার গরজ নেই। ছেলেটা যাবে-যাবে করছে।

মুখ টিপলে দুধ বেরোয়, বাইরের টান ধরেছে এর মধ্যে? বাইরে যাবে তো গার্জেনের চিঠি নিয়ে এস। বিনি-পাশে যেতে

চায়, আস্থা বুঝুন ঐটুকু ছেলের। এই এক কায়দা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে—টিফিনের প্রথম মুখে বড্ড চাপ পড়ে তো—পাশ-ওয়ালাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোলমালে এমনি ছু-পাঁচটা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে বেরোয়।

মলয়ের দিকে ফিরে রসিকতা করে করালী বলেন, সে ঝোঁক কেটে গেছে বাবা। আজকে আর সুবিধে হবে না। লেট করে ফেললে যে। ঘণ্টা পড়তে না পড়তে ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তবেই হবে।

ছেলেটা কি বুঝল, কে জানে। মুখখানা আরও বিষণ্ণ করে চলে গেল। করালী বলেন, আসুন না ঐ মোড় অবধি। পান খাওয়াব। দরোয়ানজি, মাস্টারমশায়কে চিনে রাখ। আর যেন ভুল হয় না।

মহিমের পান খাবার গরজ নেই, কিন্তু করালীবাবুর হাত এড়ানো যায় না। টানতে টানতে নিয়ে চললেন। পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন অন্য এক মাস্টার। সলিলবাবু। দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, মাথা-ভরা টাক, ছু-চোখ কোটরে বিলুপ্ত। কিন্তু ছুটেছেন বাতাসের বেগে।

করালী চোখ টিপে বলেন, মজাটা দেখুন।

চেঁচাচ্ছেন, ও সলিলবাবু, শুনুন। দরকারি কথা আছে একটা, শুনে যান।

বারংবার ডাকাডাকিতে সলিলবাবু পিছনে চেয়ে একটি বার হাত ঘুরিয়ে আরও বেগ বাড়িয়ে দিলেন।

ও সলিলবাবু, আপনার জামাইয়ের চাকরি হয়েছে। খবর পেয়েছেন ?

হুঁ-উঁ-উঁ—একটা অব্যক্ত স্বর বের করে সলিল অদৃশ্য হলেন।

করালী হেসে উঠলেন : দেখলেন ! গুপ্ত-অধ্যাপনার শাহান-শা। এখন হল যাত্রা-মুখ—ছেলে ছাত থেকে পড়ে গেছে শুনলেও অমনি হাত ঘুরিয়ে দিয়ে ছুটবেন।

মহিম বুঝতে পারেন না : গুপ্ত-অধ্যাপনা ব্যাপারটা কি ?

করালী বলেন, সে কি মশায়, মাস্টারি লাইনে এলেন, গুপ্ত-অধ্যাপনা জানেন না? ওই তো আসল। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট টুইশান। কিন্তু আমার অ্যাদ্দিনেও ওটা রপ্ত হল না। দু-বেলায় মোটমাট চারটের বেশি পেরে উঠি নে।

সলিলবাবু পড়াতে চললেন এখন?

করালী বলেন, সকালে বিকালে রাত্রে তো আছেই। ঠাসা একেবারে, নিশ্বাস ফেলার ফাঁক নেই। বাড়তি একটা এই ইস্কুলের মধ্যে সেরে আসেন। চিত্তবাবুকে রোজ চা খাইয়ে জপিয়ে-জাপিয়ে রেখেছেন—টিফিনের পরের পিরিয়ডটা ফাঁক করে দেন। চালাকি কেমন! বেঁটেবইতে লিখলে রেকর্ড থেকে যাবে, অমুক মাস্টারের ক্লাসে রোজ একে তাকে পাঠানো হচ্ছে—সেজন্য আলাদা শ্লিপ পাঠানো হয়। বাইরে থেকে লোকে জানে, বড্ড সাদাসিধে গোবেচারা মাস্টার আমরা—ভিতরে ঢুকলে হরেক মজা দেখবে।

পানের দোকানের সামনে দাঁড় করালেন। ডবল-খিলি কিনে দিলেন এক পয়সা দিয়ে। সিগারেট কিনতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মহিম খান না। মাস্টার মানুষের পক্ষে রীতিমতো সদাব্রতের ব্যাপার। তবে করালীকান্তর কথা স্বতন্ত্র, ষোলআনা মাস্টার তিনি নন। তার উপরে বড় ঘরের ছেলে। মুক্কি, লক্কা, গোলা আর লোটন—চার রকমের একশ'টা পায়রা পুষতেন তাঁর ঠাকুরদাদা—শুধুমাত্র পায়রার বাবদে কত টাকা যেত মাসে মাসে! আজকে পয়সা না থাকুক, মেজাজটা যাবে কোথা?

বলেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি, বলুন দেখি।

সম্পর্ক কী আবার!

তাই বললে কি শুনি মশায়। সম্পর্ক না থাকলে নিজে লিখে পাঠিয়ে চাকরি দিতেন না। বলতে চান না, সেইটে বলুন।

মহিম বলেন, সত্যি এমন কিছু নয়। আমার বাবা ছেলেবেলায় কিছুদিন তাঁকে পড়িয়েছিলেন—মহৎ ব্যক্তি তিনি—

কথা লুফে নিয়ে করালী বলেন, সে তো একশ বার। হাজার বার। কেউ কেউ আবার কি বলে জানেন?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললেন, ছোট ভাইয়ের মতন আপনি। বলেই ফেলি। কেউ কেউ বলছে, ভিতরের খবরাখবর নেবার জন্য প্রেসিডেণ্ট একজন নিজের লোক বহাল করলেন। তাই যদি হয়, আমি তো দোষের কিছু দেখি নে। এত নামডাকের ইস্কুল, ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ বেরিয়েছেন এখান থেকে—আজ তিন বছর ধরে যা রেজাণ্ট হচ্ছে, বলবার কথা নয়। যাবতীয় গুহ্য ব্যাপার কর্ত্তাদের কানে যাওয়া উচিত। নয় তো সংশোধন হবে কি করে? ওই যে সলিলবাবু ইস্কুল ছেড়ে টুইশানি সারতে চললেন—কিংবা ওই চিত্তবাবু বেঁটেখাতায় প্রকাশ্যে মারেন, আবার চোরাই-মার মারেন শ্লিপ পাঠিয়ে। বড়দের গা ছুঁতে সাহস পান না, মরণ যত হাবগবা নরম মাস্টারের।

একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, এই আমার কথা ধরুন। ভাল মানুষ বলে আমি কোনদিন কিছু বলতে যাই নে। কেয়ারটেকারের কাজ কত রকমের তার অন্ত নেই। চক-স্টিক কিনতে এখন এই কলুটোলা ছুটলাম। এমনি তো হামেশাই। কত টাকা দেয় বলুন তো—পাঁচটি টাকা মাসিক এলাউন্স। আর লাইব্রেরিয়ান করে রেখেছে, সেই জন্যে পাঁচ। ভাবতে পারেন? কমিটির মিটিং শিগগির—আমি দরখাস্ত দিয়েছি। কথায় কথায় আপনি আমার সম্বন্ধে একটু শুনিয়ে রাখবেন তো প্রেসিডেণ্টকে। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি, সেইজন্য বললাম কথাটা।

ভাবেন কি এঁরা! প্রেসিডেণ্ট যেন পেয়ারের লোক—হরবখত দেখাসাক্ষাৎ হয়, গল্পগুজব চলে! ইস্কুলের খবরাখবরের জন্য তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে আছেন, করালীবাবুর জন্যে সুপারিশ করে দিলেই এলাউন্স সঙ্গে সঙ্গে দুনো-তেদুনো হয়ে যাবে!

রামকিঙ্কর, দেখা গেল, ছেলেদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে ডান হাতে মুখ মুছতে মুছতে জলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জামার হাতা আর বুকের উপরটা ভিজে জবজবে। উপরে গিয়ে উঠলে জগদীশ্বর বললেন, এ কি রামকিঙ্করবাবু, একেবারে চান করে এসেছেন!

ছোঁড়ারা নড়িয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। পিছন দিকে তুটো চোখ যদি থাকত দেখে নিতাম শয়তানগুলোকে।

জগদীশ্বর বলেন, বড্ড জল খান আপনি। অত ভাল না। এই তো থার্ড পিরিয়ডের মুখে অতক্ষণ ধরে খেলেন।

রামকিঙ্কর হাসিমুখ করে বলেন, সকলের একবার টিফিন, আমার ঘণ্টায় ঘণ্টায়। থার্ড পিরিয়ডে একবার হয়ে গেছে, আবার এই। আরও হবে।

কিন্তু অত খেয়ে এলেন, বউমা সামনে বসে খাওয়ালেন। এখন আবার জলে পেট ভরাতে হচ্ছে?

চটে গিয়েছেন রামকিঙ্কর : কোথা থেকে গল্প বানান, বলুন তো শুনি।

বানাব কেন? আপনিই তো বললেন হেডমাস্টারকে।

উপরওয়ালার কাছে মানুষে কত কি বলে থাকে। সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? সত্যি কথা শুনুন তবে। বউমা হারামজাদী ভারি দজ্জাল—অজাতের ঝাড়। ইস্কুলের মাইনে একুশ টাকা পয়লা তারিখে নিয়ে নিয়েছে। টুইশানির পনের টাকা বরাবর সাত তারিখের মধ্যে আদায় করে দিই। ক'দিন থেকে তাগাদা দিচ্ছে। তা টুইশানি কোথা এখন? সে ঘোড়ার ডিম ও-বছরের সঙ্গে সঙ্গে ডিসেম্বরে খতম হয়ে গেছে। নতুন আর গাঁথতে পারি নি। বলবার জো নেই—বললেই ক্ষেপে যাবে। সন্দ করেছে তবু বোধহয়। এটা-ওটা ওজুহাত করে আজ তো মোটে রাঁধতেই গেল না ইস্কুলের আগে।

এত শিক্ষকের মধ্যে জগদীশ্বরের সঙ্গেই ভাবসাব বেশি। মনের তুঃখ তাঁর কাছে বললেন। বলে ফেলেই সামাল করে দেন : কাউকে

বলবেন না কিন্তু—খবরদার! হেডমাস্টার টের না পান। দশের কাছে তা হলে পশার থাকবে না।

টিফিন শেষ হওয়ার সামান্য একটু আগে দুখিরাম এক টুকরো কাগজ এনে মহিমের হাতে দিল: এম-আর-এস উইল প্লিজ টেক থার্ড-ই ইন দ্য ফিফথ পিরিয়ড। করালীবাবু যা বলে গেলেন, সেই বস্তু—শ্লিপ পাঠিয়ে চোরাই-মার মারা।

গগনবিহারীবাবু বলেন, এসে গেল তো? আসতেই হবে। নতুন মাস্টার আপনি তো ফোঁস করতে পারবেন না—এই চলল এখন একনাগাড়। কোন্ ক্লাস, না দেখে বলে দিতে পারি। থার্ড-ই—মিলেছে? কি পড়াতে হবে, বলে দিচ্ছি। অঙ্ক। ক্লাসে গিয়ে দেখবেন, মেলে কিনা। কার ক্লাস তা-ও বলে দিই তবে। খোদ ছোটবাবুর—চিত্রগুপ্তের। ভুলেও ক্লাসে যান না। আরে মশায়, হাতে ক্ষমতা আর হাতের কাছে বেঁটেখাতা রয়েছে—কোন্ দুঃখে ক্লাস নিতে যাবেন?

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অ্যাসিস্টাণ্ট-হেডমাস্টার চিত্ত গুপ্ত। থতমত খেয়ে গগনবিহারী থেমে গেলেন। মহিম ফিরে তাকিয়েছেন, হাতছানি দিয়ে চিত্তবাবু কাছে ডাকলেন: গ্রাজুয়েট সুশিক্ষিত মানুষ আপনি—পর পর তিনটে নিচের ক্লাসে দিয়ে মনে মোটে ভাল ঠেকছিল না। যান এবারে উপরের ক্লাসে। প্রেসিডেণ্ট আপনাকে বাজিয়ে দেখতে বলেছেন, তা 'বালক পাঠ' আর 'গণিত মুকুল' নিয়ে কী আর বাজানো যায়! বিস্তর কষ্টে তাই ব্যবস্থা করেছি। সিঁড়ি দিয়ে তেতলা উঠে যান। চৌকাঠের মাথায় নাম-লেখা বোর্ড ঝুলছে—থার্ড-ই। দেখে নেবেন।

উপরের ক্লাসে পড়াতে দিয়ে কৃতকৃতার্থ করেছেন—মুখে চোখে তেমনি এক গরিমার ভাব এনে চিত্তবাবু নিচে তামাক খাবার ঘরে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ফিরে এসে বললেন, বলে দিই একটা

কথা। ক্লাস ঠাণ্ডা থাকে যেন। ছেলেগুলো ভ্যাঁদোড়। ক্লাসের ভিতরে বসে কি কাজ করছেন, কেউ দেখতে যাবে না। কিন্তু গোলমাল হলে বাইরের লোকের কানে আসবে। তাই বুঝে কাজ করবেন।

কত কালের কথা, ভাবতে গেলে মহিমের এখনও সব মনে পড়ে। দুর্দান্ত ক্লাস থার্ড-ই'তে দুর্গানাম স্মরণ করে ঢুকে পড়লেন মহিম। দৈত্যসম একজন পিঠ-পিঠ ঢুকল—লম্বায় চওড়ায় এবং ওজনে মহিমের দেড়গুণ তো হবেই। গার্জেন ভেবে মহিম শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সার এই ক্লাসে পড়ি। জল খেতে গিয়েছিলাম।

টিফিনের পরে হাজিরা-বইটা আবার ডেকে নেওয়ার নিয়ম। সেই সময় ছাত্রের নামটা দেখে নিলেন : মণীন্দ্রমোহন ঘোষ। দেখা গেল, দৈত্য ঐ একটা মাত্র নয়—আধ ডজনের উপর। বড্ড বুক ঢিবঢিব করছে। তবু কিন্তু তাই নিয়ে মহিম পরবর্তী কালে দুঃখ করতেন। কী রকম ভরভরতি ক্লাস তখনকার! এক ছেলে দু-ছেলের বাপ কত জন বই-খাতা নিয়ে বেঞ্চিতে এসে বসেছে। মণি ঘোষের অবশ্য তা নয়। বয়স কমই, তবে স্বাস্থ্যটা বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। আর এখনকার ক্লাসের ছেলেদের তো দেখাই যায় না চোখে, হাইবেঞ্চির ফাঁকে উহ্য হয়ে থাকে। কলির শেষে সব বামন হয়ে যাবে, বেগুনতলায় হাট বসবে—সেই সব দিন এসে যায় আর কি!

মাথার উপর বনবন করে পাখা ঘুরছে, তবু দস্তুরমতো ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। দুর্বলতা দেখানো চলবে না। কারও মুখের দিকে না চেয়ে মহিম বললেন, কি অঙ্ক হচ্ছে তোমাদের?

টাইম এণ্ড ওয়ার্কস—

মণি ঘোষ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল : তার আগে এই অঙ্ক ক'টা করে দিন সার। হচ্ছে না।

মহিম ঘাড় নাড়লেন : এখন নয়, পরে।

একবার আড়চোখে তাকালেন মণির খাতার দিকে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্রেসিডেন্ট হেডমাস্টারকে পরখ করে দেখতে বললেন, তার আগে এই ক্লাসের ছেলেরাই পরীক্ষা করবে তাঁকে। ফাঁদের ভিতরে পা না দেওয়াই ভাল।

ক্লাসের কাজ হয়ে যাক, তারপরে ওইসব বাইরের অঙ্ক—। গম্ভীর ভাবে রায় দিয়ে মহিম পাটিগণিত খুললেন। খুব সহজ করে বোঝাচ্ছেন। একটা অঙ্ক ধরে তার ভিতর গল্প এনে ফেলছেন। এ জিনিসটা ভাল পারেন তিনি। সেই নন-কোঅপারেশনের সময়টা কলেজ ছেড়ে কিছুদিন হাটে-মাঠে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন নিরক্ষর চাষাভুষোর কাছে। ঢংটা ভোলেননি এখনো দেখা যাচ্ছে। নতুন মাস্টার সম্পর্কে কৌতূহল থাকায় ছেলেরা গোড়াতেই একেবারে নস্যাৎ করে না—শোনা যাক কি বলেন। কি বলছেন তা নিয়ে মাথাব্যথা নয়, কিন্তু বলার ধরনটা বেশ ভাল। হঠাৎ মহিমের কানে গেল—মণি ঘোষ ফিসফিসিয়ে বলছে, বিষম চালাক। এমনি করেই ঘণ্টা কাবার করে দেবে, গোলমালের মধ্যে মাথা ঢোকাবে না।

মহিমের অভিমানে লাগল। অঙ্কে অনার্স-পাওয়া মানুষ, আর উঁচু ক্লাসেরই একটি ছেলেকে অঙ্ক কষিয়ে থাকেন রোজ সন্ধ্যাবেলা। ছেদ টানলেন পড়ানোর। মণির দিকে চেয়ে বলেন, দাও খাতাটা তোমার। কিন্তু একটা কথা—

ক্লাসের সর্বত্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, অঙ্ক করছি আমি। কিন্তু বোর্ডের দিকে ফিরে অঙ্ক কষব, তোমরা সেই সময় গণ্ডগোল করবে না কথা দাও।

মণি ঘোষ প্রধান পাণ্ডা। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, টুঁ শব্দটি হবে না সার। আপনি করুন।

প্রথম অঙ্কটা হয়ে গেল। মহিম বললেন, টুকে নাও তোমরা।

মণির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে : এর মধ্যে হয়ে গেল?

উত্তর মিলিয়ে দেখ হয়েছে কিনা। তাড়াতাড়ি কর। এতগুলো কষতে দিয়েছ এই সামান্য সময়ের মধ্যে।

কেল্লা ফতে, বুঝতে পারছেন মহিম। এদের মন চিনে নিয়েছেন। আগের অঙ্ক মুছে ফেলে পরেরটা ধরেছেন ইতিমধ্যে। খটখট খটাখট —দ্রুতবেগে খড়ি চলেছে ব্লাক-বোর্ডের উপর। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এবারে ওই উপরের রাশিটা বাদ দিয়ে নিলেই উত্তর। বুঝতে পারছ ?

মণি বলে, আর করতে হবে না সার। বাকিগুলো বাড়িতে করব আমি। পাটিগণিতের যেখানটা হচ্ছিল, তাই হোক এবারে।

ক্লাস চুপচাপ একেবারে। ঘণ্টা পড়লে মহিম বেরুলেন, মণিও এল সঙ্গে সঙ্গে। বলে, পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি সার। আমাদের ক্লাসের বদনাম শুনে এসেছেন। কিন্তু রোজই নতুন এক একজন এসে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে হাতির মুণ্ড গণেশের ধড়ে চাপিয়ে—কোন রকমে সময় কাটিয়ে চলে যান। কিচ্ছু জানেন না তিনি, ধরেপেড়ে আচমকা ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছে—তিনি কি করবেন ? আমরাও তেমনি ঘায়েল করবার জন্য এইসব অঙ্ক ঠিক করে রেখেছি। আপনি বরাবর আসবেন সার, একটুও গোলমাল হবে না দেখতে পাবেন।

মাস্টারির সেই প্রথম দিনেই আত্মবিশ্বাসে মন ভরে গেল। থার্ড-ই'র ছেলেগুলো নাকি বাঘ—দুটো অঙ্ক কষেই বাঘের দল মহিম বশ করে ফেলেছেন। ছেলেরা সব সত্যি ভাল—মণি ঘোষ ভাল, মলয় ভাল। ভাল লাগছে না ওই মাস্টারমশায়দের। শিক্ষিত জনেরা মহৎ কাজের ভার নিয়ে আছেন, আর ফাঁক পেলেই ইনি ওঁর গায়ে কালি ছিটোবেন, এ কী রকম ব্যাপার! লিসার কাটলে সবাই ক্ষেপে যান ; আর মহিমের উল্টো—লিসার উপভোগ না করে ক্লাসে ছেলেদের মাঝে বসতে পারলেই বেঁচে যান যেন। অলিগলির অন্ধকার কাটিয়ে খোলা মাঠের ঝলমলে আলোয় আসার মতন।

সলিলবাবু ডাকছেন, দাঁড়ান মশায়, অত ছুটছেন কেন ? ক্লাস

তো আছেই। বছরের পর বছর কত ক্লাস করবেন, করতে করতে ঘেন্না ধরে যাবে। আলাপ-পরিচয় করি এক মিনিট—

পাশে এসে নিচু গলায় বললেন, করালীবাবু কি বলছিলেন তখন? আমার কথা কিছু?

মহিম ঘাড় নেড়ে দিলেন। চারু-দা ওঁরা বলতেন, সবচেয়ে বড় কাজ হল মানুষ গড়ে তোলা। সেই কাজে এসে পরনিন্দা-পরচর্চায় জড়িয়ে পড়বেন না। কিন্তু নাছোড়বান্দা যে সলিলবাবু। বললেন, তবে?

নিজের সম্বন্ধে বলছিলেন দু-এক কথা।

আছেন তো রাজার হালে। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান। ওঁর আবার কি কথা?

মহিম ইতস্তত করে বলেন, কেয়ারটেকারের এত কাজ—এলাউন্স মাত্র পাঁচ টাকা। এই সমস্ত আর কি—

সেই তো অনেক হে!

পতাকীচরণ ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। তিনি বললেন, কমিটি কাজটা নিলামে তুলে দিন। এলাউন্স এক পয়সাও দেওয়া হবে না, উল্টে মাসে মাসে কে কত দিতে পারেন ইস্কুলকে। আমার ডাক থাকল দশ টাকা।

সলিলবাবু বলেন, আমার পনের—

হেসে নিলেন খানিকটা। বলেন, দাদামশায়ের এক চাকর ছিল, সব জায়গায় তার দস্তুরি। একটা সন্দেশ কিনতে দিয়েছেন একদিন—কী আর করে—জিভে চেটে নিল সন্দেশটা। আমাদের করালীবাবুরও তাই। ইস্কুলের এক বোতল ফিনাইল কিনলেও সিকি পরিমাণ শিশিতে ঢেলে বাড়ি রেখে আসবেন। দুখিরাম জানে অনেক-কিছু, তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করবেন।

হেডমাস্টারের মুখ দেখতে পেয়ে নিমেষে তাঁরা ক্লাসে ঢুকে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কালীপদ কোনার পরিচালনা কমিটির মেম্বার—মাস্টারদের প্রতিনিধি, তাঁরা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন। তেমনি আর একজন মেম্বার চিত্তবাবু। হেডমাস্টার তো আছেনই।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন কালীপদ। পাঁচ-সাত জনে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। পতাকীচরণ, জগদীশ্বর ও সলিলবাবু আছেন। হৃদয়ভূষণ চার বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনিও গলা বাড়িয়েছেন পিছন থেকে। কমিটির মিটিং হওয়া সর্বোদয়-যোগ কিংবা কুম্ভমেলার মতন ব্যাপার। একবার হয়ে গেল তো আবার কবে হবে কেউ বলতে পারে না। সেক্রেটারি অবনীশ চাটুজ্জে ডাক্তার মানুষ, আর প্রেসিডেণ্ট হলেন এডভোকেট। এক জনের সময় হল তো অন্য জনের সময় হয় না। অথচ অনেক কাজ জমে আছে। কাল রাত্রে কালীপদবাবু ও চিত্তবাবু ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন সেক্রেটারির কাছে—কবে মিটিং হবে আলোচনার জন্য।

কি ঠিক হল বলুন। সেক্রেটারি কি বললেন ?

কথা বলতে বলতে কালীপদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। বললেন, পূজোর মধ্যে হয়ে উঠবে না। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে স্পোর্টস আর প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশন হবে, সেই সময়। এবারে অনেক কষ্টে প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারির সময় হল তো মুশকিল রায় মশায়কে নিয়ে। তিনি বৃন্দাবন চলে গেছেন।

রাখহরি রায় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। বুড়ো হয়ে কাজকর্ম থেকে রিটায়ার করে তীর্থধর্ম করে বেড়ান। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পিতামহ—তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হলে ক্ষেপে যাবেন বুড়ো একেবারে : ন-মাসে ছ-মাসে একবার তো বসবে, আমায় ছেঁটে ফেলার মানেটা কি ? জঙ্গল কেটে জলাজমিতে মাটি ফেলে ঠাকুরদা

মশায় ইস্কুল-ঘর বানালেন, আমি কেউ হলাম না—তৈরি রুটি ফয়তা দিতে এসেছ, তোমরা কারা হে চাঁদ? পিতৃপুরুষের জমাখরচ খুঁজে দেখো তো একটি পয়সা কেউ কখনো দিয়েছেন কিনা।

বড় কটুকাটব্য করেন বুড়ো, বাড়ি বয়ে গালিগালাজ দিয়ে আসেন। কাউকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হয় না।

জগদীশ্বর ক্ষেপে গিয়ে বলেন, রায় মশায় নেই আজ পাঁচ-সাত দিন। এদ্দিন কি হচ্ছিল—নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন আপনাদের সেক্রেটারি?

কালীপদ বলেন, ঘুমুবেন কি—রুগি দেখে সময় করতে পারেন না। রাত্রিবেলাও ঘুমুতে দেয় না। বলছিলেন সেই সব কথা।

ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

কালীপদকে সাহসী ও স্বাধীনচেতা বলে নাম বজায় রাখতে হবে মাস্টারমশায়দের কাছে। পরের বারের ভোট পাবার জন্য। সায় দিতে হবে অতএব সেক্রেটারির নিন্দায়। এঁরা যা বলবেন, অন্তত পক্ষে তার ডবল বাড়িয়ে বলতে হবে।

পতাকীচরণ বললেন, সময় নেই তবে ছেড়ে দেন না কেন?

কালীপদ হেসে বলেন, আজকে পশার আছে, কাল যদি না থাকে। তখন সময় কাটবে কিসে? হাঁকডাক করবেন কাদের উপর? এই যে দলে দলে সব পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরচ্ছে—ডাক্তারের গাদি লেগে যাবে। ওঁর মতন ক্যাম্বেল-ইস্কুলের ডাক্তারের কাছে কে তখন আসবে? এইসব ভেবেই আঁকড়ে রয়েছেন বোধ হয়।

পতাকীচরণ রসান দিয়ে বলেন, নতুন ডাক্তার লাগবে না, নিজেই তো মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছেন। মানুষ বেঁচে থাকলে তবে তো রুগি! সবাই বলে, অবনীশ ডাক্তারের হাতে রুগি ফেরে না। যমরাজের দোসর। তা উনি দেশের কাজও করেছেন বটে! দু-চারশ অমন ডাক্তার থাকলে দেশে আর খাদ্যসমস্যা বলে কিছু থাকত না। মানুষ না থাকলে কে খাবে?

কালীপদ বলেন, তবু গিয়ে একবার দেখে আসুন পশারটা। আমরা সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম, যে সময়টা রুগিপত্তর থাকবে না। কিন্তু কথা বলছেন তার মধ্যেও অমন পাঁচবার টেলিফোন। প্রেস্কৃপসন হাতে কম্পাউণ্ডার এসে ঢুকছে। উঠে উঠে রুগির সঙ্গে কথা বলে আসছেন।

পতাকী বলেন, হবেই। মাছ-মানুষ-মশা যত মারবে তত কোলঘেঁষা। ছিপে যত মাছ তুলবেন, চারে ততই মাছের ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে। মানুষও তাই।

জগদীশ্বর অধীর হয়ে বলেন, মস্করা রাখুন মশায়। পূজো এসে পড়ল, একশ গণ্ডা খরচ মাথার উপরে, পূজো-বোনাস চাই। আর এদ্দিন টালবাহানা করে রায়মশায়কে বৃন্দাবনে পার করে এখন বলছেন মিটিং হবে না।

কালীপদ বলেন, বোনাসের কথাবার্তা হয়ে গেছে। সকলে সই দিয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠান। হেডমাস্টারের পঞ্চাশ টাকা, চিত্তবাবুর চল্লিশ আর সকলের পঁচিশ করে নিজ দায়িত্বে দিয়ে দেবেন সেক্রেটারি। সেটা মিটিয়ে এসেছি একরকম।

করালীকান্ত বলেন, ঐ ছিটেফোঁটাই শুধু। আসল যে মাইনে-বৃদ্ধির ব্যাপার, সেটা কেবলই চাপা দিয়ে যাচ্ছে। তিন বছর অন্তর মাইনে বাড়ার কথা—কদ্দিন হয়ে গেল হিসাব করে দেখুন।

রামকিঙ্কর ছুটোছুটি করে আসছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, মাইনে বৃদ্ধি করে ওরা অখণ্ড হিমালয়পর্বত দিয়ে দেয়। আপনারাও যেমন! আমার সেবারে পনের আনা বৃদ্ধি হয়েছিল।

কালীপদ ঘাড় নেড়ে বলেন, উঁহু, আনায় তো হয় নি, ভুল বলছেন রামকিঙ্করবাবু।

মাইনে কুড়ি টাকা ছিল, একুশ করে দিল। কুড়িতে স্ট্যাম্প লাগত না। স্ট্যাম্পের দাম বাদ দিয়ে কত বেড়েছে, হিসাব করুন।

লাইব্রেরি-ঘরের সামনের বারান্দায় তখন অনেকে এসে জমেছেন। বেশ একটা গুলতানি হচ্ছে। সলিলবাবু বলেন, আমি মশায় মাইনে-বৃদ্ধি চাই নে। স্ট্যাম্প-কাগজে লিখে দস্তখত করে দিতে পারি। ওঁরাই বরঞ্চ দাবি করতে পারেন, ট্রেডমার্ক দেগে দেওয়ার দরুন। ভারতী ইনস্টিট্যুশন-ব্রাণ্ড আমরা, যেমন ওদিককার ওঁরা হলেন প্রাচী শিক্ষালয়-ব্রাণ্ড। ব্রাণ্ড দেখে লোকে টুইশানিতে ডাকে আমাদের, ব্রাণ্ড অনুযায়ী দর। মাস্টারি চাকরি ছেড়ে দিন—তখন আর কেউ ডাকবে না। সকালে বিকালে খোকাকে কোলে নাচানো ছাড়া কাজ থাকবে না আর তখন।

হৃদয়ভূষণ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ধরে সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, একটিবার মুখ খোলেন নি। নিশ্বাস ফেলে কতকটা যেন আপনার মনেই বললেন, সাধ ছিল ভারতীর পুরো মাস্টার হয়ে যাব চোখ বুঁজবার আগে। মফস্বলের হেডমাস্টারি ছেড়ে চলে এসেছি। সে বোধ হয় আর ঘটে উঠল না। চিরকাল প্রিন্স-অব-ওয়েলসই থেকে গেলাম। যেমন হচ্ছিল টেকো-এডোয়ার্ডের বেলা।

করালীবাবু ওদিকে হতাশভাবে মহিমকে বলছেন, মিটিং হল না, আমার তো ভাই সমস্ত বরবাদ। আপনাকে সেই বললাম—তারপরে মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি হেঁটে নতুন একজোড়া জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। কোন কালে মিটিং হবে, তখন কি আর মনে থাকবে ওঁদের? আবার তখন গোড়া থেকে তদ্বির।

হঠাৎ চিত্তবাবু বেরিয়ে এলেন: কি হচ্ছে আপনাদের? ছেলেরা আশেপাশে ঘুরছে—যা বলার থাকে, ঘরের ভিতর গিয়ে বলাবলি করুন গে।

মহিমকে একান্তে নিয়ে গেলেন: শুনুন সুখবর দিচ্ছি। প্রেসিডেন্টের কাছে হেডমাস্টার নিজে গিয়ে আপনার কথা বলে এসেছেন। আমি বলে দিয়েছিলাম, অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস—অ্যারেঞ্জমেন্ট-বইতে চোখ বুঁজে নাম ফেলা যায়,

ভাবতে হয় না। হাতে পেয়ে এমন মাস্টার কে ছাড়ে বলুন। আর ভারতী ইনস্টিট্যুশন, দেখতে পাচ্ছেন, সমুদ্র বিশেষ। ছাত্র-মাস্টার উভয় দিক দিয়ে। এ সমুদ্রে এক ঘটি জল ঢাললেই বা কি, তুলে নিলেই বা কি! একজন মাস্টারের কমবেশিতে কিছু আসে যায় না। হল তাই, চাকরি আপনার বরাবর চলবে। প্রেসিডেন্টের লোক আপনি—উন্নতি সুনিশ্চিত। কিন্তু ওঁদের ঐ খেয়োখেয়ির মধ্যে কখনো যাবেন না।

মহিমও তা চান না। কিন্তু নিজে কিছু না বললেও কানে শুনতে হয় অবিরত। লিসার-পিরিয়ডে কানের ভিতর তুলো ঢুকিয়ে বসে থাকতে পারেন না তো!

পূজোর ছুটি এসে যায়। ক্লাসে ক্লাসে সার্কুলার গেছে, দু-মাসের মাইনে দিয়ে দেবে সব বাইশ তারিখের মধ্যে। ইস্কুল খুলেই এগজামিন। ডি-ডি-ডি একদিন মিটিং করলেন মাস্টারদের নিয়ে: কোন বইয়ের কত দূর অবধি এগজামিন, এই হপ্তার মধ্যে লিখে আপনারা চিত্তবাবুর কাছে দিয়ে দেবেন। গত বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারপর খাতায় তোলা হবে। কম হবে না, অন্তত সিকি পরিমাণ বেশি হওয়া চাই আগের তুলনায়। গতবার এই নিয়ে না-হক কথা শুনতে হল সেক্রেটারির কাছে। কমিটিতেও উঠেছিল, কালীপদবাবুর কাছে শুনে দেখবেন।

বাইরে এসে গগনবিহারী ফেটে পড়লেন: রুগি দেখে সময় পায় না, সেক্রেটারির বয়ে গেছে প্রোগ্রেস মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে। বোঝেও কচু। সেক্রেটারির বাড়ি কে কে যায়, খবর নিয়ে দেখ। সকল মাস্টার নিয়ে ব্যাপার—মাস্টারদের কেউ বলতে যাবেন না বলে অমূল্যটা। কেরানি মানুষ—তা জন্মে কোনদিন কলম ছুঁয়ে একটা দুর্গানাম লিখতে দেখলাম না। কাজ একটা তো চাই —সে-ই গিয়ে সেক্রেটারির কাছে ধরিয়ে দিয়ে আসে।

ভূদেব বলেন, লাগিয়ে কি করবে? পড়ানো নিয়ে কথা— প্রোগ্রেস কম হয়ে থাকে, বেশ, দিচ্ছি এই পনের-বিশ দিনে বইয়ের আগাপাস্তলা পড়িয়ে। ডরাই নাকি?

চলল পড়ানো। জানুয়ারি থেকে যদি অর্ধেক আন্দাজ হয়ে থাকে তো বাকি অর্ধেক এই ক'দিনের ভিতর সারতে হবে। টানা পড়ে গেলেও তো হয় না। গগনবিহারী বলেন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। আমাদের কি, দিন ছুটিয়ে পাঞ্জাব-মেল।

ঘণ্টা বাজতে বাজতেই মাস্টাররা এখন ক্লাসে যান, ক্লাসে ঢুকেই গড়গড় করে পড়ান। মুশকিল হল, ভাল ছেলেও দু-একটা থাকে ক্লাসে। একটা যেমন অশোক। বেটা যেন মুখিয়ে থাকে : এইখানটা বুঝতে পারছি নে সার।

বাড়ি গিয়ে বুঝো—

বাড়িতে টিউটর নেই। বাবা টিউটর রাখবেন না। তাঁদের সময় টিউটর থাকত না, তবু তাঁরা ভাল হয়ে পাশ করতেন।

তবে বাবাই পড়াবেন। সকলে দিব্যি বুঝে যাচ্ছে, একলা তুমি না বুঝলে কী করতে পারি বাবা?

প্রমাণ হিসাবে একজন দুজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে হয়। শেষ বেঞ্চির কোণে দুটো ছেলে কাটাকাটি খেলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারেন। তাদের সামনের ছেলেটাও নিশ্চয় গল্পের বই পড়ছে হাই-বেঞ্চির নিচে রেখে। অমন অখণ্ড মনোযোগ নয়তো সম্ভবে না। গগনবিহারী তাদেরই ডাক করে বললেন, কি হে, বুঝতে পারছ না তোমরা?

রসভঙ্গে বিচলিত হয়ে তারা এক সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে ওঠে : হাঁ সার—

তবে? তোমার একার জন্যে প্রোগ্রেস আটক রাখা যায় না। বিশেষ সেসনের এই শেষ মুখটায়।

এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে তবু খানিকটা সময় চলে গেল। দিব্যি

বুঝিয়ে দেওয়া যেত এর মধ্যে। কিন্তু না, আশকারা দেওয়া চলবে না। তা হলে পেয়ে বসবে।

'ক্লাসটিচার' বলে বিশেষ ভাবে যাঁর উপরে ক্লাসের যাবতীয় দায়িত্ব। পতাকীচরণ থার্ড-বি'র ক্লাসটিচার। ক্লাসে গিয়ে তিনি বলছেন, কি রে, ছুটির দিনে কি করবি তোরা ? চাঁদা কেমন উঠছে ? ডি-সেকসনের, যা শুনছি, ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার। এক টাকা করে দিচ্ছে প্রত্যেকে, কেউ বাদ নেই। তবে তো চল্লিশ টাকা—বেশি ছাড়া কম নয়। অনন্তবাবুকে সিল্কের চাদর দেবে, বলাবলি করছে।

আবার থার্ড-ডি'র ক্লাসটিচার অনন্তও ঠিক অমনি কথা বলছেন। বি-সেকসন তো বিষম তড়পাচ্ছে। এবারে নাকি বসিয়ে দেবে তোদের। তাই নিয়ে তর্কাতর্কি আজ পতাকীচরণ বাবুর সঙ্গে— ব্যারিস্টার সিংহ সাহেবের ছেলে রয়েছে এই ক্লাসে, হারিয়ে অমনি দিলেই হল !

শঙ্কিত থার্ড-ডি'র ছেলেরা ছুটির পরে পরামর্শে বসেছে। বি-সেকসনের কি আয়োজন, ওদের সঙ্গে ভাবসাব করে জেনে নিতে হবে। ব্যারিস্টার সিংহের ছেলে বলে, দশ টাকা চাঁদা দেব আমি। দরকার হলে আরও দেব। হারাতেই হবে ওদের। আর দেখ, আমরা কি করছি না করছি কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না বুঝতে পারে। খবরদার !

রামকিঙ্করের নিচু ক্লাস—এইটথ-এ। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, পয়সা কে তাদের হাতে দেবে ? চাঁদা উঠেছে অতি সামান্য, পুরোপুরি পাঁচ টাকাও নয়। রামকিঙ্কর বেজার মুখে বলছেন, ছি-ছি, এত খেটেখুটে এইমাত্তর হল ? লোক-সমাজে কহতব্য নয়। তা ওই উনিশ সিকে কিসে খরচ হবে, ঠিকঠাক করলি কিছু ?

নাইনথ ক্লাস থেকে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সেই ছেলেটা বলে, গোড়ের মালা আসবে একটা সার। আর জলখাবার।

রামকিঙ্কর বলেন, পূজোর মুখে মিষ্টিমুখ—সেটা খুব ভাল। দিস

জলখাবার যেমন তোদের খুশি। সন্দেশ দিস, লেডিকেনি দিস। চপ-কাটলেট দিলেও খাব। ক'দিন আর খেতে পারব বল্। যা তোরা হাতে করে দিবি, চেটেপুঁছে খেয়ে নেব।

আবার বলেন, কিন্তু মালার বুদ্ধি কে দিয়েছে শুনি? গুচ্ছের জঙ্গল কিনে আনবি পয়সা দিয়ে। গোড়ের মালা ঝুলিয়ে নৃত্য করে বেড়াব নাকি? এক ঘণ্টা তো পরমায়ু—শুকিয়ে তার পরে আমসির মতো হয়ে যাবে। মফস্বল হলে পোষা গরু-ছাগলের মুখে দেওয়া যেত, কলকাতা শহরে তা-ও তো নেই।

ছেলেটা বলে, জলখাবার হয়ে যা বাঁচে, তাই দিয়ে তবে বই কিনে দেব সার। যে বই আপনি বলবেন।

রামকিঙ্কর বলেন, এই দেখ। ছেলেমানুষ তবে আর বলি কেন! বই কি হবে রে? পাহাড়প্রমাণ বই-টই পড়ে তবে তো শিক্ষক হয়েছি। বই বয়েই জনম কাটল—কোন বইটা না পড়া? বই দিতে যাস না, ওতে লাভ নেই।

ছাত্রেরা মুখ তাকাতাকি করে: তবে কি দেব সার?

কি দিবি? তাই তো, ঝট করে কী বলি এখন তোদের! এক কাজ করিস, টাকাপয়সা যা বাঁচে নগদ ধরে দিস আমায়। আমি কিনে নেব। ভেবে দেখতে হবে কিনা, কোন জিনিস হলে আমার কাজে আসবে।

নগদ টাকা দেওয়া—সেটা কী রকম! মালা হলে গলায় পরিয়ে দিত, বই হলে ফিতে বেঁধে নাম লিখে টেবিলের উপর রাখা চলত। তা নয়—টাকা দিলাম আর রামকিঙ্কর সার পকেটে ফেললেন, কাকপক্ষী কেউ টের পাবে না। তবু ক্লাসটিচারের কথার উপর আপত্তি চলে না। ঘাড় নাড়তে হল মনমরা ভাবে।

॥ ছয় ॥

পুজোর ছুটিতে মহিম আলতাপোল এসেছেন। কার কাছে যেন শুনলেন, সূর্যকান্ত ঘোষগাঁতির বাড়ি এসে উঠেছেন ছোট মেয়েকে নিয়ে। লীলা বিধবা। আহা, এইটুকু বয়সে বিধবা হল—মেয়ে বড় দুর্ভাগা। বাপও তাই—এই লীলার কাছেই থাকতেন তিনি শেষটা। বেহান ঠাকরুন অর্থাৎ লীলার শাশুড়ি কালো মুখ করতেন, বাক্যবাণ ছুঁড়তেন অন্তরাল থেকে। তা হলেও পাখির আহারের মতো বুড়োমানুষের দুই বেলা সামান্য চাট্টি ভাতের অসুবিধা ছিল না। সে বাসা ভেঙেছে। জামাই ননীভূষণ মারা গেল।

মরল আবার গলায় দড়ি দিয়ে। বিষয়ভোগী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দূরদর্শী পূর্বপুরুষেরা জমিজিরেত রেখে গিয়েছেন—তার মধ্যে কতক খাসখামার, কতকটা প্রজাবিলি। বছর খাওয়ার ধান আসত খাসখামার থেকে। আর প্রজার কাছ থেকে যা আদায়পত্র হত, তাতে মালেকের মালখাজনা দিয়ে কাপড়চোপড় ও হাটবাজারের খরচা হয়ে যেত। ছেলেপুলেদের নড়ে বসতে না হয়, কর্তারা তার নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দিনকাল পালটে গিয়ে সব হিসাব বানচাল করে দিল। ক্ষেতে ধান হয় না আর তেমন। জিনিস-পত্র অগ্নিমূল্য, আদায়পত্তর যা হয় এখন তাতে কুলিয়ে ওঠা যায় না। চাকরিবাকরি করে দুটো বাইরের পয়সা ঘরে আনার দরকার।

কিন্তু বংশের নিয়মে ননীভূষণ তেমন-কিছু লেখাপড়া শেখেনি, ধরাধরির মুরুব্বিও নেই—তাকে চাকরি কে দেবে? মায়ের গঞ্জনা—শেষটা লীলাও শাশুড়ির সঙ্গে যোগ দিল। খুব ঝগড়াঝাটি হল একদিন। দেখা গেল, ঘরের আড়ায় দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস এঁটে ননী মরে আছে। এবং তার পরেই বিধবা মেয়ে নিয়ে সূর্যকান্ত ঘোষ-গাঁতির পোড়ো ভিটেয় চলে এলেন।

জাঁকিয়ে পূজো হয় সূর্যবাবুদের বাড়ি। অঞ্চলের মধ্যে এই পূজোর নাম। যেখানেই থাকুন পূজোর সময় অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য তিনি বাড়ি আসতেন। এখন তো কায়েমি হয়েই আছেন। সব শরিকের এজমালি পূজো ছিল আগে। কিন্তু মাস্টার মানুষ সূর্যবাবু অংশমতো খরচা দিয়ে উঠতে পারেন না। জ্যাঠতুত ভাইয়ের ছেলেরা সব কৃতী হয়েছে—একজন স্টেশনমাস্টার, একজন পুলিশ-ইনস্পেক্টর। আরও একজন কেদারনাথ কোন জমিদারি এস্টেটের তহশিলদার। পয়সাকড়ি আয় করে কেদারনাথই সবচেয়ে বেশি। পিতৃপুরুষের নাম নষ্ট হতে দেবে না, আর মানুষজন খাওয়ানোয় বিষম ঝোঁক তার। তা দোষ নেই কেদারনাথের। বলেছিল, সমান সমান অংশ দিতে বলছি নে কাকামশায়; কমবেশি যা-হোক কিছু দেবেন। কিন্তু সূর্যবাবুর এক পয়সাও দেবার উপায় নেই। দেবেন কোত্থেকে? মাস্টারি চাকরিতে দুর্গোৎসব হয় না। তা-ও তো রিটায়ার করে মেয়ের ভাতে ছিলেন এতাবৎ।

অগত্যা পূজোয় ইদানীং আর সঙ্কল্প হয় না সূর্যকান্তর নামে। উনি কিছু মনে করেন না। বলেন, খুনখুনে বুড়ো—কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া। মা-দুর্গা কোন হিতটা করবেন এখন আমার?

মান-অপমান গায়ে বেঁধে না সূর্যবাবুর। রানী বরাবর মাথা ভাঙাভাঙি করত: যেও না বাবা, সামনে দাঁড়িয়ে যেচে কেন অপমান নিতে যাবে? কিন্তু এর বাড়ি তার বাড়ি যখন কুমোর এসে পাটের উপর প্রতিমা গড়তে বসে যায়, সেই সময়টা মন কেমন করে ওঠে ঘোষগাঁতির ভিটার জন্য। গ্রামে চলে আসেন। সেই আগেকার মতন আসুন রে বসুন রে—নিমন্ত্রিত মানুষজনের আদর-অভ্যর্থনা। চাকরে ভাইপোদের উপর হম্বিতম্বি, বউমাদের ও নাতিনাতনিদের সম্পর্কে খবরদারি। ঠিক যেন এক-সংসারে আছেন তাঁরা—একান্নবর্তী পরিবার। ভাইপোদের যে খারাপ লাগছে তা নয়।

বারোমাস তারাই নিজ নিজ সংসারের কর্তা। এই ক'টা দিন গার্জেন হয়ে সূর্যকান্ত ধমকধামক দিচ্ছেন, দায়িত্বের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তি পেয়ে যায় যেন তারা। বেশ লাগে। এমন কি চটুলতা ও দুষ্টুমি পেয়ে বসেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগাবাবুকে। পুরানো দীঘির মাঝখানে পদ্ম তুলতে গিয়ে ডোঙা আটকে গেল। ফিরে আসতে পারেন না। জল নেই যে সাঁতার কেটে আসবেন। পাঁকে কোমর অবধি ডুবে যায়—হেঁটে আসবারও উপায় নেই। কাকামশায়ের কানে গিয়ে সে কী চেঁচামেচি! দারোগা-গিন্নি সাত ছেলের মা মনোরমা টিপিটিপি হাসেন স্বামীর গালি খাওয়া দেখে।

এই সূর্যকান্ত। তাঁর বিপদের কথা শুনে মহিম ঘোষগাঁতি ছুটলেন। বাড়ির ঠিক নিচে নদী। এবং সতীঘাট। সূর্যকান্তর প্রপিতামহী ওখানে সতী হয়েছিলেন। ঘাটের আর কিছু নেই—শুধুমাত্র প্রাচীন এক বটগাছ। নদী দূরে সরে গেছে। নদীও ঠিক বলা চলে না আর এখন। বর্ষাকালটা ছাড়া জল চোখে পড়ে না—জঙ্গল। হোগলা কচুরিপানা আর হিঞ্চেকলমির দাম এপার-ওপার ছেয়ে থাকে। গরু-ছাগল চরতে চরতে দামের উপর দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যায়। এখন এই দশা, আর সেকালে খেয়ানৌকায় পারাপারের সময় অতি-বড় সাহসীরও বুক কাঁপত। হ্যালিডে সাহেবের বর্ণনায় আছে। হ্যালিডে সাহেব তখন জেলার কালেক্টর—নিজের চোখে-দেখা অনেক ঘটনা নিয়ে বাংলা দেশ সম্বন্ধে বই লিখে গেছেন। সতীর কাহিনীও তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

বটগাছের পাশেই ছিল শ্মশান। লক্ষ মড়া পুড়েছে বলে মহাশ্মশান বলত। মড়া নামিয়ে রেখে শ্মশান-বন্ধুরা ওই বটতলায় বিশ্রাম নিত। জোয়ারের জল খলবল করত বটের শিকড়-বাকড়ের মধ্যে। রামজীবন মারা গেলেন—সূর্যকান্তর প্রপিতামহ তিনি। প্রথম পক্ষের ছেলে, ছেলের বউ আর নাতিনাতনিরা। শেষ বয়সে আবার নতুন সংসার করেন তিনি। শাস্ত্র অনুযায়ী

বিধবার সজ্জা নেওয়ার কথা—কিন্তু নতুন-বউ আড় হয়ে পড়ল। চুড়ি ভাঙবে না, সিঁদুর মুছবে না, থানকাপড় পরবে না, বিধবা হবে না সে কিছুতে।

তারপর আসল মতলব প্রকাশ হয়ে পড়ল। সতী হবে নতুন-বউ, স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরবে। ছেলে-বউরা বোঝাচ্ছে: বাবা বিস্তর দিন সংসারধর্ম করে সকল সাধ মিটিয়ে ষোলআনা সমস্ত বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেলেন, তুমি কোন দুঃখে এই বয়সে চিতায় উঠতে যাবে মা?

নতুন-বউ কানে নেয় না। হাসিখুশি নিরুদ্বিগ্ন ভাব। কপাল জুড়ে সিঁদুর দিয়েছে, টকটকে রাঙা-পাড় শাড়ি পরেছে। দু-চার ক্রোশ দূরের মানুষও আসছে সহমরণের ব্যাপার দেখতে। শ্মশান-ঘাটা নয়, মেলাক্ষেত্র যেন। বউ-ঝি সকলে কৌটা ভরে সিঁদুর এনে একটুখানি নতুন-বউয়ের কপালে ছুঁইয়ে সিঁদুরকৌটা আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখছে।

এ সমস্ত হ্যালিডে'র বর্ণনা। তিনি তখন গ্রামের শেষে মাঠের উপর তাঁবু খাটিয়ে আছেন। সেদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পাখি-শিকারে বেরিয়েছেন, পথের মধ্যে কে এসে বলল সতীর বৃত্তান্ত। সতীদাহ-আইন পাশ হয় নি, তা হলেও অনুষ্ঠানের কথা কালেভদ্রে শোনা যেত। শিকার বন্ধ করে সাহেব শ্মশানমুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

জনতা তটস্থ হয়ে সাহেবের পথ করে দেয়। চিতার ধারে নতুন-বউয়ের কাছে সোজা চলে গেলেন সাহেব। মুনসির মারফতে কথাবার্তা। সাহেবের কথা মুনসি বউকে শোনাচ্ছেন, বউয়ের কথা ইংরেজি করে দিচ্ছেন সাহেবের কাছে।

সাহেব বললেন, তুমি মরছ কেন?

বউ বলে, স্বামীর কাছে যাচ্ছি। স্বামী ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

আগুনে পুড়ে মরার কী কষ্ট, তোমার ধারণা নেই।

বউ হেসে বলে, খুব কষ্ট বুঝি? দেখি, প্রদীপটা আন দিকি তোমরা কেউ।

চিতায় ঘী ঢালছে। আর একটা বড় ঘৃতের প্রদীপে সাতটা সলতে ধরিয়ে দিয়েছে—ওই প্রদীপ থেকে চিতায় আগুন দেবে। বউয়ের কাছে প্রদীপ এনে রাখে। বাঁ-হাতের বুড়ো-আঙুলটা বউ প্রদীপের উপর ধরল।

হ্যালিডে লিখছেন: আশ্চর্য দৃশ্য। আঙুল কুঁকড়ে গেছে, মাংস-পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। বউ ফিরেও তাকায় না, হাসিমুখে কথা বলছে আমার সঙ্গে। আমি আর না দেখতে পেরে ফিরে চলে এলাম। লোক-মুখে শুনেছি, দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসতে হাসতে বউ আগুনের মধ্যে ঢুকে স্বামীর শব জড়িয়ে ধরে যেন আরামের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বর-বউ ঘোষগাঁতি ঢুকবার মুখে সতীঘাটে প্রথম পালকি এনে নামায়। বিয়ের পর গাঁয়ের কনে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, এই বটতলায় গড় হয়ে সে আশীর্বাদ কামনা করে: সতী-মা, মাগো, দু-জনের মধ্যে বিচ্ছেদ না আসে যেন জীবনে মরণে। রানী যেদিন যায়, সে বলেছিল এই কথা। লীলাও বলেছিল।

সতীঘাটের রাস্তা ধরে মহিম সূর্যকান্তর বাড়ি এলেন। বেড়ার ধারে সূর্যবাবু—কয়েকটা ভেরেণ্ডাগাছের ডালপালা বেড়ে গিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, কাটারি নিয়ে ঠুকঠুক করে কাটছেন সেইগুলো। মহিম এসে পায়ের ধূলো নিলেন।

কি রে? অ্যাঁ, তুই? কবে বাড়ি এলি? চল্, ঘরে গিয়ে বসি।

নড়বড়ে চৌরিঘর লেপেপুঁছে খানিকটা বাসযোগ্য করে নেওয়া হয়েছে। লীলা দুটো মোড়া রেখে গেল দাওয়ার উপর। একটা কথা বলল না—যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি চলে গেল। অনেক

দিন পরে মহিম তাকে দেখলেন। কী হয়ে গেছে মেয়েটা! চোখে জল আসবার মতো হয় চেহারা দেখে।

সূর্যবাবু বললেন, আমি আর ক'দিন! তখন মেয়েটার কি হবে, সেই চিন্তা। কাঁচা বয়স—লম্বা জীবন পড়ে আছে সামনে। আমার বুড়ো-ঠানদিদি সতী হয়েছিলেন সেকালে। নিজের মেয়ে হলেও ভাবি, সেই রেওয়াজটা আজকের দিনে থাকলে অনেকের অনেক ভাবনা চুকে যেত।

তারপর মহিমকে জিজ্ঞাসা করেন, কলকাতায় আছিস তা জানি। মাছনার সাতু ঘোষ নিয়ে গেছে। তা আছিস বেশ ভাল?

মহিম বলেন, ভাল আছি মাস্টারমশায়। সাতু-দা'র কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ইস্কুলের শিক্ষক হয়েছি।

সূর্যকান্তর বার্ধক্যের ঘোলাটে দৃষ্টি জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাকালেন তিনি মহিমের দিকে। তাকিয়ে রইলেন। মহিমের মনে হয়, স্নেহ আর আশীর্বাদ ঝরে ঝরে পড়ছে তাঁর দুই চোখ দিয়ে। বললেন, ভাল করেছ। এর চেয়ে মহৎ বৃত্তি আর নেই।

বলতে বলতে আবার ওই মেয়ের কথা এসে পড়ে: আমার বড় ভাইপো, যে হল পুলিশের দারোগা—তার শালা এসেছে এখানে। ছেলেটা কলকাতায় পড়াশুনো করে। ওরা নাকি চেষ্টা করে ট্রেনিং-ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারে লীলাকে। পাশ করলে করপোরেশন-ইস্কুলে মাস্টারি দেবে। তুই কি বলিস মহিম?

মহিম বলেন, ভালই তো। আপনি চিরকাল আগলে থাকতে পারবেন না। ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

আমিও তাই ভাবছি। তারপর, কোন ইস্কুলে তুই আছিস সেটা তো শুনলাম না।

ভারতী ইনস্টিট্যুশন।

ওরে বাবা! বিরাট ইস্কুল। আমাদের এ সমস্ত উইঢিবি,

সে হল হিমালয়পর্বত। কত সব ছাত্র বেরিয়ে এসে নাম করেছেন। ভাল ভাল ছাত্র পড়িয়ে সুখ পাবি, সার্থক জীবন তোর।

মহিম বলেন, বাইরে এত নাম, কিন্তু মাইনেপত্তর বড় কম।

কত? সূর্যকান্ত প্রশ্ন করলেন।

অনার্স-গ্রাজুয়েট বলে আমার হল চল্লিশ। আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের বিস্তর কম।

সূর্যকান্ত বলেন, খাতায় লিখিস চল্লিশ টাকা। দেয় কত আসলে?

দেয়ও চল্লিশ।

ক-বারে দেয়? মানে, আমাদের এইসব ইস্কুলে যেমন যেমন ছাত্রের মাইনে আদায়, সেই অনুপাতে কাউকে দশ কাউকে পাঁচ এমনি ভাবে দিয়ে যায়। তোদের কি নিয়ম?

আমাদের একদিনে দেয়। মাসের পয়লা তারিখে।

ধমকের সুরে সূর্যকান্ত বলেন, কী আশ্চর্য, এই ইস্কুলের নিন্দে করছিস তুই! শিক্ষককে কি আর লাটসাহেবের বেতন দেবে?

জানেন না মাস্টারমশায়, অফিসের দরোয়ানও আজকাল চল্লিশ টাকায় পাওয়া যায় না।

সূর্যকান্ত বলেন, কিন্তু তোর কাজ তো দরোয়ানের নয় বাবা, শিক্ষকের। মাইনের টাকা ক'টি ছাড়া দরোয়ানের আর কি প্রাপ্য আছে? তোদের অন্য দিকে পুষিয়ে যায়।

টুইশানি মেলে, সে কথা ঠিক। সাত-আটটা টুইশানিও করেন কেউ কেউ। তাঁরা পুষিয়ে নেন এই দিক দিয়ে। কিন্তু আমি পারিনে মাস্টারমশায়। দুটো করতেই হাঁপিয়ে উঠি, ছাড়তে পারলে বেঁচে যাই। আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সূর্যকান্ত বলেন, পোষানোর কথা আমি বাবা ওসব ভেবে বলি নি। ছেলেদের মধ্যে বসে পড়ানো, তিলে তিলে পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা—কত বড় আত্মতৃপ্তি! বাচ্চা ছেলে বড় করে তুলে মায়ের যে আনন্দ, এ হল তাই। স্রষ্টার আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ। টাকা-

পয়সা আর ভোগসুখই জীবনের সব নয়। আদর্শহীন জীবন হল পশুর জীবন।

এই এক আজব মানুষ। দুর্লভ হয়ে আসছেন এঁরা। সূর্যকান্ত মোড়ায় বসেছেন, মহিমকেও মোড়া দিয়েছিল লীলা। কিন্তু মহিম উঁচু আসনে বসলেন না। তালপাতার চাটাই নিয়ে মেঝের উপর তিনি বসে পড়লেন। ঠিক পায়ের নিচে এমনি ভাবে বসা ভাগ্য।

সতীঘাটের বিশাল বটগাছের মাথা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সূর্যকান্ত। বলতে লাগলেন, চারু আমার ছাত্র। জীবন দিল সে আদর্শের জন্য। আমার প্রপিতামহী সেকেলে গৃহস্থঘরের সাধারণ স্ত্রীলোক। কিন্তু যা তিনি আদর্শ বলে জানতেন, তার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন। বিদেশি সাহেব মুগ্ধ হয়ে লিখে গেছে। ওঁরা সবাই এক জাতের—চারু আর বুড়ো-ঠানদিদির মধ্যে আমি তফাৎ দেখি নে। দেখ, একটা কথা বলি তোকে। মানুষ গড়ার কাজ নিয়েছিস, এ ব্রত অবহেলা করবি নে। ক্লাস হচ্ছে মন্দির—বালগোপালদের নিত্যসেবা সেখানে। মন্দিরে যাবার মতো মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবি।

কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ। ঘোষগাঁতিতে মহিম পুরো বেলা কাটিয়ে এলেন। ফিরে আসছেন—মনে হচ্ছে, মানুষ হিসাবে অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেছেন।

বড় বোন সুধা একদিন গল্পে গল্পে বললেন, খুশির কথা মনে আছে মহিম—সাতু ঘোষের বোন খুশি? অবুঝের মতন ঘাড় নাড়লে শুনি নে—তুমি আমার বিদ্বান ভাই, মনে আছে সব, চালাকি করা হচ্ছে। খুশির মা'র বড্ড পছন্দ তোমায়। একদিন সে কী কাণ্ড—

মেয়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেনগিন্নি নিজে বলতে লাগলেন, খুশির মা একদিন গরুর গাড়ি করে সেই মাছনা থেকে

মেয়ে বয়ে নিয়ে আমাদের এখানে হাজির। পাড়াগাঁয়ে যা কখনো কেউ করে না। এসে বলেন, পদতলে মেয়ে নিয়ে এলাম মহিমের মা। ঘরে তুলে নেবেন না লাথি মেরে ছুঁড়ে দেবেন, বিবেচনা করুন। চিঁড়ে-তুধ-বাতাসা-আমসত্ব খাইয়ে মিষ্টি কথায় তো বিদেয় করলাম। কি হবে, তারপর ভেবে মরি। সুধা এদিকে আড় হয়ে পড়েছে : সে হবে না, ওই ভিটেকপালি নাক-থ্যাবড়া মেয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াবে সে আমরা চোখ মেলে দেখতে পারব না।

সুধা বলেন, আমিই বুদ্ধি দিলাম, সোজাসুজি না পার তো বড় মামার দোহাই পেড়ে দাও। কুষ্ঠি ঘাঁটাঘাঁটির বাই আছে তাঁর—পাত্রীর জন্মপত্রিকা চেয়ে পাঠাও। বিচারে যা আসবে সেই মতো হবে।

হেসে উঠে বলেন, মেয়েওয়ালা ভাগানোর আচ্ছা এক ফিকির এই কুষ্ঠি। ভাগিয়ে দিয়ে আমরা মুখে হা-হুতাশ করছি, তারাও চটতে পারছে না।

মা বললেন, এদ্দিনে মেয়েটার সম্বন্ধ গেঁথেছে একটা। পশ্চিম-বাড়ির ছোটবউ বলছিল। অঘ্রানে বিয়ে, পাকা-দেখা হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, জজ-আদালতের পেস্কার। মেয়ের মা নাকি মুখ অন্ধকার করে বেড়াচ্ছেন। ছোটবউ বলছিল, কী চোখে আমাদের ঠাকুরপোকে দেখেছেন, কোন পাত্রই তার পরে পছন্দ হয় না। তা বলে ওই কুচ্ছিৎ মেয়ের সঙ্গে কী করে হয়! খরচপত্রও তেমন করতে পারছে না, শুনলাম। সাতুর ব্যবসা নাকি বড্ড টালমাটাল যাচ্ছে।

মহিমের কাছে এটা নতুন খবর। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হন না। বললেন, আরও হবে, ব্যবসা একেবারে যাবে। অধর্ম করে ব্যবসা চলে না। সাধে মা ছেড়েছুড়ে চলে এলাম?

সুধা বলেন, মুখে তো রাজা মারেন, উজির মারেন। এই দাওয়ার উপর বসে সেবারে লম্বা-লম্বা কথা বলে গেলেন।

মহিম বলেন, কোন দিন না শোন যে জেলে গেছেন সাতকড়ি ঘোষ। নুন খেয়েছি, নিন্দেমন্দ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে পথে চলেছেন, তাই আছে ওঁর অদৃষ্টে।

সেনগিন্নি শিউরে উঠে বলেন, তুই ভাল করেছিস বাবা বেরিয়ে এসে। ধর্মপথে থেকে শাক-ভাত জুটলেও সে অনেক ভাল।

ছুটি দেড় মাসের, কিন্তু বিজয়া-দশমীর পরদিন মহিম টিনের স্যুটকেসে কাপড়চোপড় ভরছেন।

সেনগিন্নি বলেন, সে কি রে! ইস্কুল খুলবে সেই জগদ্ধাত্রী-পূজোর পর। এর মধ্যে যাবার কি তাড়া পড়ল?

সে ছুটি মা ইস্কুল দিয়েছে—ছুপুরবেলার যারা মনিব। সকাল-সন্ধ্যার মনিবদের নিয়েই মুশকিল। ইস্কুল খুলে এগজামিন। সারা বছর বই ছোঁয় নি, বছরের পড়া একটা মাসে সারা করে দিতে হবে। ছেলে যত না খাটবে, মাস্টার খাটবে তার ছুনো তেছুনো। নয় তো বারোমাস মাইনে খাওয়াচ্ছে কেন?

সুধা হাসিমুখে এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়েন: ওসব নয় মা। সাতু ঘোষের বোনের সঙ্গে না হোক, মেয়ের তো আকাল হয় নি। গণ্ডায় গণ্ডায় কত রয়েছে এদিক-সেদিক। বিয়েথাওয়ার যোগাড় দেখ, ভাই তখন আর পালাই-পালাই করবে না।

মহিম বলেন, এগজামিনের মুখে বিয়ে বললেও মাপ হয় না দিদি। বিয়ে তো বিয়ে—মরে গেলেও বোধ হয় বলবে, কি কি ইম্পর্টান্ট আছে দাগ দিয়ে রেখে তবে গঙ্গাযাত্রা করুন। বড় শক্ত ঘানি গো দিদি।

মরাছাড়ার কথা মায়ের কানে খারাপ লাগে। সংক্ষেপে তিনি প্রশ্ন করলেন, কতগুলো টুইশানি করিস?

সকালে একটা, রাতে একটা। তাইতে হিমসিম খেয়ে যাই। ইস্কুলমাস্টারি করে মাত্র ছুটো টুইশানি—অন্য মাস্টাররা অপদার্থ কুলাঙ্গার ভাবেন আমায়। কিন্তু ছুটোই তো আমার ধাতে সয় না।

পাকা হয়ে গিয়ে খরচপত্র চলার মতো মাইনে কিছু বাড়লে টুইশানি একেবারে ছেড়ে দেব। ছেলেদের যাতে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাই নিয়ে পড়াশুনো ভাবনাচিন্তা করব। গ্রীষ্মের পুরো সাত হপ্তা বাড়ি থেকে আম-কাঁঠাল খেয়ে যাব। টিউটর হয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যের ফিরি করে বেড়ানো—ইজ্জত থাকে ওতে কখনো! ছেলেরাই বা মানবে কেন?

॥ সাত ॥

পূজোর ছুটির পরে ইস্কুল খুলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন। দুখিরাম ছুটোছুটি করে সার্কুলার ঘুরিয়ে আনল: ছুটি হলেই শিক্ষকরা আজ বাড়ি চলে যাবেন না, লাইব্রেরি-ঘরে অপেক্ষা করবেন। কাজ আছে।

ডি-ডি-ডি'র চালচলন গম্ভীর। ছুটির আগে থাকতেই নিজের কামরায় দরজা এঁটে আছেন। দুখিরাম লাইব্রেরি-ঘর থেকে এক একজন করে ডেকে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তিনি বেরিয়ে এলে আর একজন। একখানা ডায়েরি-বই ডি-ডি-ডি'র হাতে। এটি তাঁর নিজের কাছে থাকে, কাউকে দেখতে দেন না। চিত্তবাবুকেও না। বই দেখে ফিসফিস করে প্রতি মাস্টারকে বলে দিচ্ছেন, কোন ক্লাসের প্রশ্নপত্র করবেন তিনি; কোন ক্লাসের খাতা দেখবেন। অতিশয় গোপন ব্যাপার—কেউ কাউকে বলবেন না যেন, একজনের খবর অন্যে টের না পায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিত্তবাবু মুখ টিপে টিপে হাসছেন: বাজে খাটনি এত খাটতে পারেন! এই কখনো গোপন থাকে! ভূত যে সর্ষের মধ্যে। ইনি ওঁকে ডেকে কানে কানে বলবেন। জিজ্ঞাসা করতে হবে না, নিজের গরজে বলে বেড়াবেন সবাই।

কিন্তু মহিমের গরজ নেই। দুটি তো টুইশানি। একটা মেয়ে পড়ান

—তার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবার নেই। আর ছেলেটা এই ইস্কুলের হলেও ন্যায্যর বেশি সিকি নম্বর বাড়াতে যাবেন না, এ বিষয়ে দৃঢ়পণ তিনি। তাঁর কাছেও অতএব পালটা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার—জিজ্ঞাসা না করেও জেনে ফেলেছে দেখছি অপরে।

করালীকান্ত এসে বললেন, চেক আছে আমার ভাই। বেশি নয়, তিনখানা। নোট-বই আছে?

কিসের চেক, কোন ব্যাপার—মহিম কিছু বুঝতে পারেন না। নোট-বই লাগছে বা কিসের জন্যে?

করালী হেসে বলেন, নতুন মানুষ আপনি। ভিতরের অনেক ব্যাপার শিখতে হবে। বলি, শুধু কি পড়িয়েই যাবেন? ছাত্র পাশ করে যাবে, সেটা আপনার দায়িত্ব নয়?

মহিম বলেন, দায়িত্ব কিনা জানিনে, তবে পাশ করে যাক নিশ্চয় চাই সেটা। পাশ করবে না তো কী পড়ালাম এদ্দিন ধরে!

শুধু পড়িয়েই কি পাশ হয় ভাই? নতুন আপনি, জানেন না। সেই জন্যে চেক। চেক মানে হল এক টুকরো কাগজে লেখা ছাত্রের ক্লাস আর রোল-নম্বর। রোল-নম্বর স্পষ্টাস্পষ্টি বললে খারাপ শোনায়, বাইরের লোকের কানে পড়ে যেতে পারে—সে জন্য চেক নাম দিয়ে কাজকর্ম চলে। টুকরো টুকরো এমনি কাগজ অনেক আসবে, আমরা তাই নোটবুকে সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখি। অমুক বাবুর এই এই নম্বর, তমুক বাবুর এই নম্বর। খাতা দেখবার সময় নম্বরগুলো পাশে রেখে বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা কি ছাই—পাশ করিয়ে দেবেন, ভাল নম্বর দেবেন। নয়তো টুইশানি খসে যাবে। আবার আপনিও যেসব চেক দেবেন, অন্যেরা তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করবেন। পালটাপালটি ব্যাপার।

মহিম বিরক্ত হয়ে বলেন, আমি কোন দিন কাউকে চেক দিতে যাব না মশায়।

দায়ঝক্কি নেই—আজকে তাই বলছেন বড় বড় কথা। কিন্তু লাইনে যখন এসেছেন, করতেই হবে ভাই। আজ না হয় তো কাল ; কাল না হয় তো পরশু। সে যাকগে—ভবিষ্যতের কথা, এখন তার কি! আপনি চেক না দিতে পারেন, আমি এই দিয়ে যাচ্ছি তিনটে। সামাল করে রেখে দিন।

মহিম দেখলেন, নম্বরগুলো সবই থার্ড ক্লাসের। থার্ড ক্লাসের অঙ্ক দেখতে হবে তাঁকে। আশ্চর্য হয়ে করালীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, জানলেন কি করে বলুন তো ?

হাত গণে—

না, সত্যি বলুন। হেডমাস্টার মানা করে দিলেন, কারও কাছে আমি প্রকাশ করিনি। অথচ জানতে তো বাকি নেই দেখছি।

করালী হেসে বলেন, অঙ্ক কষে জেনেছি ভাই। স্রেফ যোগ-বিয়োগের ব্যাপার। প্রসেস অব এলিমিনেসন। অঙ্কে অনার্স আপনি—উপরের ক্লাসের অঙ্কই দেবে আপনাকে। অন্য সব ক্লাসের জানা হয়ে গেল, থার্ড ক্লাসের অঙ্কের হদিস মেলে না। অতএব আপনি।

গঙ্গাপদবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এতগুলির মধ্যে এই একটি মানুষকে মহিমের বড় ভাল লাগে। তিনিও খোঁজখবর নেন। একদিন বললেন, লাগছে কি রকম বাবাজি ?

মহিম বলেন, ছেলেরা খুবই ভাল। আপনাকে খুলে বলি—মাস্টারমশায়রা সব শিক্ষিত ব্যক্তি, বড় কাজ নিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁদের বড্ড নিচু নজর, নোংরা কথাবার্তা। আমার মোটেই ভাল লাগে না, গা ঘিনঘিন করে। দেখুন, ভাল পয়সার চাকরি ছেড়ে এসেছি। এখানেও মনে হয়, ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু ক্লাসে ছেলেদের কাছে বসলে আর সে কথা মনে থাকে না। তখন ভাল লাগে।

গঙ্গাপদবাবু পুরানো শিক্ষক, সেকাল-একাল অনেক দেখেছেন। ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোমার ব্যথা কোনখানে, বুঝতে পারছি। কিন্তু মাস্টারমশায়দের দিকটাও ভেবে দেখ। টুইশানি করে করে মাথায় আর সাড় থাকে না। ইস্কুলটা আছে তাই রক্ষে—ইস্কুল হল বিশ্রামের জায়গা। হাত-পা ছেড়ে জিরিয়ে নেন এখানে, ফাঁক মতো ঘুমিয়েও নেন। ফষ্টিনষ্টি করেন। ক্লাসে হল পাইকারি পড়ানো, ফাঁকি ধরবার মা-বাপ নেই। বাড়ির পড়ানোয় সেটা চলবে না। টিউশানি না করলেও চলে না—সাধ করে কেউ পাড়ায় পাড়ায় উঞ্ছবৃত্তি করে! এত বড় ইস্কুল—গ্রাজুয়েটদের তিরিশ টাকা দেন, সেই দেমাকে বাঁচেন না। মাস্টাররাও ঐ তিরিশ টাকা ফাউ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। আসল খাটনি ইস্কুলের বাইরে।

টুইশানির গল্প হয় নানা রকম। মতিবাবু মস্ত বড়লোকের বাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে আছেন। সেইখানে খাওয়া-থাকা। এলাহি ব্যাপার মশায়। গদির বিছানা, বনবন করে পাখা ঘুরছে মাথার উপরে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাবেন ভোরবেলা, দেরি হলে নাকি মাস্টার-মশায়ের মাথা ধরে। কলিং-বেল টিপেছেন তো দুটো চাকর হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে। ইস্কুলে মোটরগাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার চারটে না বাজতে গেটের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। কপাল, কপাল—বুঝলেন মশায়, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এ রকম বাড়ি থেকে ডাক আসে না।

জগদীশ্বরবাবু বলেছেন, আমার এক মেয়ে-পড়ানো আছে, তার কথা বলি। পড়াতে গেলেই চটে যায়—মেয়ে নয়, মেয়ের মা আর বাবা। পড়ার ঘরে বসে পা দুলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। মেয়ের মা এসে বললেন, এর মধ্যে এসেছেন—ইস্কুল থেকে ফিরে একটু জিরতেও দিলেন না যে! ঘড়িতে সাড়ে-সাতটা তখন। চারটেয় বাড়ি এসে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেও মেয়ের জিরনো হল না।

আবার আটটা বাজতে না বাজতে মা চলে এসেছেন : আর নয়, ঘুম পাচ্ছে পলির, এবারে যেতে দিন। পরের দিন হয়তো বাবা এসে বললেন, আজকে আর পড়বে না পলি ; ওর মাসি মাসতুত-বোনেরা সব এসেছে। তার পরের দিন বললেন, আজকে থাক ; সিনেমায় যাচ্ছে। ফিরে আসছি—বললেন, দাঁড়ান একটু। মাইনেটা অগ্রিম চুকিয়ে দিয়ে বললেন, পলির মাসি এসেছেন দিল্লি থেকে—এ মাসের ক'টা দিন আসবেন না আর। নতুন মাসে গিয়েছি—গিন্নি বললেন, পলি রোজ পড়বে না, হপ্তায় তিন দিন করে আসবেন মাস্টারমশায়। বেশি পড়লে শরীর খারাপ হবে। তাই চলছে ; তিন দিন করে যাই —পড়ে হয়তো একটা দিন। মাসের ঠিক পয়লা তারিখে পুরো বেতন।

ভূদেববাবু সদুঃখে বলেন, আমার তবে শুনুন। আমার কপালে এক হারামজাদা জুটেছে। বলে, এগজামিনের মুখে এখন রবিবারেও আসুন না সার। উঠে দাঁড়িয়েছি তখনো বলবে, জ্যামিতির এই প্রবলেমটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। পিছু পিছু রাস্তা অবধি নেমে এল গোটা পাঁচ-সাত ইংরেজি ইডিয়ম মুখে করে নিয়ে : এইগুলোর মানে কি হবে বলুন। পড়ার কী চাড়—ব্যাটা আমার বিদ্যেসাগর হবে! কিচ্ছু না, বুঝলেন, স্রেফ শয়তানি। মাস্টার-জ্বালানো ছেলে থাকে এক-একটা। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে জ্বালিয়ে মারিস, টের পাবি—পরীক্ষার খাতার পাতায় পাতায় গোল্লা। উঃ, পূর্বজন্মের কী মহাপাপ ছিল, তাই অমন নরক-ভোগ করছি। ভাল চাই নে, মাঝামাঝিও একটা পেতাম—তার পরে একটা দিনও আর ওদের ছায়া মাড়াতে যাব না।

মহিম আর ভূদেববাবু মেসে ফিরছেন। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ট্রাম-রাস্তার মোড়ে নতুন বাড়ি হচ্ছে। মার্বেলের মেঝে, কালো মোজেয়িকের বড় বড় থাম, লতাপাতা-কাটা কাচের আবরণ সিঁড়ির সামনেটায়। ভারি শৌখিন বাড়ি। যেতে যেতে ভূদেববাবু চট করে ভিতরে ঢুকে দরোয়ানকে গিয়ে ধরলেন : মনিবের বাড়ি কোথা দরোয়ানজি ?

জলপাইগুড়ি। চা-বাগানের মালিক—বিস্তর পয়সা।

পুলকে ডগমগ হয়ে ভূদেববাবু ফিরে এলেন। বলছেন, জলপাইগুড়ির লোক অদ্দূর থেকে প্রাইভেট মাস্টার সঙ্গে নিয়ে আসছে না। কি বলেন মহিমবাবু? ঘট পেতে গৃহপ্রবেশ করবে, নজর রাখতে হবে দিনটার উপরে।

মহিমকে সামাল করে দিচ্ছেন: আপনার খাঁই নেই জানি, আপনার কাছে সেইজন্যে বলে ফেললাম। খবরদার, খবরদার—অন্য কানে না যায়।

আবার বলেন, একেবারে ইস্কুলের পথের উপর—সব টিচারের নজর পড়ে যাচ্ছে। কতজনে এর মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে গেছে, ঠিক কি!

॥ আট ॥

গার্ড দিচ্ছেন মহিম। সঙ্গে পতাকীচরণ আছেন। পতাকী বড় ভাল। পরিশ্রমীও খুব। ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ান: এই, পেট মোটা কেন—বই-টই আছে নাকি রে? শার্টটা তোল দিকি উঁচু করে। ব্লটিং-পেপার টানাটানি করবি নে। ন্যাকা আমরা, কিছু বুঝি নে—উঁ! কাঁচা কালির উপর ব্লটিং চাপিস, ব্লটিং-এর উপর লেখা উল্টো হয়ে ছাপ পড়ে যাচ্ছে। ওরে কাশী, বাঁ-হাত চিত করে অত কি লিখিস? দেখুন মহিমবাবু, কাণ্ডখানা দেখে যান। হাতের তলা ভরতি করে কপিং-পেন্সিলে কত সব লিখে এনেছে।

যত দেখেন, মহিম অবাক হয়ে যাচ্ছেন: আমরাও পড়াশুনো করেছি। কিন্তু এ কী! সাতজন্ম ভেবেও এত সব ফন্দি মাথায় আসত না।

পতাকীচরণ হেসে বলেন, ভাবতে কে বলেছে আপনাকে? আমি

একাই পারব। আপনারা মফস্বলের ইস্কুলে পড়েছেন, কলকাতার বিচ্ছুদের হদিশ কি করে পাবেন? কিচ্ছু করতে হবে না, যদি কখনো বাইরে যাই সেই সময়টা দেখবেন আপনি।

সত্যি, দুটো চোখ বিঘূর্ণিত করে পতাকীচরণ ঘরময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একটা মশা উড়লেও তাঁর নজর এড়াবে না। মহিম নিতান্তই বাহুল্য এক্ষেত্রে।

পতাকী বলেন, কাজ না থাকে বই-টই পড়ুন না বসে বসে। দেখবার কিছু নেই, আমি একাই একশ।

এটা মন্দ কথা নয়। এনসাইক্লোপেডিয়ার বাঁধানো পিঠগুলো দেখে থাকেন আলমারিতে। পড়বার ইচ্ছে হয়। এজুকেশন সম্বন্ধে কি লিখেছে—সেই ভল্যুমটা এনে পড়া যাক। হোক পুরানো এডিশন, প্রাচীন মনীষীদের ভাবনাটা জানা যাবে।

আসছি আমি একটা বই নিয়ে।

করালীবাবুকে খুঁজছেন। কেয়ারটেকার মানুষ, কখন কি কাজের দরকার পড়ে—সেজন্য তাঁকে গার্ড দিতে হয় না। চিত্তবাবু বললেন, তিনি কি আছেন এতক্ষণ? একটা কোন কাজের নাম করে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ি গিয়ে ঘুম দিচ্ছেন, হয় তো টুইশানি সেরে বেড়াচ্ছেন এই ফাঁকে। দেখুন খুঁজে। কপালে থাকলে পেয়েও যেতে পারেন।

দুখিরাম বলে, তামাক খাবার ঘরটা দেখুন দিকি। ওই দিকে একবার যেতে দেখেছিলাম।

সেইখানে পাওয়া গেল। বাড়ি যান নি, কিন্তু ঘুমুচ্ছেন ঠিকই। জানলাহীন আধ-অন্ধকার ঘর—একটিমাত্র দরজা, দরজাটা ভেজিয়ে পুরোপুরি রাত করে নিয়েছেন।

করালীবাবু—

অ্যাঁ—? করালীবাবুর সজাগ ঘুম, ধড়মড় করে উঠে বসে আরক্ত চোখ কচলাচ্ছেন: কী, মহিমবাবু যে! আপনি ডাকছেন?

একটিবার উপরে চলুন। একটা বই দিয়ে আসবেন।

বই—তা আমার কাছে কেন? বিনোদ দেবে, তার কাছে বলুনগে।

মহিম বলেন, বিনোদের বই নয়—

খড়ি ডাস্টার স্কেল ম্যাপ ইত্যাদি এবং ক্লাসে পড়াবার বই বিনোদের জিম্মায় থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে বলে বেয়ারা বলা ঠিক হবে না তাকে। টিচাররা ক্লাসে যাবার সময় যার যা দরকার, বিনোদের কাছ থেকে নিয়ে যান। এই নিয়ে বিনোদের অহঙ্কারের অন্ত নেই। বলে, একদিন যদি না আসি, ক্লাসের কাজ বন্ধ। খালি হাতে মাস্টারমশায়রা কি পড়াবেন?

আর, মরে যাও যদি বিনোদ?

বিনোদ এক কথায় অমনি জবাব দেয়, ইস্কুল উঠে যাবে।

এই বিনোদ। মহিম বললেন, টেক্সটবুক চাচ্ছি নে করালীবাবু। লাইব্রেরি থেকে একটা এনসাইক্লোপেডিয়া নিয়ে নেব।

লাইব্রেরির বই?

করালীবাবু এমন করে তাকালেন যেন কড়াৎ করে আকাশের এক মুড়ো থেকে খানিকটা ভেঙে পড়ল সেখানে। বলেন, লাইব্রেরির বই তো আলমারিতে তালাবন্ধ রয়েছে।

নাছোড়বান্দা মহিম বলেন, তালা খুলে দিন একটু কষ্ট করে গিয়ে।

তালা খুলব, কিন্তু চাবি তো লাগবে—

অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের লোক বলে মুখে কিছু বলছেন না। বললেন, চাবি কোথায়, কে জানে!

ধীরেসুস্থে মহিমের সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বিনোদকে বলেন, লাইব্রেরির আলমারির চাবি তোমার কাছে?

বিনোদ বলে, আমায় কবে দিলেন?

হুঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিনের কথা বলে ভুলে যাচ্ছ বিনোদ।

সেই যে ইস্কুলের জুবিলির বছরে চারদিক ঝাড়ামোছা হচ্ছিল, আলমারি সেই সময় খোলা হয়েছিল। বন্ধ করে তারপর চাবির তাড়া তোমার কাছে দিলাম। একটা কোটোর মধ্যে রেখেছিলে, খুঁজে দেখ।

বিনোদ বলে, কোটোয় রেখে থাকি তো এরই মধ্যে আছে।

কোথা থেকে এক বিস্কুটের টিন এনে মেঝেয় উপুড় করল। রিঙে-ঢোকানো কলঙ্ক-ধরা একতাড়া চাবি তুলে নিয়ে করালী বললেন, এই দেখ। রয়েছে তোমার কাছে—তুমি বলছ, কবে দিলেন ?

আলমারির তালার ভিতর এ-চাবি ও-চাবি ঢুকিয়ে করালী অনেক চেষ্টাচরিত্র করলেন। শেষটা ঘাড় নেড়ে বলেন, খোলে না—

তবে কি হবে ?

বিরক্তস্বরে করালীকান্ত বললেন, আপনার হল কংসরাজার বধের ফরমাস। যা হবার নয়, তাই হওয়াতে বলছেন। তালা খুললেও তো পাল্লা খুলবে না, কবজায় জং ধরে আছে। টানাটানি করলে ভেঙে যাবে।

মহিম বললেন, কী আশ্চর্য ! লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন। বই কেউ নেয় না কোন দিন ?

পাঁচ টাকার লাইব্রেরিয়ান—ওতে আর বই দিতে গেলে চলে না !

পরক্ষণে আবার নরম সুরে বলেন, বই পড়বেন তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন। আলমারি খুললেই বা কী হত ভাই ? বইয়ের কিছু আছে নাকি, হাত লাগালেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা সব কবে গত হয়ে গেছেন—বই আর কতকাল টিকবে !

পরের দিন থেকে একটা-কিছু হাতে করে আসেন মহিম। পরীক্ষা চলছে। পতাকীচরণ অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চতুর্দিকে পাহারা দিয়ে ফিরছেন। মহিম উঠতে গেলেই হাঁ-হাঁ

করে ওঠেন : পড়ছেন, পড়ুন না। কী দরকার! আমি তো রয়েছি —কোন বেটার খাতা থেকে মুখ উঁচু হবে না।

সেকেণ্ড ক্লাসের প্রশ্নপত্র একখানা হাতে করে এলেন।

দেখেছেন মশায়, কোয়েশ্চেনের রকমটা দেখুন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় দিলেও বেমানান হত না। এই ইকুয়েশন দুটো—ভাবলাম, করেই দেখি না কেমন দাঁড়ায়, তা এই দেখুন, এক পাতা করে ফেললাম তবু কোন মুড়োদাঁড়া পাওয়া যায় না। ইস্কুলের ছেলেদের এই অঙ্ক দিয়েছে, আক্কেল-বিবেচনা বুঝুন।

মহিম অঙ্ক-কষা কাগজখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আপনি যে সোজা সড়ক ধরে চলেছেন—এতে হবে না পতাকীবাবু। ফাইভ-বি আছে, ওটা ভেঙে থ্রি-বি প্লাস টু-বি করে নিন। ফরমুলায় পড়ে যাবে। দেখি—

পেন্সিল আর কাগজটা হাতে নিয়ে টুকটুক করে কষতে লাগলেন। লহমার মধ্যে হয়ে গেল। একটা শেষ করে পরেরটাও করলেন।

দেখুন—

পতাকীচরণের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল : সার্থক পড়াশুনো করে এসেছেন মশায়। আপনার উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না। ছেলে-মহলে একবার চাউর হয়ে গেলে টুইশানির গাদি লেগে যাবে। ঠেলে কূল পাবেন না।

শেষ ঘণ্টা চলেছে। খাতা দেবার সময় হয়ে আসে। বাইরে যাবার বড্ড হিড়িক এইবার। একজন ছেলে ফিরে এল তো চার-পাঁচটি উঠে দাঁড়ায়।

উঁহু, একের বেশি হবে না। যা নিয়ম।

ছেলেরা কলরব করে : তবে তো যাওয়াই হবে না আমাদের। এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে যাবে।

কিন্তু কড়া মাস্টার পতাকীচরণ কোনক্রমে নিয়ম শিথিল করবেন না।

নতুন বছরের পাঠ্য-বই নির্বাচন এইবারে, নানান কোম্পানির ক্যানভাসার আসছে। হেডমাস্টারের কামরার বাইরে তাদেরই জন পাঁচ-সাত ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পালের সর্বাগ্রে ডাক পড়ল। এ তো জানা কথাই। মডেল ট্রানস্লেশন নামে ডি-ডি-ডি'র একখানা বই বের করে সম্পর্ক ওঁরা পাকা করে রেখেছেন।

প্রাণকেষ্ট এলে ডি-ডি-ডি বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসুন। সেই দশটা থেকে আপনারা সব হানা দিচ্ছেন, এখনও চলছে। কাজকর্ম কিছু হবার জো নেই।

প্রাণকেষ্ট বলে, এই একটা মাস সার। প্রাচী শিক্ষালয়ের হেডমাস্টার আমার উপর খিঁচিয়ে উঠলেন। পাশাপাশি ইস্কুলের হেডমাস্টার আপনার বই ছেপেছি—বুঝতে পারছেন তো, সেই হিংসে। আমিও ছাড়ি নি : বছরের মধ্যে একটা মাস আমরা এসে আজ্ঞে-হুজুর করে যাই, এর পরে কেউ থুতু ফেলতেও আসব না। দোকানে গেলে একখানা টুল এগিয়ে দেব বসতে। ছাড়ব কেন, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি। বই না হয় না ধরাবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, এবারে কি করবেন আমার বইটার? গেল বারে তো মোটমাট সাতান্নটি টাকা ঠেকালেন।

চেষ্টা তো করা যাচ্ছে সার। আটশ চিঠি চলে গেছে মফস্বলের হেডমাস্টারদের নামে। ছাপা চিঠি নয়, ছাপা জিনিস কেউ পড়ে না। আপনি নিজের হাতে সব প্রাইভেট চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

ডি-ডি-ডি অবাক হয়ে বলেন, সে কি! আমি লিখতে গেলাম কবে চিঠি?

একগাল হেসে প্রাণকেষ্ট বলে, লিখেছে আমাদের লোকে আপনার নাম-ছাপা প্যাডের উপরে। হাতের লেখা কে চিনে রেখেছে? যিনি চিঠি পেলেন, তিনি কৃতার্থ হয়ে যাবেন—অত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার বই ধরানোর জন্য কাতর হয়ে নিজের হাতে

লিখছেন। কাজ হবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া আপনাকেও কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু করতে হবে সার। সেই জন্যে এসেছি।

বলুন—

ব্যাগ খুলে দশ-বারোখানা বই প্রাণকেষ্ট টেবিলের উপর রাখল: এইগুলো পাঠ্য করে দিতে হবে আপনার ইস্কুলে।

সে কি করে হবে? মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে বই পছন্দ করে দেন। এই এখানকার নিয়ম।

ভাল নিয়ম। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে সার—যাঁরা পড়াবেন, বই বেছে দেওয়া তাঁদেরই তো কাজ। এ-বি-সি ফাঁদতে কালঘাম ছুটে যায়, ভোটের জোরে মেম্বার হয়ে তারাই সব নাক গলাতে আসে। বুঝুন কাণ্ড! তা মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে যাতে পছন্দ করেন, সেই ব্যবস্থা করে দিন আপনি। আমাদের তরফ থেকে ক্যালেণ্ডার আর পকেট-গীতা দিয়ে যাব। আর বেশি দামের ভারিক্কি বই ধরালে নতুন বছরের ডায়েরি একখানা করে।

ফসফস করে দু-তিনটা বইয়ের প্রথম পাতা খুলে দেখাল। বাজে বই নয়, দেখছেন? অথর হয় হেডমাস্টার নয় তো অ্যাসিস্টাণ্ট-হেড-মাস্টার। ওঁদের বই করুন, ওঁরাও আপনার মডেল ট্রানস্লেশন করবেন। পাকা কথা নিয়ে এসেছি। হয়ে গেলে ছাপা লিস্টি দেখিয়ে যাব।

ডি-ডি-ডি ঝেড়ে ফেলে দেন: সে এখন বলতে পারছি নে। মাস্টাররা আছেন। তার উপর কমিটি—তাঁদের প্রত্যেকের দু-একখানা করে উপরোধের ব্যাপার থাকে।

প্রাণকেষ্ট মুখ কালো করে: কমিটি কি আর ওই সব ইস্কুলে নেই? রাগ করবেন না সার। বই অন্য লোকে লিখে দিল, আপনাকে ঝক্কি পোহাতে হয় নি, ছাপা হয়ে বেরিয়ে এলে তবে তো আপনি চোখে দেখলেন। এখন এইটুকুও যদি না পারবেন, তবে কেন লাভের বখরা কম হওয়ার কথা তোলেন?

ডি-ডি-ডি চোখ তুলে তাকালেন প্রাণকেষ্টর দিকে। এ ভিন্ন মানুষ—ভারতী ইনস্টিট্যুশনের টিচার নয়, ছাত্রও নয়—বছর বছর বাড়ি এসে নগদ তঙ্কা গণে দিয়ে যাওয়ার মানুষ। সুর নরম করে অতএব বললেন, আচ্ছা রেখে তো যান। দেখি।

প্রাণকেষ্ট বলছে, সবগুলো না পারেন, খান আষ্টেক অন্তত করে দেবেন। আর একটা কথা বলছিলাম সার। শুনুন—

কাছাকাছি মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে, অন্তত আটখানা বই যদি ধরিয়ে দেন বুকলিস্ট মাংনা ছেপে দেব আমরা।

ডি-ডি-ডি ঘাড় নেড়ে বলেন, ওসব এখানে নয়। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের টাকার অভাব নাকি? মাংনা ছেপে নেবে কোন দুঃখে?

প্রাণকেষ্ট বলে, ছেপে দেব আমরা। আটখানা না হোক, ছ-খানা অন্তত ধরাবেন। ছেপে তারপরে যে রকম বিল করতে বলেন, করব। বিলের সে টাকা ঘরে নেব না। আপনার হাতে দিয়ে যাব। তারপরে যা করবার আপনি করবেন।

ডি-ডি-ডি বলেন, কদ্দূর কি হয়ে ওঠে দেখা যাক। পরের কথা পরে। আপনি আর একদিন আসুন। বাইরে আরও সব দাঁড়িয়ে আছেন। ঘণ্টা পড়ার সময় হল, ছেলেরা সব বেরবে। দু-এক কথায় সেরে দিই ওঁদের।

প্রাণকেষ্ট উঠল। হেডমাস্টার হাঁক দিলেন, আসুন আপনারা এক এক করে—

কিন্তু অন্য কেউ ঢোকবার আগে সকলকে ঠেলে সরিয়ে দাশু একটা ছেলের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলেন।

এই কাগজটা ওর কাছে পাওয়া গেছে সার। জলের ঘরে ঢুকে পকেট থেকে বের করল। আমার ওখানে ডিউটি—ট্যাঙ্কের ওপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে নর্দামায় ফেলত, ক্যাঁক করে অমনি চেপে ধরেছি।

হেডমাস্টার একেবারে মারমুখি। চারিদিক সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠলেন : নাম কেটে তাড়িয়ে দেব। পড়াশুনো না পারুক, তার মার্জনা আছে। কিন্তু দুর্নীতি-মিথ্যাচার এ ইস্কুলের ত্রিসীমানায় চলবে না। কাগজ কোথায় পেলি, সত্যি করে বল।

ছেলেটা চুপ করে থাকে।

চিৎকারে চিত্তবাবু ছুটে এসেছেন। এদিক-ওদিক থেকে আরও দু-একটি এসেছেন।

কাগজ কে দিয়েছে, বল সেই কথা। উড়তে উড়তে এসে পকেটে ঢুকে পড়ল ?

ছেলেটা বলে, কষা অঙ্ক টুকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি বাবাকে দেখাব বলে।

এই তোর হাতের লেখা ? মিথ্যে বলার জায়গা পাস নি ? ওই যা বললাম—মিথ্যেবাদীর এ ইস্কুলে জায়গা নেই। চিত্তবাবু, ছেলেটা কোন ঘরে বসেছে দেখুন তো। ওর খাতাটা নিয়ে এসে বাতিল করে দিন। এগজামিনারের কাছে যাবে না।

শেষ ঘণ্টা পড়বার দেরি নেই। দুখিরাম ছুটতে ছুটতে মহিমের কাছে এসে চিত্তবাবুর স্লিপ দিল : কাশীনাথ সরকারের খাতা হেডমাস্টার চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কাশীনাথ ? মহিম নজর ঘোরালেন ঘরের চতুর্দিকে : কাশীনাথ সরকার কে আছ, উঠে দাঁড়াও। হেডমাস্টারের কাছে খাতা যাবে।

পতাকীচরণ বলেন, কাশীনাথ বাইরে গেছে। কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে একখানা। এক নম্বরের শয়তান—বুঝলেন ? যেমন শয়তান, তেমনি হাঁদা। ধরা পড়েছে কি করতে গিয়ে। ঠিক হয়েছে !

ঘণ্টা পড়ে ছুটি হয়ে গেল। কাশীনাথ তখনও দাঁড়িয়ে। হেডমাস্টার বলেন, কী রকম গার্ড দেন পতাকীবাবু ? অঙ্ক কষে বাইরে থেকে ছেলের হাতে দিয়ে যায়, আপনারা দেখতে পান না ?

ছেলেটাকে পতাকী এই মারেন তো এই মারেন। বলছেন, আমি সার চেয়ারে বসি নে, সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে গার্ড দিই। মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ছোঁড়াটা বার বার বাইরে যাবে—সেই সময় কোথা থেকে সাপ্লাই হয়েছে। ধরে আগাপাস্তলা চাবকানো যেত—কাগজ কোত্থেকে আসে তাহলে বেরিয়ে পড়ত। সে তো সার হবার জো নেই।

মহিমকে পতাকীচরণ সাক্ষি মেনেছেন, কিন্তু তিনি একেবারে থ হয়ে গেছেন। অঙ্ক কষা তাঁরই—যে ইকুয়েশন দুটো খানিক আগে পতাকীচরণ কষিয়ে নিয়ে গেলেন। ডি-ডি-ডি কিংবা চিত্তবাবু ভাগ্যিস তাঁর হাতের লেখা চেনেন না। চোরের দায়ে তাঁরই তো পড়বার কথা। আর কাশীনাথ ছেলেটাও কী ঝানু রে—পতাকীচরণ এমন যাচ্ছেতাই করছেন, মুখে তবু টুঁ-শব্দটি বের করে না।

মহিম আর পতাকীচরণ পরের দিনও সেই ঘরের গার্ড। পয়লা ঘণ্টা পড়ে গেছে, প্রশ্নপত্র এইবার আসবে। কাশীনাথ যথারীতি সিটে গিয়ে বসল। কালকের একটা বেলার খাতাই শুধু বাতিল।

ছেলেরা কাশীনাথকে ঘিরে ধরেছে : অঙ্ক তোকে কে কষে দিয়েছিল ?

কাশীনাথ রহস্য-ভরা হাসি হাসে : জানি নে। সত্যিই জানি নে কিছু আমি। হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, পাখার হাওয়ায় এক টুকরো কাগজ উড়তে উড়তে এল। হাতের মুঠোয় ধরে নিলাম।

চুকেবুকে তো গেছে—কেন লুকোচ্ছিস ? বল ভাই, শুনি।

অসঙ্কোচে বেশ জোরে জোরে বলছে ওরা। তুখড় ছেলে মাত্রেই করে থাকে, না করাটাই বোকার লক্ষণ—এমনিতরো ভাব কথাবার্তায়।

পতাকীচরণ সগর্বে মহিমের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলেন, শুনছেন তো মশায় ? সোনার টুকরো

ছেলে ওই কাশীনাথ। ক্লাসের ছেলের কাছেও কথা ভাঙে না। আর কাল তো দেখলেন হেডমাস্টারের সামনে। যেমন সাহস, তেমনি সত্যনিষ্ঠা। আমায় বলেছিল, গলা কেটে ফেললেও কিছু বলব না। ঠিক তাই। কাশীর কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ আজও জন্মে নি।

মহিম তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন কৃষ্ণকিশোর নাগ হেডমাস্টারের কথা। তাঁরই এক ছাত্র সূর্যকান্ত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার—কমিটি-ফমিটি কেঁচো তাঁর কাছে। কমিটি তো ছার—সেই স্বদেশি যুগে লালমুখ পুলিশ-সুপার দলবল নিয়ে ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ছাত্রকে অ্যারেস্ট করবে, কিন্তু ঢোকবার সাহস নেই। কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে এলেন : এখানে কেন ? চলে যান আপনারা। ছেলেরা ভয় পেয়েছে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত হচ্ছে। যেতে হল পুলিশ-সুপারকে থোতা মুখ ভোঁতা করে।

কৃষ্ণকিশোর কবে গত হয়েছেন, আজও দেশ-জোড়া নাম। সূর্যবাবুর কাছে মহিম তাঁর অনেক গল্প শুনেছেন। ইস্কুল যেন বিশাল এক যৌথ পরিবার—সে বাড়ির কর্তা হলেন বৃদ্ধ কৃষ্ণ-কিশোর। ছাত্র হোক শিক্ষক হোক, বাইরের কেউ ছুঁয়ে কথা বললে রক্ষে থাকবে না। তোমার কোন অভিযোগ থাকলে হেডমাস্টার কৃষ্ণকিশোরকে বল, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, কিছু করণীয় থাকলে তিনিই তা করবেন।

একবার শীতকালে ইনস্পেক্টর এলেন ইস্কুলে। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে ইনস্পেক্টর আসা দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। ইনস্পেক্টর দেখেশুনে ভিজিট-বুকে মন্তব্য লিখে চলে গেলেন, ফাঁড়া কেটে গেল—মাস্টার-ছাত্র ও কমিটির কর্তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ফাঁড়া কাটানোর কত রকম তোড়জোড় কতদিন থেকে! খাতাপত্র ঠিকঠাক বানিয়ে ফেল দিনরাত্রি খেটে। রেজেস্ট্রিতে যত আজেবাজে ছেলের নাম আছে, তাদের ডেকেডুকে দু-এক দিন ক্লাসে বসিয়ে কিছু তালিম

দিয়ে নাও। ইস্কুলের উঠানের জঙ্গল সাফ কর, ঘরদুয়ারে ঝাঁটপাট দাও। ছেলেপুলে ও মাস্টাররা কাপড়চোপড় কেচে ফর্সা করুন আগে থাকতে। শতেক বায়নাক্কা। ওদিকে গাঁয়ের পুকুরগুলোয় দড়াজাল নামিয়ে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরিয়েছে, গোপালভোগ-চন্দ্রপুলি-ক্ষীরের ছাঁচ বানিয়ে রেখেছেন এবাড়ির-ওবাড়ির মেয়েরা। আসছেন যেন গ্রামসুদ্ধ মানুষের সরকারি জামাই।

কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের ইস্কুলে সে ব্যাপার নয়। ইনস্পেক্টর আসার খবর নিশ্চয় আগে চিঠিতে জানিয়েছিল। কিন্তু সরকারের কর্মচারী আসছেন কর্তব্য করতে, এসে যা দেখবার দেখে যাবেন— অপরের সে খবরে কি প্রয়োজন? সাধারণ কাজকর্মের এক তিল এদিক-ওদিক হবে না ইনস্পেক্টর আসার জন্যে।

এসেছেন ইনস্পেক্টর। অফিসে বসে খাতাপত্র দেখে নিলেন। উঠলেন তারপরে। ক্লাস দেখবেন। মাস্টারমশায়রা বিশ্রামঘরে। শীতের বেলা উঠোনে রোদ পোহাচ্ছেন কেউ কেউ। কৃষ্ণকিশোরকে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, ক্লাসে যান নি ওঁরা?

বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, ক্লাসের পড়ানো নেই। সেইজন্য ওঁদের ছুটি।

স্তম্ভিত ইনস্পেক্টর: বলেন কি সার? পরীক্ষার হলে মাস্টার-মশায় কেউ নেই—টোকাটুকি করে দফা সারবে তবে তো!

কৃষ্ণকিশোর বিরক্ত হয়ে বলেন, শিক্ষকরা থাকেন পড়ানোর জন্য। পুলিশ-পাহারাদার তাঁরা নন—তাঁদের আজ কাজ কি? ছেলেরাও পড়াশুনো করতে আসে, ইস্কুল চোর-ছ্যাঁচোড়ের জায়গা নয়—তারাই বা কেন টোকাটুকি করতে যাবে?

ইনস্পেক্টর অবাক হয়ে আছেন তো কৃষ্ণকিশোর বললেন, আপনার সঙ্গে আমি ক্লাসে যাচ্ছি নে। যেখানে খুশি আপনি একলা ঢুকে পড়ে দেখে আসুন। ছেলেদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকবে, আমি সেটা চাই নে। দেখেশুনে নিঃসংশয় হয়ে আসুন।

ইনস্পেক্টর একলাই চললেন দেখতে। আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়েও দেখলেন। সব ছেলে নিজ নিজ খাতা লিখে যাচ্ছে নিঃশব্দে—ঘাড় তুলে তাকায় না কোনদিকে। জলের কলসির ধারে বেয়ারা জন দুই বসে। কেউ জল খেতে এলে মাটির গেলাসে করে দিচ্ছে, খাওয়ার পরে ফেলে দিচ্ছে সেই গেলাস। এ ছাড়া আশেপাশে কোথাও কেউ নেই।

ইনস্পেক্টর কমবয়সি। অফিসে ফিরে এসে বললেন, আমায় পায়ের ধূলো দিন সার। আর কিছু দেখবার নেই, আমি যাচ্ছি।

মহিম ভাবছেন, হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নেওয়া যায় সে সব মানুষ বড় দুর্লভ। অতিকায় ডাইনোসর লোপ পেয়ে গেছে। বড় মাপের সৃষ্টির দিন যেন ফুরিয়ে এল।

॥ নয় ॥

নিচের ক্লাসের ছেলেদের মুখে-মুখে পরীক্ষা; বড়দের মতন তারা লিখে পরীক্ষা দেয় না। লেখা পরীক্ষাগুলো আগেভাগে হয়ে যায়, টিচাররা বাড়িতে নিয়ে খাতা দেখেন, আর ইস্কুলে এসে মৌখিক পরীক্ষা নেন। এমনি প্রোগ্রাম হওয়ায় পরীক্ষার কিছু সময়-সংক্ষেপ হয়। নগদ কারবার মৌখিক পরীক্ষার ব্যাপারে। প্রশ্ন হল—হর্ষবর্ধন কে ছিলেন, তাঁর দানযজ্ঞের কাহিনী বল। হর্ষবর্ধন সার একজন রাজা—। ততক্ষণে এই প্রশ্নের বাবদ নম্বর পড়ে গিয়ে ভিন্ন প্রশ্ন এসে গেছে: হজরত মহম্মদ কি করেছিলেন? পরীক্ষা চারটে পর্যন্ত হতে পারবে, কিন্তু তার অনেক আগে একটা-দেড়টার মধ্যে কাজ শেষ করে নম্বরের কাগজটা চিন্তবাবুর কাছে জমা দিয়ে মাস্টারমশায়রা বিদায় হয়ে যান।

এইটথ ক্লাসের ইতিহাস নিচ্ছেন মহিম। দাশু এসে বলেন, একটু গোপন কথা আছে মহিমবাবু। উঠবেন?

মহিম বলেন, ছাত্র আছে, এই তো? দু-হপ্তা ধরে এই চলছে, সবাই এসে গোপনে বলে যান। কাকে যে কে গোপন করছেন জানি নে। চেক-টেকের দরকার নেই—রোল-নম্বর বলে দাও, মার্কসিটের পাশে দাগ দিয়ে নিচ্ছি।

দাশুর ছাত্রের রোল-নম্বরে দাগ দিয়ে নিয়ে মহিম পরীক্ষার্থীর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলি? থেমে গেলি কেন রে, বলে যা—

দাশু তবু দাঁড়িয়ে আছেন।

হবে, যাও তুমি। সবাইকে দিচ্ছি, তোমার বেলা কেন দেব না?

ছেলেটাকে আরও গোটা দুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শেষ করে দিলেন। তারপরে বিরক্তস্বরে মহিম বলেন, দু-জনেই আমরা অল্পদিন ঢুকেছি, তোমার বয়স দু-চার বছর কমই হবে আমার চেয়ে। তাই কথাটা বলছি দাশু। পরীক্ষা একেবারে ফার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ভাবছি, একটা সেন্সাস নিয়ে রাখলে হয়—কোন কোন ছেলে ইস্কুলের মাস্টার রেখেছে। তারা তো পাশ হবেই। তাদের বাদ দিয়ে রেখে বাকিগুলোর পরীক্ষা করলে খাটনি অনেকখানি কমে।

দাশু আমতা-আমতা করেন: কথা তো ঠিকই। কিন্তু অন্যায় জেনেশুনেও পেটের দায়ে করতে হয়। নইলে টুইশানি থাকে না।

মহিম বলেন, কাল আমি হিসাব করে দেখলাম। পঁচাশিখানা খাতা পেয়েছি। তার মধ্যে পঞ্চাশের উপর চেক এসে গেছে। আরও আসবে। পনের-বিশটা হয়তো বাকি থাকবে—সেই হতভাগাদের মাস্টার রাখবার সঙ্গতি নেই, কিংবা সস্তায় পেয়ে বাইরের টিউটর রেখেছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, পড়াশুনো করা আর পরীক্ষায় পাশ হওয়ার মধ্যে সম্পর্ক এমন-কিছু নেই। দেখা যাচ্ছে, দুটো গোষ্ঠি ছাত্রের মধ্যে—পয়সা দিয়ে যারা মাস্টার-টিউটর রেখেছে, যাদের সুপারিশ করতে এসে মাস্টারমশায়রা ভাতভিক্তির দোহাই পাড়েন। আর হল—যারা টিউটর রাখতে পারে নি, যা খুশি করা যায় যাদের নিয়ে, বলবার কেউ নেই।

দাশু বলেন, গালিগালাজ করছেন। উচিত বটে। কিন্তু দোষ শুধুই কি আমাদের? ইস্কুলের কর্তাদের নয়—তিরিশ টাকায় গ্রাজুয়েট রেখে যাঁরা দেমাক করেন? বিশ টাকা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের মাইনে। মাস্টারদের ন্যায্য মাইনে বাড়ানো কি ইস্কুলের হিত সম্বন্ধে দুটো আলাপ-আলোচনা—এর জন্য একটা মিটিং ডাকার যাঁদের সময় হয় না। শিক্ষিত মানুষ প্রথম যখন আসেন, মনের মধ্যে বড় বড় আদর্শ—আদর্শ মরে দুদিনে ভূত হয়ে যায়। দোষ গার্জেনেরও—বেশি টাকায় ইস্কুলের মাস্টার রেখে যাঁরা ভাবেন কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলে কি করছে তার খোঁজ নেবেন না; এগজামিনের রেজাল্ট বেরলে তখন কৈফিয়ৎ চান ছেলের কাছে নয়—মাস্টারের কাছে। ছেলের সামনেই মাস্টারের উপর হুমকি ছাড়েন।

উচ্ছ্বাস ভরে দাশু অনেক কথা বলে ফেলেন। মহিম এক নজরে চেয়ে শুনে গেলেন। বললেন, যাও তুমি ভাই। ঠিক করে দেব। কিছু বলুক আর না বলুক, ঠেসে নম্বর দিয়ে দেব তোমার ছাত্রকে।

দাশু ঘাড় নেড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলেন, না না মহিমবাবু। ঠিক উল্টো। টরটর করে বলে যাবে, সব প্রশ্নের ভাল জবাব দেবে। কিন্তু নম্বর দিতে হবে খুব চেপে। তিরিশে পাশ, একত্রিশ কি বত্রিশ নম্বর দেবেন। তার বেশি কক্ষণো নয়।

মহিম এবারে দস্তুরমতো চটে গেলেন: ছি-ছি! নিরীহ শিশুকে ন্যায্য নম্বর থেকে বঞ্চিত করব—এ কাজ আমায় দিয়ে হবে না। নম্বর বাড়িয়ে দিতে বল, সে এক কথা, কিন্তু কমিয়ে শত্রুতা সাধন করা—এ জিনিস ক্রিমিন্যাল।

দাশু বলেন, শত্রুতা সাধন কার উপরে মশায়? আমিই তো পড়াই ছেলেটাকে। আগে বুঝে দেখি নি—এখন দাদা গণেশের শূল গেঁথে যাবার যোগাড়। আপনি রক্ষে না করলে বাঁচবার উপায় নেই।

হাত জড়িয়ে ধরতে যান মহিমের।

রাখ, রাখ—আহা, উতলা হয়ে পড় কেন ? বল সব কথা, শুনি।

মহিম আদ্যোপান্ত শুনলেন।

গণেশ নামে একটি ছেলে এই ইস্কুলের এইটথ ক্লাসে পড়বার সময় মারা যায়। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁরা স্কলারশিপ দিয়েছেন গণেশের নামে। গণেশ-স্মৃতি স্কলারশিপ। এইটথ ক্লাস থেকে যে ছেলে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশান পাবে, এক বছর তাকে মাসিক বারো টাকা করে দেওয়া হবে। এবারে খুব ভাল ছেলে আছে—প্রাক্তন ছাত্র সেই সুখময় জজের ছেলে। কিন্তু দাশু অতশত বোঝে নি, নিজের ছাত্রের জন্য তদ্বিরটা বড্ড বেশি করে ফেলেছে। গণেশ-স্কলারশিপ এর ঘাড়ে এসে চাপলে নজর পড়ে যাবে সকলের, নানা রকম খোঁজ-খবর হবে—

দাশু বলছেন, সব টিচারের সঙ্গে ভালবাসাবাসি, সকলে খাতির করেন। এইটথ ক্লাসের যাঁরা প্রশ্নপত্র করেছেন, তাঁরা সব ইম্পর্টাণ্ট বলে দিয়েছিলেন। এই বছরের নতুন টুইশানি বলে আমিও যত্ন করে উত্তর লিখে দিয়ে মুখস্থ করতে বললাম। অঙ্কগুলো কষিয়ে কষিয়ে রপ্ত করে দিয়েছি। হতভাগা ছেলে—যা বলেছি, তাই কিনা অক্ষরে অক্ষরে করে রেখেছে। এতাবৎ কি রকম করল, খোঁজ নিতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ—ফার্স্ট বয়কে ছাড়িয়ে বেটা পঞ্চাশ নম্বরের উপরে বসে আছে। আর সব হয়ে গেছে—বাকি এই ইতিহাসের আপনি, আর জগদীশ্বরবাবু কাল অঙ্ক নেবেন। তাঁকে বলা আছে, সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল করলেও নম্বর তিরিশের বেশি উঠবে না। এখন আপনি দয়া করলে স্কলারশিপটা কোন রকমে রক্ষে হয়ে যায়।

দাশুর ছাত্র অন্য কেউ নয়—মলয়। সেই মলয় চৌধুরি। চেহারা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। কী মধুর কণ্ঠস্বর! দেবশিশু একটি। প্রশ্ন না করতেই গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। কিন্তু হলে কি হবে জাদুমণি—হাত বাঁধা, টায়েটোয়ে পাশের নম্বরটা শুধু।

মহিমের দেহমন রি-রি করে জ্বলছে। সাতু ঘোষ তো অনেক

ভাল—সে ঠকায় শক্ত সমর্থ মানুষদের। নিষ্পাপ অবোধ ছেলেপুলে নিয়ে খেলায় না। এ চাকরি আর নয়। শহর ছেড়ে মফস্বলের কোন শান্ত অঞ্চলে চলে যাবেন মহিম। ঠাণ্ডা গাছের ছায়া, স্নিগ্ধ নদীর কূল, ছোটখাট ইস্কুল একটা—আশ্রমের পরিবেশ। সেখানে কৃষ্ণকিশোর না হন, সূর্যবাবুর মতো মিলে যেতে পারে কাউকে। শহরের এইসব হাঁকডাকের ইস্কুলের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা! আগা-পাস্তলা বিষে জরজর—এর মধ্যে মানুষ বাঁচে কেমন করে?

হেডমাস্টার এবারে নতুন সার্কুলার দিয়েছেন, শুধুমাত্র নম্বর জমা দিলেই হবে না, উত্তরের খাতা ফেরত দিতে হবে ছেলেদের। যা দেখে ভুল কোথায় তারা ধরতে পারবে, ভবিষ্যতের জন্য সামাল হবে। প্রোমোশানের এক হপ্তা আগে একটা তারিখ দেওয়া হল—ঐ দিন ক্লাস বসবে খাতা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

বোলতার চাকে ঘা পড়ল। দু-জন মাস্টার মুখোমুখি হলেই ওই প্রসঙ্গ। দিন-কে-দিন আজব নিয়ম। খাতার ভুল দেখে তো রাতারাতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হবে! ওসব কিছু নয়, মাস্টারগুলো জব্দ হয় যাতে। ক্লাস-পরীক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু টেস্ট আর ফাইন্যাল বাঘা বাঘা পরীক্ষা দুটো সামনে। উপরের মাস্টার যাঁরা আছেন, টুইশানির ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছেন তাঁরা। দশটা মিনিট পড়তে চাইত না, দেড় ঘণ্টা পরেও সেই ছাত্রের হাত ছাড়িয়ে ওঠা যায় না। হেডমাস্টারের সন্দেহ, অযত্নে আন্দাজি নম্বর দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রের হাতে খাতা দিয়ে সেইজন্য মাস্টার পরীক্ষার নতুন আইন।

টুইশানির শাহান-শা সলিলবাবু—তিনি কিন্তু একেবারে নির্বিকার। ছোকরা মাস্টাররা টুইশানির গরব করেন: আমার তিনটে, আমার পাঁচটা। সলিলবাবু কানে শোনেন আর হাসেন মৃদু-মৃদু। স্বল্পবাক নির্বিরোধী এই মানুষটিকে মহিমের ভাল লাগে। একদিন বললেন, লোকে বলে পুরো ডজন টুইশানি নাকি আপনার?

সলিল হেসে বলেন, তাই কখনো পারে মানুষে ?

তবে ক'টা ? বলতে কি, কেউ তো আর কেড়ে নেবে না।

ওসব জিজ্ঞাসা করতে নেই মহিমবাবু। আমি বলতে পারব না, গুরুর নিষেধ।

হেসে আবার বলেন, কত বন্ধুজনের রাতের ঘুম নষ্ট হবে। কী দরকার!

এ হেন সলিলবাবুর মুখে একটি অনুযোগের কথা নেই। যথারীতি মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন, পরীক্ষা না থাকলে হল বা লাইব্রেরি-ঘরের লম্বা টেবিলে গড়িয়ে নিলেন একটু। আবার তখনই তড়াক করে উঠে চিত্তবাবুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। বেরলেন টুইশানিতে, চলবে এই রাত ত্বপুর অবধি।

মহিম বললেন, সোমবারে তারিখ। সমস্ত খাতা ওইদিন দিয়ে দিতে হবে।

সলিল মাথা নাড়লেন : হুঁ—

আপনার কত খাতা সলিলবাবু ?

সলিল বললেন, বাণ্ডিলের ভিতরে সমস্ত নাকি লেখা আছে। আমি এখনো দেখি নি। শ-দুয়েকের মতো হবে মনে হয়।

বলেন কি! বাণ্ডিলই খোলেন নি বোধ হয়। তবে কি করবেন ?

হাসিমুখে সলিল বললেন, মাঝে রবিবার আছে। দেখে দেব যেমন করে হোক।

সোমবারে ইস্কুলে এসেই মহিম সলিলের খোঁজ নিলেন। হাসিমুখ তাঁর যথারীতি, সামনে প্রকাণ্ড খাতার বাণ্ডিল।

এক দিনের মধ্যে এত খাতা দেখে ফেললেন ?

সলিল বলেন, পুরো দিনই বা পেলাম কোথা! জানুয়ারির গোড়ায় টেস্ট—শিরে সংক্রান্তি, এখন কি রবিবার বলে কিছু আছে ? রবিবারেও বেরতে হল। তুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক অনেক কষ্টে একটু ফাঁক করে নিয়েছিলাম।

মারা পড়বেন সলিলবাবু। খাতা ছেলেদের হাতে দিয়ে দেখুন, খুঁড়ে খাবে তারা আপনাকে।

নির্বিকার কণ্ঠে সলিল বলেন, এই কর্মে চুল পাকালাম। কিছু হবে না, দেখতে পাবেন।

ক্লাসে গেলেন সলিল। অন্যদিনের চেয়ে বেশি গম্ভীর আজ। সকলকে খাতা দিয়ে দিলেন।

দেখ তোমরা, মনোযোগ করে মিলিয়ে দেখ। মার্কসিট আমার কাছে। ভুল-টুল থাকতে পারে তো—তাই এখনো জমা দিই নি।

ছেলেরা খাতা খুলে দেখছে। মোটামুটি খুশি সকলে। নম্বর যা প্রত্যাশা করেছিল, তার চেয়ে বেশি বেশি পেয়েছে। ভাল মাস্টার সলিলবাবু, দয়াধর্ম আছে।

একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল।

সলিল বলেন, কি, গোলমাল আছে বুঝি?

হ্যাঁ সার। ফিফথ কোয়েশ্চেনে নম্বর পড়ে নি।

হতে পারে। এই জন্যেই তো মার্কসিট জমা দিই নি এখনো। নিয়ে এস, দেখি।

কাছে এসে ছেলেটা খাতা মেলে ধরে: এই দেখুন সার। গ্রামারের এই প্রশ্নে তিন তো পাবই—

নিরিখ করে দেখে সলিল বলেন, তিন কেন, চার পাবে। তাই দিয়ে দিচ্ছি।

চার মার্ক বসিয়ে দিলেন। তার পরেও পাতা উল্টে যাচ্ছেন। বলেন, খাতাটা সত্যি অমনোযোগের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভুল আরও আছে। এই যে ব্যাখ্যা করেছিস, সাত নম্বর দেওয়া যায় এতে? পাঁচের বেশি কিছুতে নয়।

সাত কেটে সলিল পাঁচ করে দিলেন।

বনভোজনের এসে লিখেছিস—হুঁ, হুঁ, হুঁ—আরে সর্বনাশ, কী

কাণ্ড করেছি, কুড়ির মধ্যে ষোল দিয়ে বসে আছি। সাত-আটের বেশি কিছুতে দেওয়া যায় না—আচ্ছা, নয়ই দিলাম।

ছেলেটা কাঁদো-কাঁদো : একবার যখন দেওয়া হয়ে গেছে—

সলিল হাসিতে গলে গলে পড়ছেন : বলিস কি রে! ভুল করেছি, তার সংশোধন হবে না? গ্রামারের প্রশ্নে ওই যে মার্ক পড়ে নি—দিয়ে দিলাম চার নম্বর। মার্কসিট এই জন্যেই এখনো হাতে রেখে দিয়েছি।

বলছেন, আর পাতার পর পাতা উল্টে খচখচ করে নম্বর কেটে সংশোধন করছেন। কমই হচ্ছে প্রতিক্ষেত্রে। ছেলেটা খারাপ নয়, আগে পেয়েছিল সাতষট্টি। সংশোধনের পর পঁয়তাল্লিশে দাঁড়াল।

খাতা ফেরত দিয়ে মার্কসিটে সাতষট্টি কেটে পঁয়তাল্লিশ করলেন। হাসিমুখ। তারপর সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি দেখা কিনা, ভুলচুক অনেক থাকতে পারে। নিয়ে এস যে যে খাতায় ভুল আছে।

সব ছেলে ইতিমধ্যে খাতা ভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলেছে। এমন কি ক্লাসের অপর ছেলেকেও দেখতে দেবে না।

চতুর্দিক থেকে সবাই বলে, ভুল নেই, ঠিক আছে সার।

ভাল করে দেখেছিস তো? যাক, নির্ভাবনা হলাম।

টিফিনের সময় সেদিন ছাত্রের ভিড় এক-এক মাস্টারকে ঘিরে। এটা কম হয়েছে, ওটা বাদ গেছে, এখানে যোগের ভুল—মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। মহিম দু-হপ্তা ধরে এত খেটেখুটে বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন, তাঁর কাছেও দলে দলে খাতা নিয়ে আসছে।

কেবল সলিলবাবু একান্তে বসে মৃদু-মৃদু হাসছেন। মহিম গিয়ে তাঁকে ধরেন : কী আশ্চর্য, আপনার কাছে কেউ আসে না!

নির্ভুল দেখেছি যে।

দু-ঘণ্টায় দু-শ খাতা নির্ভুল দেখে ফেললেন, কায়দাটা আমায় বলে দিতে হবে সলিলবাবু।

তাই তো! সলিল একটু ইতস্তত করেন: যাকগে, লাইনে নতুন এসেছেন—গুরুদত্ত শিক্ষা আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি একটু-আধটু। পরীক্ষার নম্বর লম্বা হাতে দিয়ে যাবেন। ঝামেলা আসবে না, ছেলেরা সুনাম করবে। গাঁট থেকে বের করতে হচ্ছে না, তবে আর ভাবনা কিসের?

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে বলেন, দেখুন ভাই, পয়সা খরচা করে পরোপকার করতে পারি নে। সে ক্ষমতা ভগবান দেন নি। পেন্সিলের মুখের পাঁচ-দশটা নম্বর—তাতে কঞ্জুষপনা করতে গেলে হবে কেন?

॥ দশ ॥

তেসরা জানুয়ারি। ক্লাস-প্রোমোশানের সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল বন্ধ হয়েছিল। খুলেছে কাল। নতুন সেসন, নতুন সব ছেলেপুলে। পুরানোদের অনেকে প্রোমোশান পেয়ে উপর-ক্লাসে উঠেছে, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে কেউ কেউ, নতুন নতুন ছেলে ভর্তি হয়ে আসছে। আপাতত পুরানো রুটিনে কাজ চলছে। রুটিনও নতুন হবে—কোন ক্লাসের ক'টা সেকসন হয়ে দাঁড়ায়, সেই অপেক্ষায় দেরি করা হচ্ছে। চিত্তবাবুর কাছে ইতিমধ্যেই মাস্টারদের ঘোরাঘুরি আরম্ভ হয়ে গেছে নতুন রুটিনে একটু উঁচু ক্লাস পাবার জন্যে।

মস্তবড় গাড়ি এসে থামল ইস্কুলের গেটে। লাইব্রেরি-ঘরের জানলা দিয়ে গগনবিহারীবাবু তাক করে আছেন। গাড়ি থেকে নামলেন মোটাসোটা প্রবীণ ভদ্রলোক। পিছনে কর্ডের হাফপ্যাণ্ট ও ঘিয়ে-রঙের হাফশার্ট-পরা দুই বাচ্চা ছেলে। দুই ভাই সন্দেহ নেই।

নতুন ফার্স্ট ক্লাসের পড়া শুরু হতে ক'দিন এখনো দেরি আছে। তিন সেকসনের তিনটে ঘরে ছেলে ভর্তির ব্যবস্থা। একটায় গার্জেন ও ছেলেপুলেরা এসে বসছে। একটায় পরীক্ষা। আর একটায় ভর্তির ফরম-পূরণ, টাকার লেনদেন এবং বইয়ের লিস্টি দেওয়া হচ্ছে। বিষম ভিড়। অন্য ইস্কুলের ট্রানসফার-সার্টিফিকেট থাকলেই হল না, যাকে তাকে নেন না এঁরা, ছেলে দেখেশুনে বাজিয়ে নেবেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা তো বটেই, তা ছাড়া আপাদমস্তক চেহারাও দেখবেন। যে ক্লাসে ভর্তি হবে, তার মানানসই হওয়া চাই। সমারোহ ব্যাপার। ভরতির কাজটা কালাচাঁদবাবু করে থাকেন, এবারও তাঁর উপরে ভার। পছন্দমতো জন তিনেক মাস্টার নিয়ে পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়েছেন। মহিম তার ভিতরে।

গাড়ি থেকে নেমে সেই ভদ্রলোকটি ছোট উঠান পার হয়ে আসছেন। গগনবিহারী দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়ির মুখে গিয়ে ধরবেন। ভূদেববাবু, দেখা গেল, অন্য জানলায় দাঁড়িয়ে। হাসছেন তিনি গগনবিহারীর দিকে চেয়ে, আর বুড়ো-আঙুল নাড়ছেন: তাই-রে-নারে নারে-না—সে-গুড়ে বালি। চাকের মধু নেপোয় খেয়ে যাচ্ছে। হবে না, কোন আশা নেই।

গগনবিহারী থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, চেনেন বুঝি ওঁদের? অত বড় গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন, কে মানুষটা?

ভূদেব বলেন, বড়লোক—সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। ছেলে ভর্তি করতে আসছেন, তা-ও ঠিক। কিন্তু ড্রাইভারের পাশ থেকে আধ-ময়লা পাঞ্জাবি-পরা ওই যে একজন নেমে এল, তাকে দেখছেন? ছেলে দুটোর মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে আসছে—দোতলা থেকে আমাদের কারো দৃষ্টি না লাগে। মাস্টার ওটি, আমাদের কোন আশা নেই। হবার হলে আমিই আগে ছুটে গিয়ে ওঁদের খাতির করে বসাতাম।

ছত্রধারী লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্য গগনবিহারী

ফিরে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চশমা-পরা রোগা-লিকলিকে মানুষ—চাকর নয়, আরদালি নয়—বলেছেন ঠিক ভূদেববাবু, প্রাইভেট মাস্টার না হয়ে যায় না। ওই মাস্টারের কাছে বাড়িতে পড়েছে বোধ হয় এতদিন। বড় হয়ে গেছে বলে এবারে ভর্তি করতে নিয়ে আসছে। কী রকম আগলে নিয়ে আসে—অন্য মাস্টারের যেন ছোঁয়াচ লাগতে দেবে না। আরে বাপু, ক'দিন চলবে অমন সামাল-সামাল করে? তোমার তো সন্ধ্যের পরে একটা ফুল ফেলে যাওয়ার সম্পর্ক—বারোমাসের ঘরবসত এবার থেকে আমাদের সঙ্গে।

গগনবিহারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন দুষ্টগ্রহের নজর লেগেছে। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চার-চারটে টুইশানি ছেড়ে গেল—দুই ছাত্রের বাপ গবর্নমেণ্ট-অফিসার ভিন্ন জায়গায় ট্রানসফার হয়ে গেল। একটা ছেলে রক্ত-আমাশয়ে শয্যাশায়ী, কবে উঠে বসে পড়াশুনা করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। আর এক গুণধর বাপের বাক্স ভেঙে নিয়ে কোন অজানা মুলুকে পাড়ি দিয়েছে। চারটে গেছে, সে জায়গায় একটাও গাঁথতে পারলেন না এখন অবধি।

চলে গেলেন কালাচাঁদবাবুর কাছে: বাপ রে বাপ, ঘোরতর মচ্ছব আপনার এখানটা।

কালাচাঁদ হাসলেন একটু। অজস্র মানুষ আসছে, জমিয়ে কথা বলার ফুরসত নেই। তিন ঘর জুড়ে ভর্তির কাজকর্ম, চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

কালাচাঁদ বুঝেছেন সেটা। অনেক মাস্টারই আসছেন। ক'টা দিনের মাতব্বরি তাঁর, সবাই এসে এসে খোশামুদি করেন। এক পাশে সরে এসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন—

বাজার কেমন এবারে? এমনি তো ভিড় দেখা যাচ্ছে।

কালাচাঁদ মুখ বেজার করলেন: দূর মশায়! মুখে রক্ত তুলে

খাটছি—কিন্তু আসলের বেলা অষ্টরম্ভা। বাজে মক্কেলের ভিড়—কেরানি দোকানদার এইসব। ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, ফ্রি-হাফফ্রি দরখাস্তের ফরম কোথা মিলবে ? দূর দূর—পয়সা দিয়ে প্রাইভেট মাস্টার রাখবার লোক এরা !

শুষ্ক মুখে অসহায় ভাবে গগনবিহারী বলেন, তবে কি হবে কালাচাঁদবাবু ? সবাই আমরা আপনার দিকে মুখ করে আছি। ভর্তির সময় দুটো-একটা যদি পাইয়ে না দেন সারা বছর কি খেয়ে বাঁচব ?

আরে মশায়, আমার কি অসাধ ? দিই নি এর আগে ? বলুন। দিন দিন বাজার পুড়েজ্বলে যাচ্ছে। তার উপরে ঘরের পাশের ওই প্রাচী শিক্ষালয়—হাল আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে খৈ ফোটায় মুখে মুখে, নতুন সাজসরঞ্জাম, কথায় কথায় খাস দ্বারভাঙ্গা-বিল্ডিং অবধি তদ্বির-তদারকের ব্যবস্থা। আর আমাদের হল বনেদি গয়ংগচ্ছ ব্যাপার। মোটরওয়ালা যত গার্জেন যেন জাল ফেলে মোড় থেকে ওরা ধরে নিচ্ছে। কাল টিফিনের সময়টা বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ওদের ইস্কুলের সামনে। মোটরে মোটরে ছয়লাপ—দেখে তো চক্ষু কপালে উঠে গেল।

গগনবিহারী বললেন, তা হলেও হাত-পা কোলে করে থাকলে হবে না। রুই-কাতলা না হল, ট্যাংরা-পুঁটি কিছু তো তুলতে হবে ! কাল থেকে বরঞ্চ আমায় নিয়ে নিন পরীক্ষার কাজে। নিজে একবার বেয়েছেয়ে দেখি। সবে ধন একটা টুইশানিতে ঠেকেছে। একগাদা কাচ্চাবাচ্চা—বড্ড ঘাবড়ে যাচ্ছি মশায় এবারে।

কালাচাঁদ বিরক্ত হয়ে বলেন, সলিলবাবু মহিমবাবু আর বনোয়ারিবাবু—তিন জন ওঁরা রয়েছেন। আপনি তার উপরে এসে কি করবেন ? জলই নেই একেবারে—শুকনো ডাঙার উপরে ট্যাংরা-পুঁটিই বা কি করে ধরবেন ?

অর্থাৎ নিরিবিলি বসে আরও বেশি করে তেল দিতে হবে

কালাচাঁদকে। বনোয়ারি ব্যক্তিটি ঘুঘু এক নম্বরের। নিজের পেটে একহাঁটু ক্ষিধে—ক্ষিধে মিটিয়ে তবে তো পরের ভাবনা! প্রক্রিয়াটা কেমন চলছে, দেখবার জন্য গগনবিহারী পরীক্ষার ঘরে গেলেন। বনোয়ারি ডাকলেন, আসুন—

সেই যিনি বড় মোটরে চড়ে এলেন, তাঁকে নিয়ে চলছে। চিন্তিত ভাবে ঘাড় নেড়ে বনোয়ারি বলেন, মুশকিল হয়েছে সার আপনার ছেলে ইংরেজিতে একেবারে কাঁচা। কী করে নেওয়া যায় বলুন।

বলেন কি মাস্টারমশায়? ইংরেজিই তো জানে আমার ছেলে। রথতলা একাডেমিতে ইংরেজিতে সেকেণ্ড হয়ে আসছে বরাবর।

ওসব পচা ইস্কুলের নাম করবেন না সার। বাঘ-সিংহ পশু আবার ব্যাঙ-ইঁদুরও পশু। দেখলেন তো চোখের উপর—এইটুকু এক প্যাসেজ ডিকটেশন লিখতে দিলাম, তার মধ্যে পাঁচটা ভুল।

ভদ্রলোক বলেন, মাপে এইটুকু হলে কি হবে! ইটপাটকেল সব ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে। বাহাদুর ছেলে, তাই পাঁচটা ভুল। ওর বাপ হলে তো পাঁচ গণ্ডায় পার পেত না। নিয়ে নিন মশায়, ভোগাবেন না। প্রাচী শিক্ষালয়ে এই ক্লাসের একটা সিটও নেই, তারা হলে লুফে নিত।

গলা খাটো করে বললেন, ইস্টার্ন প্রডাক্টস বলে যে কোম্পানি, সেটা আমার। জানেন তো, মলটেড মিল্ক বানাচ্ছি এবারে আমরা। হরলিকসকে বসিয়ে দেব বাজার থেকে। যাবেন না ছুটির পর একদিন বেড়াতে বেড়াতে। আলাপ-সালাপ হবে—দুটো বড় শিশি দিয়ে দেব, খেয়ে দেখবেন।

বনোয়ারি নরম হলেন। বলেন, সে যাক এখন। ভর্তির এই ঝামেলা না কাটলে কোনদিকে তাকাতে পারছি নে। কিন্তু ঐ যা কথা হল, ইংরেজির জন্য ভাল মাস্টার রাখতে হবে। আপনার ছোট

ছেলের কথা তো বলছি নে—এই মাস্টারমশায় রয়েছেন, ইনিই চালিয়ে দেবেন যা-হোক করে। বিপদ বড়টিকে নিয়ে। অন্য সব সাবজেক্ট নিয়ে তত ভাবি নে, এই ইংরেজি—

রাখব ইংরেজির মাস্টার। ভর্তি করে নিন।

বনোয়ারি কাঁচা লোক নন, টুইশানি শিকার করে করে চুল পাকিয়েছেন: কাকে রাখবেন? ঠিক করে ফেলুন এখনই। মানে, তাঁকে দায়িত্ব নিতে হবে—হাফ-ইয়ারলি একজামিনে ইংরেজির নম্বর পঞ্চাশে তুলে দেবেন অন্তত। বাইরের আজেবাজে মানুষের কথার কী দাম! আমাদের হেডমাস্টার বড্ড কড়া এসব ব্যাপারে। দুটো পাঁচটা টাকার সাশ্রয়ের জন্য আপনারা বাইরের লোক খোঁজেন, কিন্তু তাঁরা কি পড়াতে পারেন? আমরা ধরুন, জীবন কাটিয়ে দিলাম এই পড়ানোর কাজে।

সঙ্গের সেই মাস্টারের সামনেই এসব হচ্ছে। বলির পাঁঠার মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন।

গার্জেন ভদ্রলোক বললেন, বাইরের লোক নয়, আপনাদেরই একজনকে—আপনার নিজের সময় থাকে তো বলুন।

আমার? না, আমার সময় আর কোথায়—

পুলকিত হয়ে বনোয়ারি আমতা-আমতা করছেন: অবিশ্যি সকালবেলার একটাকে ছুটির পরে যদি ঠেলে দেওয়া যায়—

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলেন, যা-হোক কিছু করে আপনি ছেলেটার ভার নিন মাস্টারমশায়। নিশ্চিন্ত। বাজে লোকের উপর আস্থা করা যায় না।

যোলআনা প্রসন্ন এখন বনোয়ারি: সত্যি, বড় দায়িত্বের ব্যাপার। এখনই ধরুন লেখাপড়ার ভিত গড়া হবে। ভিতের জন্য চাই সেরা মিস্তিরি। উপরে উঠে গেলে বরঞ্চ মাঝারি লোক দিয়ে একরকম চালানো যায়।

ভদ্রলোক জেদ ধরে বলেন, না, উপরেও আপনি। পর-অপর

নয়—নিজের ছেলে, আশা-সুখে বড় ইস্কুলে ভর্তি করতে এনেছি, সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাই করব তার জন্যে।

সে তো বটেই! ক'টি গার্জেন বোঝেন সেটা! আপনার মতো ক'জন? পান খান মশাই—

বনোয়ারি পকেট থেকে পানের কৌটা বের করলেন। খুট করে একটুকু চাপ দিতেই ডালা উঁচু হয়ে উঠল। দু-খিলি পান এগিয়ে দিলেন। আবার অমনি কায়দায় উপরের ছোট্ট খোপটা খুলে বোঁটার আগায় চুন দিলেন। বলেন, চলুন তবে ঐ বারান্দার দিকে। কথাবার্তা মিটে যাক।

গগনবিহারীর চোখ জ্বালা করে। চোখের উপরেই গেঁথে ফেলল একখানা। বারান্দায় খুব চলেছে ওঁদের। কথাবার্তা আর হাসি। হাসির ঢঙে বোঝা যাচ্ছে মক্কেল সত্যি সত্যি শাঁসালো। চেয়ারটা সরিয়ে একেবারে জানলার গায়ে নিলেন। কী বলাবলি হচ্ছে, শোনা যায় যদি।

বনোয়ারি বলছেন, পঁচিশের কমে পড়াই নে আমি। সস্তার মাস্টার আছে বইকি! কিন্তু সে বনোয়ারি রক্ষিত নয়। বিদ্যেসাধ্যি আর পড়ানো দেখেই লোকে বেশি পয়সা দিয়ে রাখে।

গগনবিহারী মনে মনে বলেন, ওরে আমার বিদ্যেধর রে! পড়াও তুমি কচু। শিখেছ ফেরেব্বাজি আর লম্বা লম্বা বচন।

ভদ্রলোক বলেন, কিছু বিবেচনা করুন মাস্টারমশায়। পাঁচটা টাকা কমিয়ে নিন। কুড়ি।

চিংড়িমাছের দরাদরি করবেন না। সময়ই হচ্ছিল না মোটে। আচ্ছা, আপনি বলছেন—পড়ানোর সময়টা না হয় কিছু বাড়িয়ে দিলাম। দু-ঘণ্টা। খুশি তো? থাকা হয় কোথায় মশায়ের?

ভদ্রলোক ঠিকানা বললেন।

যাওয়া-আসা কিন্তু আপনার—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন, কথার অর্থ ধরতে পারেন না।

বনোয়ারি তখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন: আপনার বাড়ি পড়াতে যাব, পড়িয়ে ফিরে আসব—ট্রামে গেলেও কতক্ষণ লাগবে ভেবে দেখুন। দশ দুয়োরে খেটে খাই আমরা, সময়ের বড্ড টান। আপনারা বাড়ি করবেন কেউ মাদাগাস্কারে কেউ হনলুলুতে। এই যাতায়াতের সময়টা পড়ানোর মধ্যে কিন্তু ধরে নেব।

ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরেন বনোয়ারির: যাওয়া-আসা আর বই খুলতেই তো পুরো সময় চলে যাবে। পড়ানোই হবে না মোটে। সে হয় না।

শেষ পর্যন্ত মিটমাট হল, যাওয়া ও আসার একটা মাস্টারের একটা গার্জেনের। কথাবার্তা চুকিয়ে ছেলে ভর্তি করে দলটি বিদায় হলেন।

কালাচাঁদ লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, হয়ে গেল পাকাপাকি ?

বনোয়ারি বলেন, সঠিক বলা যাচ্ছে না। খদ্দের চরিয়ে খায়, ঘুঘু লোক। কথা অবিশ্যি দিয়ে গেছে। কিন্তু পিছিয়ে যায় অনেকে তো ? এসে হয়তো বলবে, ছেলের মা বলছে পুরানো একজন আছেন যখন—

কলকাঠি তো আপনাদের হাতে ! পড়া ধরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাতে থাকলে 'বাপ' 'বাপ' বলে মাস্টার ডাকতে দিশে পাবে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে মহিম হতবাক একেবারে। তাঁর প্রতি সহসা সদয় হয়ে কালচাঁদ বললেন, আপনি কিছু করতে পারছেন না। নতুন মানুষ—ঝোপ বুঝে কোপ মারবার ব্যাপার, দু-একদিনে এ বস্তু হয় না। ঘাবড়াবেন না, আমি আছি। আমি করে দেব একটা। ভাল দেখে দেব। অবিশ্যি মতিবাবুর মতন না হতে পারে, তা হলেও হেজিপেজি দেব না। টোপ ফেলে বসে আছি বঁড়শির দিকে চেয়ে, ধরি-ধরি করেও ধরছে না। আপনার টুইশানি পাওয়া তো সোজা

মশায়। চৌকোশ মাস্টার—একাধারে ইংরেজি বাংলা অঙ্ক। এমন ক'টা মেলে? তার উপরে বি. এ. পাশ। এম. এ. হলে বটে মুশকিল ছিল।

মহিম সরল ভাবে প্রশ্ন করেন, এম. এ.-র মাইনে বেশি বলেই?

উঁহু। এম. এ. এমনই কেউ নিতে চায় না—বেশি মাইনে দিচ্ছে কে? ধরুন ইংরেজির এম. এ.—গার্জেন ভাবেন, শুধু ইংরেজিটা জানে, অন্য কিছু পড়াবে না। তেমনি অঙ্কের এম. এ. শুধু অঙ্কই পড়াবে। আর আপনারা হলেন গোলআলু—ঝালে-ঝোলে-চচ্চড়িতে যেমন খুশি চালানো যায়।

॥ সাত ॥

সাতু ঘোষের সঙ্গে প্রথম যে মেসে উঠেছিলেন, মহিম এখনো সেইখানে। সাতু ঘোষ আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ভাল অফিস করেছেন। ভূদেববাবু আর জগদীশ্বরবাবু থাকেন এখানে। প্রাচী শিক্ষালয়েরও দু-জন। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে ইস্কুল। পাকাপোক্ত সরকার-জানিত ইস্কুল; তা ছাড়া ব্যবসাদারি ইস্কুল অনেক—কোন ঝানু ব্যক্তি একটা বাড়ি ভাড়া করে সদ্য কলেজ-ফেরত ছোঁড়াদের মাস্টার করে নিয়ে ইস্কুল চালায়। বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে বাড়ি ভাড়া দেয় ইস্কুলের ছুটি দিয়ে। ভাল রোজগার এই ইস্কুলের ব্যবসায়ে। এমনি সব ব্যবসার ইস্কুলের মাস্টারও আছেন দশ-বারোটি। মাস্টার মেম্বার মেসের বারো-আনা। শনিবারে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ওই পথে একটা-দুটো টুইশানি সেরে মাস্টারমশায়রা দেশে চলে যান, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আবার সব ফিরতে থাকেন। সোমবার সকালের টুইশানি আছে। শুধুমাত্র মহিম বাদ। তাঁর বাড়ি কলকাতার কাছাকাছি নয়।—

জগদীশ্বরবাবু হেসে বলেন, ঠিকই তো। বাড়ি কাছাকাছি করবার ব্যবস্থাও তো করেন না আপনার মা-জননী। ট্রেন থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে কেন ছুটতে যাবেন আমাদের মতন? কোন লোভে?

সেদিনের ভর্তির ব্যাপার সাঙ্গ করে ইস্কুল থেকে বেরুতে ঘোর হয়ে গেল। সোজা ছাত্রীর বাড়ি গেলেন মহিম, মেসে যাওয়া হল না। ফিরতে সাড়ে-ন'টা। মাস্টার মানুষের পক্ষে এটা নিতান্তই সন্ধ্যাবেলা। অন্য সকলের টুইশানি সেরে বাসায় ফিরবার অনেক দেরি।

রসুই-ঠাকুর বলল, দু-জন বাবু আপনার খোঁজ করছেন বিকাল থেকে। আপনি ফিরলেন না দেখে ওঁরাও বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবার এসেছেন। সতীশবাবুরা তাস খেলছেন, সেই ঘরে বসে খেলা দেখছেন।

দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিই। তারপরে ডেকো ঠাকুর। উঁহু, আমি যাব ওখানে।

হেন ক্ষেত্রে একটিমাত্র অনুমান মনে আসে। টুইশানি নিতে বলবেন ভদ্রলোকেরা। ভর্তির পরীক্ষায় মহিম যাদের বাতিল করেছেন, তাদেরই গার্জেন কেউ হয়তো। টুইশানি আর একটা হলে মন্দ হয় না। সত্যিই দরকার, মা'কে কিছু বেশি করে পাঠানো যায় তাহলে। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য—মা লিখেছেন সেই কথা। তা বলে টুইশানির ঘুষ খেয়ে আজকের বাতিল ছেলে কাল সুপারিশ করে দেবেন—মরে গেলেও তা হবে না। বনোয়ারি রক্ষিত নন মহিম—স্পষ্ট 'না' বলে দেবেন। অবশ্য অন্য রকমের ছেলেও হতে পারে—আসে অমন দু-একটি। ভূদেব এক কাজ করেছেন—মেসের মধ্যে মাস্টারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আগের 'ইম্পিরিয়াল লজ' বদল করে 'টিচারস লজ' নতুন নাম দিয়েছেন। এক টুকরা টিনের উপর নামটা লিখে পেরেক ঠুকে সেঁটে দিয়েছেন দরজার উপর। অঞ্চলের

মধ্যে জানিত হয়ে যাক মাস্টারের মেস এটা। যেমন রাঁধুনে-বামুনের দরকার হলে দ্বারিক সরকার লেনের বস্তিতে লোকে যায়, প্রাইভেট মাস্টারের প্রয়োজনে আসবে লোকে এখানে। চাকরে গার্জেনদের অফিস কামাই করে ইস্কুলে যাওয়ার অসুবিধা, সকালে বা সন্ধ্যায় মেসে এসে তাঁরা খোঁজ নিতে পারেন। মাস্টারেরও রকমফের আছে এখানে। নর্মাল-ত্রৈবার্ষিক থেকে এম. এ.। পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ টাকার। মাস্টার আছেন প্রাচী শিক্ষালয়ের—যেখান থেকে বছরে তুটো-তিনটে স্কলারশিপ পায়; আবার আছে বিন্ধ্যেশ্বরী হাই ইস্কুলের—যেখান থেকে আশিটা ফাইন্যালে পাঠিয়ে উনআশিটা ফেল হয়ে ফিরে এসেছে। কী রকম চাই, বাছাই করুন।

কাপড়টা বড্ড ময়লা, মহিম তাড়াতাড়ি বদলে নিলেন। শীতকাল বলে গলা-বন্ধ কোট গায়ে—এ বস্তু ময়লা হলে ধরা যায় না। মাথায় জলের থাবড়া দিয়ে চুলটা নরম করে আঁচড়ে নিলেন। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। উজবুকের মতন গিয়ে দাঁড়ালে—বিশ-পঁচিশ কি দেবে—এক নজর তাকিয়ে দেখেই বলবে হয়তো দশ টাকা।

সতীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখেন, ও হরি! গার্জেন নয়, সহপাঠী হিরণ রায়। হিরণ সঙ্গের প্রবীণ লোকটির পরিচয় দিল: আমার মামা। বলে, ঘর খুলেছিস মহিম? তোর ঘরে চল, কথাবার্তা সেখানে।

হিরণের মামাকে মহিম প্রণাম করলেন। অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে হিরণ, খুব ফিটফাট বরাবর। একসঙ্গে তু-জনে বি. এ. পাশ করেছেন। মহিমের জবুথবু গেঁয়ো ভাবের জন্য হিরণ মিশত না তাঁর সঙ্গে ভাল করে। সেই মানুষ খুঁজেপেতে মেসবাড়িতে মামাকে নিয়ে এসে উঠেছে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

মাতুল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছেন: তু-জনে থাকা হয় বুঝি এক ঘরে? আর একজন—ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন। তা

বেশ। তারকবাবু তোমার বোনের ভাসুর বুঝি—আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার। তাঁর কাছে ঠিকানা পেলাম তোমার। হিরণের সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম ক্লাসফ্রেণ্ড তোমরা—একসঙ্গে পড়েছ। বলি, তবে আর তারকবাবুকে টেনে নিয়ে কি হবে, তুই চল আমায় নিয়ে। হিরণ তো তোমার কথায় পঞ্চমুখ। ভাল ছেলে তুমি, অঙ্কে অনার্স পেয়েছ।

হিরণ বলে, বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। খেলা নয়, আড্ডা নয়—মফস্বল-শহর হলেও সিনেমা ছিল সেখানে—বুঝলেন মামা, যে দিকটা সিনেমা-হল সেই পথ দিয়েই মহিম চলাচল করত না।

মামা হাসতে লাগলেন। বলেন, ছেলে সত্যিই ভাল। আর আমার বেবিটা উল্টো একেবারে। শনি কি রবিবারে সিনেমায় একটি বার যেতেই হবে। ওর মা-ই করেছে। নিজের যাওয়া চাই, মেয়েকেও টেনে নিয়ে যাবে। আমাকেও টানতে চায়—আমি বলি, না বাপু, বিষম নেশা। আমারও নেশা ধরে যাক শেষটা। বেবির মা বলে, তাই তো চাই। নিজে যেচে টিকিট করে আমাদের ডাকাডাকি করবে তখন। নেশার ব্যাপারে—তা সে যেমন নেশাই হোক—একা একা সুখ পাওয়া যায় না, সাথী ডাকতে হয়। তোমার মামির হল তাই। প্রজাপতির নির্বন্ধে এই সম্বন্ধ যদি লেগে যায়, আচ্ছা জব্দ হবে বেবিটা। বাড়িতে গিয়ে বলব।

হা-হা করে আবার একচোট হেসে নিলেন। মহিম অবাক। মাস্টার নয়, জামাইয়ের সন্ধানে নড়বড়ে ঐ তক্তাপোশের উপর চেপে বসে আছেন। চাকর পাঠিয়ে তবে তো কিছু খাবার আনিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতুল প্রশ্ন করেন, কি করা হয় বাবাজির ?

মাস্টার মানেই বুড়োথুথুড়ে মানুষের একটা যেন ব্যাপার। বিয়ের সম্পর্কে বলতে লজ্জা হয়। তরুণ বয়স তখন মহিমের ; বললেন, এই এটা-ওটা···ছেলে পড়িয়ে থাকি একটা।

প্রাইভেট পড়াও? সে তো সবাই করে থাকে। লাটসাহেবও পেলে বোধ হয় করেন একটা-দুটো।

লিখি-টিখি একটু। কাগজে গল্প বেরিয়েছে।

বলছিল বটে হিরণ। এ বয়সে লেখার বাতিক থাকে কারো কারো। সেটা তো কোন কাজ হল না, শখের ব্যাপার। কাজ হল যাতে দুটো পয়সা ঘরে আসে। সেটার কি?

অগত্যা মহিমের বলতে হয়, একটা ইস্কুলে ঢুকেছি কিছুদিন।

হিরণ হো-হো করে হেসে ওঠে: কলেজ থেকে পাশ করে ফিরে-ঘুরে আবার ইস্কুলে?

মাতুলেরও মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল: ইস্কুলমাস্টার তুমি? আর তারকবাবু বলছিলেন কিনা করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর।

মহিম সঙ্কোচভরে বলেন, চাকরিটা হওয়ার মতো হয়েছিল। অনেক দিন ঘোরাঘুরি করেছি। তারকবাবু ভেবেছেন, হয়েই গেছে বুঝি। এখনো যে আশা ছেড়েছি, তা নয়। যদ্দিন না হচ্ছে, প্রভাত পালিত মশায় বললেন, ততদিন ইস্কুলে যাতায়াত করতে থাক। যা আসে মন্দ কি! তিনিই চেষ্টা করছেন আমার জন্য।

হিরণ চমকিত হয়ে বলে, কোন প্রভাত পালিত?

তিনিই। রায় বাহাদুর—

তিনি চেষ্টা করলে তো লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর কোন ছার—করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অবধি করে দিতে পারেন।

মহিম বলেন, সেই জন্যে আশা করছি ভাল কাজ একটা জুটে যাবেই। আমার বাবার কাছে উনি পড়েছেন। বাবাকে বড় শ্রদ্ধা করেন।

মাতুল বলেন, ও, বাবাও বুঝি মাস্টারি করেছেন? দু-পুরুষের জাত-মাস্টার তোমরা? ভাল কাজ, জোচ্চুরি-ফেরেব্বাজি নেই

বেশ। তারকবাবু তোমার বোনের ভাসুর বুঝি—আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার। তাঁর কাছে ঠিকানা পেলাম তোমার। হিরণের সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম ক্লাসফ্রেণ্ড তোমরা—একসঙ্গে পড়েছ। বলি, তবে আর তারকবাবুকে টেনে নিয়ে কি হবে, তুই চল আমায় নিয়ে। হিরণ তো তোমার কথায় পঞ্চমুখ। ভাল ছেলে তুমি, অঙ্কে অনার্স পেয়েছ।

হিরণ বলে, বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। খেলা নয়, আড্ডা নয়—মফস্বল-শহর হলেও সিনেমা ছিল সেখানে—বুঝলেন মামা, যে দিকটা সিনেমা-হল সেই পথ দিয়েই মহিম চলাচল করত না।

মামা হাসতে লাগলেন। বলেন, ছেলে সত্যিই ভাল। আর আমার বেবিটা উল্টো একেবারে। শনি কি রবিবারে সিনেমায় একটি বার যেতেই হবে। ওর মা-ই করেছে। নিজের যাওয়া চাই, মেয়েকেও টেনে নিয়ে যাবে। আমাকেও টানতে চায়—আমি বলি, না বাপু, বিষম নেশা। আমারও নেশা ধরে যাক শেষটা। বেবির মা বলে, তাই তো চাই। নিজে যেচে টিকিট করে আমাদের ডাকাডাকি করবে তখন। নেশার ব্যাপারে—তা সে যেমন নেশাই হোক—একা একা সুখ পাওয়া যায় না, সাথী ডাকতে হয়। তোমার মামির হল তাই। প্রজাপতির নির্বন্ধে এই সম্বন্ধ যদি লেগে যায়, আচ্ছা জব্দ হবে বেবিটা। বাড়িতে গিয়ে বলব।

হা-হা করে আবার একচোট হেসে নিলেন। মহিম অবাক। মাস্টার নয়, জামাইয়ের সন্ধানে নড়বড়ে ঐ তক্তাপোশের উপর চেপে বসে আছেন। চাকর পাঠিয়ে তবে তো কিছু খাবার আনিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতুল প্রশ্ন করেন, কি করা হয় বাবাজির ?

মাস্টার মানেই বুড়োথুত্থুড়ে মানুষের একটা যেন ব্যাপার। বিয়ের সম্পর্কে বলতে লজ্জা হয়। তরুণ বয়স তখন মহিমের ; বললেন, এই এটা-ওটা···ছেলে পড়িয়ে থাকি একটা।

প্রাইভেট পড়াও ? সে তো সবাই করে থাকে। লাটসাহেবও পেলে বোধ হয় করেন একটা-দুটো।

লিখি-টিখি একটু। কাগজে গল্প বেরিয়েছে।

বলছিল বটে হিরণ। এ বয়সে লেখার বাতিক থাকে কারো কারো। সেটা তো কোন কাজ হল না, শখের ব্যাপার। কাজ হল যাতে দুটো পয়সা ঘরে আসে। সেটার কি ?

অগত্যা মহিমের বলতে হয়, একটা ইস্কুলে ঢুকেছি কিছুদিন।

হিরণ হো-হো করে হেসে ওঠে : কলেজ থেকে পাশ করে ফিরে-ঘুরে আবার ইস্কুলে ?

মাতুলেরও মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল : ইস্কুলমাস্টার তুমি ? আর তারকবাবু বলছিলেন কিনা করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর।

মহিম সঙ্কোচভরে বলেন, চাকরিটা হওয়ার মতো হয়েছিল। অনেক দিন ঘোরাঘুরি করেছি। তারকবাবু ভেবেছেন, হয়েই গেছে বুঝি। এখনো যে আশা ছেড়েছি, তা নয়। যদ্দিন না হচ্ছে, প্রভাত পালিত মশায় বললেন, ততদিন ইস্কুলে যাতায়াত করতে থাক। যা আসে মন্দ কি! তিনিই চেষ্টা করছেন আমার জন্য।

হিরণ চমকিত হয়ে বলে, কোন প্রভাত পালিত ?

তিনিই। রায় বাহাদুর—

তিনি চেষ্টা করলে তো লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর কোন ছার—করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অবধি করে দিতে পারেন।

মহিম বলেন, সেই জন্যে আশা করছি ভাল কাজ একটা জুটে যাবেই। আমার বাবার কাছে উনি পড়েছেন। বাবাকে বড় শ্রদ্ধা করেন।

মাতুল বলেন, ও, বাবাও বুঝি মাস্টারি করেছেন ? দু-পুরুষের জাত-মাস্টার তোমরা ? ভাল কাজ, জোচ্চুরি-ফেরেব্বাজি নেই

ওতে। ছেলেপুলে নিয়ে কাজ, মনটা বড় সাচ্চা থাকে। বেঁচেবর্তে থাক বাবা। রাত হয়েছে—আচ্ছা, উঠি এবারে।

উঠতে উঠতে বলেন, কোথায় কাজ কর, ইস্কুলের নামটা বল দিকি শুনি।

শতমুখে আশীর্বাদ করে মাতুল উঠলেন। হিরণ পিছনে চলল। মহিম মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন : কেন সঙ্কোচ হল মাস্টারির কথা সোজাসুজি বলতে। জেরার মুখে নিরুপায় হয়েই যেন স্বীকার করে ফেললেন। খারাপ হল কিসে মাস্টারি কাজটা? কত বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তি এই কাজ করে গেছেন। বিদ্যাসাগর কি—মাস্টার তো সংস্কৃত কলেজের। মহামতি গোখলে কি? কৃষ্ণকিশোর নাগ মশায় কি? সূর্যবাবুও মাস্টার, গ্রাম্য ইস্কুলের এক নগণ্য মাস্টার। 'ভারতে ইংরেজ শাসন' বই পড়ানো শেষ করে বলতেন, এগজামিনের জন্য মুখস্থ কর। কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, সমস্ত মিথ্যে। ছাপা বই সশব্দে বন্ধ করে তখন মুখে মুখে আসল ইতিহাস পড়ানো শুরু হত। ননী মজুমদার আই. বি. পুলিশের খুব বড় চাঁই। তিনি বলতেন, দশ-বিশটা ছোকরা ধরে কী ছাই হবে? রক্তবীজের ঝাড়—দশটার জায়গায় একশ'টা জন্মাচ্ছে। শাসন করবে তো ইস্কুল-গুলো তুলে দাও আগে। ছেলেপুলে না ধরে সূর্যবাবুর মতো মাস্টারদের ধর।

দশটা-পাঁচটা কলম-পেশা ম্যাকিনন কোম্পানির কেরানি—বিদ্যা-দান আর বিদ্যাচর্চার মহিমা ওই মানুষ কি বুঝবেন?

ইস্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস। কাছাকাছি এক বড় পার্কে ফাইন্যাল হবে, প্রেসিডেণ্ট নিজে উপস্থিত হয়ে পারিতোষিক বিতরণ করবেন। তার আগে ইস্কুলের পিছন-উঠানে হিটস হয়ে যাচ্ছে দু-দিন ধরে। অর্থাৎ প্রাথমিক দৌড়ঝাঁপ হয়ে বেশির ভাগ ছেলে বাতিল করে দিয়ে ফাইন্যালের জন্য বাছাই হয়ে থাকছে গোটাকতক।

চিত্তবাবু বেঁটেখাতায় সকলের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। স্টার্টে কারা থাকবেন, বিচারক কে কে, কোন শিক্ষক কোথায় দাঁড়িয়ে ডিসিপ্লিন বজায় রাখবেন—তন্নতন্ন করে লেখা। দুখিরাম ছুটোছুটি করে সকলকে দেখিয়ে সই নিয়ে গেল। কাজ আরম্ভ হলে কিন্তু দেখা গেল, আছেন ছোকরা-শিক্ষকদের মধ্যে ক'জন। বুড়োরা হয় বাড়ি চলে গেছেন, নয়তো তামাক খাবার ঘরে বসে হুঁকো টানছেন আর গুলতানি করছেন, নয়তো ঘুমোচ্ছেন অকাতরে লাইব্রেরি-ঘরে পাখা খুলে দিয়ে। হেডমাস্টার নিজেই তো পাকছাট মারলেন। এমনিতরো অবস্থায় ডি-ডি-ডি'র হাবভাব ও কথাবার্তার ধরন একেবারে বদলে যায়। দাশুকে মাতব্বর ধরে হাসতে হাসতে বলেন, আমায় কি বাদ দিচ্ছ? চিত্তবাবু তো কিছু লেখেন নি—তোমরা কি কাজ দেবে বল, কোমরে চাদর বেঁধে লেগে যাই।

এর যা প্রত্যাশিত উত্তর—দাশু কৃতকৃতার্থ হয়ে বলেন, না সার, আজ আপনাকে রোদে পুড়তে দেব না। প্রাইজের জিনিসপত্র যা আসবে, করালীবাবু একটা ফর্দ করেছেন। সেটায় চোখ বুলিয়ে দিন একবার। আপনি যাবেন একেবারে ফাইন্যালের দিন। সকালবেলা রোদ বেশি হবে না, গার্জেনরা আর বাইরের ভদ্রলোকরা আসবেন, প্রেসিডেণ্ট বক্তৃতা করবেন। সেইদিন আপনার কাজ।

ডি-ডি-ডি বলেন, বাঁচালে ভাই। একাউণ্টাণ্ট আসবে এখনই। তিন মাসের বাকি পড়ে গেছে। তার সঙ্গে বসে যাব এক্ষুণি।

পতাকীচরণ মহিমের সঙ্গে বলতে বলতে নামছেন : ফুটো মাতব্বরি দেখলেন তো দাশুর? আমরা সবাই আছি, সকলের হয়ে বলতে যায় কি জন্যে? ও-ই যেন সব। চারগুণ মাইনে হেডমাস্টারের, রোদে পুড়বেন না কেন জিজ্ঞাসা করি? আমরা যদি এক ঘণ্টা রোদে থাকি, উনি থাকবেন চার ঘণ্টা। উঠোনের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে দাও, টাক ফেটে চৌচির হয়ে যাক। কিন্তু হবার জো নেই, খোশামুদেরা আগে থাকতেই···এক-শ গজি দৌড়ে নাম পড়েছে বাহান্নটির। কাণ্ড দেখুন দিকি। চার ব্যাচ করতে হবে অন্তত— খাটিয়ে মারবে।

আকস্মিক স্বর-পরিবর্তনে মহিম তাকিয়ে দেখেন, দাশু পিছনে আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় এসে পতাকীচরণের নজরে পড়েছে।

ডি-ডি-ডি'র তিন ছেলে পড়ে ইস্কুলে। জ্যেষ্ঠজন ফার্স্টক্লাসে উঠেছে, সে এসব দৌড়ঝাঁপের তালে নেই। মওকা পেয়েছে তো সিনেমায় চলে গেছে সহপাঠী তিন-চারটে জুটিয়ে নিয়ে। অন্য দু'টি আছে। কাঙ্গারু-দৌড়ের মধ্যে মেজো সজলের নাম। দুই পা রুমালে একসঙ্গে বেঁধে দেবে, থপথপ করে লাফিয়ে ছুটবে। পতাকীচরণ বিচারকের একজন। চুন ছড়িয়ে মোটা দাগে চিহ্নিত করা আছে, ছুটবে সেই অবধি। থামবার সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, বিচারকরা তাই এসে পৌঁছানো মাত্র ধরে ফেলেন ছেলেদের। পতাকীচরণ সজলকে ধরেছেন পাঁচ-সাত হাত দূর থেকে— ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। আর চেঁচাচ্ছেন—সেকেণ্ড, সেকেণ্ড! অর্থাৎ দ্বিতীয় হয়েছে সে প্রতিযোগিতায়। ছেলেরা কলরব করছে : না সার, ওর আগে আরও তো তিনজন ছিল, ও

পারেনি। পতাকী হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, পারেনি তো মিছে কথা বলছি ?

মহিম খাতায় ফলাফল টুকছেন। পতাকী বলেন, নিয়ে নিন সজলের নাম। ওর আগে যারা ছিল, তাদের পায়ের গিঁঠ খুলে গিয়েছিল। তাদের নাম কাটা। ভাল করে দেখে তবে বলছি।

বিচারক যা বলবেন, তার উপরে কথা নেই। লিখতেই হল মহিমকে। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করে। এটা মিটল, নতুন আর এক দফার ব্যবস্থা হচ্ছে। পতাকীচরণকে একপাশে ডেকে নিয়ে মহিম বলেন, আমারও যেন সন্দেহ ঠেকছে। আপনি বিচারক—আপনার উপরে বলবার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। দেখেছিলেন ঠিক তো—সত্যিই গিঁঠ খোলা ছিল আগের ছোঁড়া তিনটের ?

পতাকীচরণ বিরক্ত মুখে বলেন, দেখেছি বইকি! না দেখলে রক্ষে আছে ? মাইনে বাড়ার ব্যাপার ঝুলছে সামনের মিটিঙে।

দূরে কাজে ব্যস্ত দাশুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, একটা কথা বলে দিই মহিমবাবু। দাশুটা হল এক নম্বরের কোটনা। পুটপুট করে সব কথা হেডমাস্টারকে লাগায়। ওর সামনে কথাবার্তা সামাল হয়ে বলবেন। আমার মশায় ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই, যা মনে আসে বলে ফেলি। ওই যে তখন শুনে ফেলল, সমস্ত গিয়ে বলবে। আরে বলে করবি কি তুই ? সজলও বাড়ি গিয়ে বলবে আমার কথা। সে হল নিজের ছেলে—তার চেয়ে তোর কথার দাম বেশি হবে ?

এর পর আর এক রকমের দৌড় হল। তিন-পায়ের দৌড়—থ্রি-লেগেড রেস। ডি-ডি-ডি'র ছোট ছেলে কাজল তার মধ্যে। কাজলের বাঁ-পায়ে টান—ডি-ডি-ডি'র ছেলে বলে খোঁড়া বলা চলবে না। দাশু ওদের ক্লাস-টিচার—সে-ই কাজলের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। হেডমাস্টার বললেন, না হে দাশু, নাম কেটে দাও। কাজল দৌড়বে কি, পড়ে গিয়ে কাণ্ড ঘটাবে একখানা।

দাশু অভয় দেন : ওই জন্যেই থ্রি-লেগেড রেসে দিয়েছি সার। জোড়া গেঁথে দৌড়বে—যে পাখানা ইয়ে মতন আছে, সেটা অন্য ছেলের পায়ের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। খাসা দৌড়য়—বাতাসের আগে দৌড়চ্ছে, দেখতে পাবেন। সব ছেলে ছুটোছুটি করবে, ও বেচারি একলা মুখ চুন করে বসে থাকবে, সেদিক দিয়েও ভাববেন তো কথাটা !

কিন্তু খোঁড়া পা অপরের সমর্থ পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েও জুত হল না। হেরে গিয়ে হেডমাস্টারের ছেলে মুখ চুন করে থাকবে, সেটা উচিত হয় না। স্টার্ট দিয়ে দাশুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে—বাঃ, বেশ হচ্ছে, দিব্যি হচ্ছে। উৎসাহ দিয়ে চেঁচাচ্ছে শেষটা : জোরে, আরও জোরে, এই তো—আরও আরও জোরে। তাতে কুলায় না তো কনুয়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে শূন্যের উপর দিয়ে ছুটিয়ে এনে কাজল আর তার জুড়িকে ফার্স্ট করে করে দিল।

নবীন পণ্ডিতমশায় দোতলা থেকে নামলেন। জনকয়েক টিচার পরম ভক্ত তাঁর। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তাঁদের বোঝাচ্ছিলেন। পণ্ডিতের নিত্য দিনের কাজ। হেডমাস্টারমশায় অবধি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে শোনেন। কাগজে যা ছাপে, সেটা কিছু নয়। আসল বস্তু আদায় করে নিতে হয় ওই ছাপার ভিতর থেকে। পড়ে গেলেই হয় না। কাগজখানা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বাড়ি চললেন এইবার। নামলেনই যখন, উঠোনটা ঘুরে ডিউটি করে যাচ্ছেন উঁকিঝুঁকি দিয়ে। দাশুকে ডাকছেন : বলিহারি বাবা দাশু। শোন, এদিকে এস। সাক্ষাৎ ভগবান তুমি। পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—একেবারে তাই করে ছাড়লে হে ?

বেকুব হয়ে গিয়ে দাশু কৈফিয়ত দেন : এই দেখছেন, আর পতাকীবাবুর কাজটা তো দেখলেন না ! মাঝখানের তিনটে চারটে ছেলে একেবারে শক্তি হয়ে গেল—তারা নেই। সজল সেকেণ্ড

হল। পতাকীবাবু বেশি দিন কাজ করছেন আমার চেয়ে, অভিজ্ঞতা বেশি। তাঁরই নিয়ম ধরে চলেছি। মাইনে-বৃদ্ধির মিটিং হবে শোনা যাচ্ছে, হেডমাস্টারের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে। এছাড়া কি করা যেতে পারে বলুন তবে।

রেজাল্টের খাতা মহিমের হাতে। হেডমাস্টারের কাছে জমা দিয়ে যেতে হবে এটা। আসন্ন সন্ধ্যা। মাস্টার-ছাত্র কেউ নেই আর এখন। জমাদার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, ধুলোয় অন্ধকার। হেডমাস্টারই শুধু আছেন তাঁর কামরার ভিতরে। একাউন্টান্টের আসবার কথা, সে আসে নি। এল প্রাণকেষ্ট। পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পাল। মাসখানেক ধরে ডাকাডাকি করছেন, এতদিনে তার সময় হল। গরজ মুখে করে এসেছে প্রাণকেষ্ট। পা দিয়েই বলে, মডেল ট্রানস্লেশন ফুরিয়ে এল সার। সামান্য আছে। জায়গায় জায়গায় ঢেলে সাজবেন বলেছিলেন, কাপি তৈরি থাকে তো দিয়ে দিন। প্রেসে দিতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

প্রাণকেষ্টকে দেখে ডি-ডি-ডি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, এর পর কিছু ঠাণ্ডা হলেন। এডিশন কাবার হয়ে নতুন এডিশন হওয়ার মানে প্রাপ্তিযোগ কিঞ্চিৎ। বললেন, ও-কথা পরে। বইয়ের লিস্ট ছাপতে নিয়ে কী কাণ্ড করেছ! এত বড় সাহস তোমার! তারপর থেকে ডেকে ডেকে আর পাওয়া যায় না।

প্রাণকেষ্ট নিরীহ গোবেচারা মুখে বলে, কি করলাম সার?

মাস্টারমশায়রা মিলে যুক্তিপরামর্শ করে পাঠ্য বই ঠিক করে দিলেন, সে সমস্ত বই বাদ দিয়ে অন্য বই ঢুকিয়েছ।

আজ্ঞে না। তাই তো আছে। ছাপার ভুলে একটু-আধটু হেরফের হতে পারে।

একটু-আধটু? পাঁচ-পাঁচটা বই বদল হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ প্রাণকেষ্ট দাঁত বের করে হাসে: হয় ও-রকম সার।

কম্পোজিটরগুলোর মাথায় যদি কিছু থাকে! ক-এর ই-কার অ-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

'সাহিত্য পাঠ' ছিল, সে জায়গায় হয়ে গেছে 'নীতিবোধ'। এসব ছাপবার ভুল? যে পাঁচটা বই ঢুকেছে, সমস্ত তোমার কোম্পানির।

বাজে কম্পোজিটর দূর করে দেব ছাপাখানা থেকে। আর এমন হবে না।

ডি-ডি-ডি বলেন, খুব হয়েছে, আবার তোমার হাতে পড়ি! মাস্টারমশায়রা বলছিলেন, এসব বই তো আমরা দিই নি। তখন সেক্রেটারির নাম করে বাঁচি: তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন ছাপার মুখে। সেক্রেটারির এ রকম অভ্যাস আছে—লিস্টের বই কেটে দিয়ে অনেক সময় খাতিরের বই ঢোকান। এইসব বলে আপাতত রক্ষে হল। তবু বলা যায় না, কমিটির মুকাবেলা কখনো যদি কথা উঠে পড়ে, খবর পৌঁছে দেবার মানুষ তো আছে—

ভাল মতো জানেন ডি-ডি-ডি সেই মানুষগুলোকে। সামনে একেবারে ভিজে-বিড়াল, মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ। এক নম্বর হলেন কালীপদ কোনার—কমিটিতে আছেন, মেম্বারদের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে, সন্দেহ হলে তিনি বলে ফেলতে পারেন কারো কাছে। আর ঐ দাশু—শুধু হেডমাস্টারের কাছে যাওয়া-আসা নয়, সেক্রেটারির বাড়ি যায়। ও-বাড়ির পুরুতবংশের ছেলে। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন, লক্ষ্মীপূজো-সরস্বতীপূজোয় হামেশাই দাশুর বাপের ডাক পড়ে। সেই সূত্রে দাশুও যায়—ভিতর-বাড়ি মেয়েমহল অবধি যাতায়াত। কালাচাঁদ চাটুজ্জে সেক্রেটারির ছেলেকে পড়াতে যান ওখানে। নাছোড়বান্দা টিউটর। সে ছেলে প্রাচী শিক্ষালয়ের ছাত্র। সেই ইস্কুলের টিচারও আছেন পড়াবার জন্য। তবু সন্ধ্যার পরে কালাচাঁদ কোমর বেঁধে গিয়ে পড়বেন। ছেলের পড়ার ঘরে ঢুকে বই খুলে নিয়ে বসেন। ইস্কুলে এসে লম্বা লম্বা কথা: সেক্রেটারি

নিজে নাকি ডেকে বলেছেন, আপনার মতন ইংরেজি কেউ জানে না কালাচাঁদবাবু, মাঝে মাঝে এসে গ্রামারটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন ওকে। মাস পুরতে না পুরতে খামের মধ্যে তিনখানা নোট ভরে সেক্রেটারি নিজে নাকি টেবিলের উপর রেখে যান। মিছে কথা, টাকা দেবার লোক বটে সেক্রেটারি! কোন্ ধোপাকেও নাকি কাপড় কাচিয়ে নিয়ে পয়সা দেন নি—বলেছিলেন, তোর ছেলেকে ফ্রী করে নেব ভারতী ইস্কুলে। সেই মানুষ আপসে নোট রেখে যাবেন টেবিলে! বি. টি. পাশ করার পর ছেলে ফ্রী পড়িয়ে নানান রকমে সেক্রেটারির তোয়াজ করে কালাচাঁদের কাজ হাসিলের মতলব। আড়ালে আবার হাসিমস্করা করতেও ছাড়েন না। কালা বামুন আর কটা শুদ্দুর—সাংঘাতিক চিজ ওঁরা। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গঙ্গাপদবাবু অথর্ব হয়ে পড়েছেন, সেই পদটা চান! হয়তো বা আরও উপরে হেডমাস্টারি অবধি নজর। ওই মানুষকে সেজন্য তোয়াজ করে চলতে হয় খানিকটা। করতে হবে আর বোধ হয় মহিমকেও। প্রেসিডেণ্টের মানুষ যখন। এইসব প্রাইভেট ইস্কুলের হেডমাস্টারি —ইস্কুলের কাজ কতটুকু! না করলেও চলে। বাইরের বারো কর্তার মন জোগাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

এই সময় বাইরে থেকে মহিম সাড়া দিলেন, আসব?

কি মহিমবাবু, হয়ে গেল আজকের মতন? আমি দেখুন বসে আছি আপনার জন্যে। এতক্ষণ হিসেব নিয়ে পড়েছিলাম। নেমে গিয়ে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসব, সে ফুরসত হল না। রোদে সমস্ত দিন আপনারা ভাজা-ভাজা হয়েছেন। দুখিরামটা গেল কোথা রে—তিন কাপ চা এনে দিক। তুমি বুঝি উঠছ প্রাণকেষ্ট? দু-কাপই আনুক তবে। মহিমবাবু, ডেকে বলে দিন তো দুখিরামকে।

মহিম ঢুকতেই প্রাণকেষ্ট উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্য লোক এসে পড়ায় বেঁচে গেল। বলে, ট্রানস্লেশন কত ছাপা যায়—দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন, পরামর্শ করা যাবে।

মহিম বলেন, আজকের হিটসের রেজাল্ট দেখুন সার—।

ক্লান্ত স্বরে ডি-ডি-ডি বলেন, ঠিক আছে। আপনারা করে এনেছেন, দেখতে হবে কেন? বসুন, একটা পরামর্শ আছে। ফাইন্যালটা এর পরের রবিবারে যদি করা যায়। আপনি তো যান প্রেসিডেন্টের বাড়ি—খোঁজ নিয়ে আসবেন, আঠাশে সকালবেলা কোন এনগেজমেণ্ট আছে কিনা। এর পরে আমি নিজে অবশ্য যাব। কার্ড ছাপা, গার্জেনদের কাছে কার্ড পাঠানো, প্রাইজ কেনা-কাটা—হাঙ্গামা অনেক। আগে থাকতে তারিখ পাওয়া দরকার।

চা এসে গেল। চা খেতে খেতে বলছেন, শুনুন, আজ এক ব্যাপার হল এই খানিকক্ষণ আগে। এক ভদ্রলোক এসে আপনার যাবতীয় খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। কদ্দিন আছেন ইস্কুলে, মাইনেপত্তর কত, স্বভাবচরিত্র কেমন, বাড়ির খবর কদ্দূর কি জানি—এইসব। জেরার রকম দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে বিদেয় করলাম। পলিটিক্স করেন নাকি মশায়, গোপন-দলের সঙ্গে যোগাসাজস আছে? থাকে তো ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিয়েথাওয়া করে, ছেলেপুলে গড়ে তোলবার ব্রত নিয়ে এসেছেন মনেপ্রাণে লেগে পড়ুন সেই কাজে। আমার কিন্তু মনে হল আই. বি. পুলিশের লোক। আপনার পিছন ধরে আছে।

ভাবতে ভাবতে মহিম মেসে ফিরলেন। আলতাপোল হাই ইস্কুলে পড়তেন ছেলেবয়সে। গাঁয়ের ছেলে, বাইরের খবর কিছু জানতেন না। বাহির বলতে কেশবপুরের গঞ্জ—বাড়ি থেকে ক্রোশ আড়াই দূর। বড় বড় চালানি-নৌকা এসে গঞ্জের ঘাটে কাছি বেঁধে থাকত। পাকা-রাস্তা ধরে ঘোড়ার গাড়ি আসত সদরের বাবুভেয়েদের বয়ে নিয়ে। তার পরে মোটরবাস চলতে লাগল। জানা এই অবধি। বয়স বেড়ে আরও দূরের খবর আসতে লাগল ক্রমশ। প্রোমোশন পেতে পেতে উপরের ক্লাসে উঠলেন মহিম, সূর্যবাবু যে ক্লাসে পড়াতেন। একটা অধ্যায় পড়িয়ে বই মুড়ে ফেলে বলতেন, সব

মিথ্যে, বাজে ধাপ্পা। কর্মভোগ আমাদের, এগজামিনে আসে বলে এই সমস্ত পড়াতে হয়।

ছুটিতে অমুক-দা তমুক-দা সব এসে পড়তেন গাঁয়ে—কলেজের ছাত্র। এসে আত্মোন্নতি-সঙ্ঘ গড়লেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বসা হত সকলে একত্র হয়ে। সৎপ্রসঙ্গ হত। বই পড়া হত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সখারাম গণেশ দেউস্করের বই। টডের রাজস্থান, ম্যাজিনি ও গারিবল্ডির জীবন-কথা। চণ্ডীচরণ সেন ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বই। বিদ্যাভূষণের নামই বোধ হয় জানে না শহরের এইসব ছেলেরা। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মা—অতএব দেহচর্চাও করতে হত আত্মোন্নতির কারণে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। কুস্তি লড়তে হত, ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজতে হত। চারু-দা রিভলবার জুটিয়েছিলেন কোত্থেকে—এঁদো পুকুর-পাড়ে কসাড় ভাঁটবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একদিন বস্তুটা দেখালেন। হাতেও ছুঁতে দিলেন। ঘোড়া টিপলে খুটখুট করে গুলির চেম্বারগুলো ঘুরে যায় কেমন। গুলি পকেট থেকে বের করে দেখালেন। ছোট্ট লম্বাটে ধরনের জিনিস। একদিন চারু-দা বললেন, ঘর-সংসার আমাদের জন্য নয়, সারা দেশের মানুষজন নিয়ে আমাদের সংসার। হাজার-লক্ষ মানুষ নিয়ে দেশাত্মা—সকলকে গড়ে তুলতে হবে। আত্মোন্নতির মানেই হল তাই। দরকার হলে প্রাণ দেব তাদের সেবায়। গাঁয়ের ইস্কুলের নিভৃতে সূর্যবাবু পড়াতেন—আর ভারতী ইনস্টিট্যুশনে আড়ম্বরের পড়ানো কান পেতে শোন গিয়ে। ইস্কুল নয়, কারখানা একটা। মাস্টার নয়—মিস্ত্রি, কারিগর। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে কাজ চলছে। দেড়-শ দু-শ ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসছে প্রতিবার। এ চাকরি মহিমের ভাল লাগে না। প্রায় তো সাতু ঘোষের চাকরির সমান। ছেড়ে দেবেন। নিশ্চয় ছাড়বেন।

॥ বারো ॥

ক'দিন পরে হেডমাস্টার মহিমকে ডেকে বললেন, একি মশায়, আপনি বললেন আঠাশে তারিখে কোন এনগেজমেণ্ট নেই। আজ সকালে আমি নিজে গিয়েছিলাম। গঙ্গার উপরে স্টিমার-পার্টি সেদিন। আপনি কী দেখে এলেন ?

প্রেসিডেণ্টের বাড়ি যান নি মোটে মহিম। গিয়ে তো বসতে হবে—ওয়েটিংরুমে নয়, বাইরে বারাণ্ডার উপর বেঞ্চি ও বেতের চেয়ার ক'খানা আছে সেই জায়গায়। সাহেবি ঠাটবাটের অমন বাড়িতে ইচ্ছাসুখে কে যেতে চায় ? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন। ভয় করে নিশ্বাস নিতে—এই রেঃ, নিশ্বাসের হাওয়ার টানে আদব-কায়দার পলস্তারা খসে গেল বুঝি খানিকটা !

কিন্তু এই মনোভাব ভাঙেন না কারো কাছে। শিক্ষাটা করালী-বাবুর কাছ থেকে : পশার ছাড়বেন না মশায়। তা হলে ওরা পেয়ে বসবে। বেঁটেবইতে লিসার মেরে মেরে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে দেবে। যান না যান গল্প করবেন খুব। আজ এই কথা হল প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে, আজ প্রেসিডেণ্ট এই জিজ্ঞাসা করলেন ইস্কুলের সম্পর্কে। তা হলে দেখবেন, হেডমাস্টার থেকে দুখিরাম অবধি কী রকম খাতির জমাবে আপনার সঙ্গে !

না গিয়েই হেডমাস্টারকে যা-হোক একটা আন্দাজে বলে দিয়েছিলেন। বলা যখন হয়েছে, সেই টান ধরে চলতে হবে। হেডমাস্টারের জবাবে মহিম বললেন, স্টিমার-পার্টি ? স্টেনো সতীশবাবু বললেন, আঠাশে ফাঁকা আছে। আমি আরও বললাম, ভাল করে দেখে বলুন, বড় দায়িত্বের কাজ। আলুনি ভাবে বললে হবে না। সরুন, আমি নিজের চোখে দেখি একবার। এনগেজমেণ্ট-বই নিজে দেখে এসেছি সার, আঠাশে জানুয়ারি গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা।

ডি-ডি-ডি বলেন, আমার যেতে দুটো দিন দেরি হয়ে গেল, তার মধ্যেই ভরাট হয়ে গেছে তবে। পরের হপ্তায় চৌঠো ফেব্রুয়ারি ছাড়া তারিখ দিতে পারেন না। তাই পাকা করে এলাম, কি করব।

মহিম বললেন, সাতটা দিন দেরি পড়ে গেল। তাতে ক্ষতি হবে না। গরম পড়ে গেলে মুশকিল ছিল।

ডি-ডি-ডি বলেন, সাত দিন বলে তো নয়। ওর আগের দিন তেসরা মেয়ের বিয়ে আমার। যোগাড়যন্তর বিলিব্যবস্থা সমস্ত এই একটা মানুষের উপর। আড়াই কামরার ভাড়া-বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্যে কোন্নগরের পৈতৃক বাড়ি সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে যাতায়াত। কাজটা আঠাশে যদি চুকে যেত, ভেবেছিলাম পাঁচ-সাত দিন ছুটি নেব বিয়ের সময়টা। কিন্তু যে রকম দাঁড়াল, বিয়ের দিন তেসরাই হয়তো বা আসতে হয়।

মহিম বলেন, সে কী কথা! আমরা সব রয়েছি। এত ভাবনা করেন কেন?

ডি-ডি-ডি গদগদ হয়ে উঠলেন: ভরসা তো তাই। আপনাদের পেয়েছি ছোট ভাইয়ের মতন। নইলে এ যা চাকরি! বরাত ভাল যে প্রেসিডেন্ট তেসরা ফেব্রুয়ারি তারিখ দেন নি। তা হলে বোধ হয় মেয়ের বিয়েয় থাকা হত না। চাকরির চেয়ে তো মেয়ের বিয়ে বড় নয়।

তারপরে মনে পড়ে যায় একটা জরুরি কথা। বললেন, ইয়ে হয়েছে মহিমবাবু, প্রেসিডেন্টের বক্তৃতাটা লিখতে হবে। বললেন, কত শিক্ষক আছেন, কাউকে বলে দেবেন। প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে বেরুবে, যাকে তাকে দিয়ে সে জিনিস হয় নাকি? আপনার সেই গল্পটা দেখেছি, খাসা বাংলা আপনার। ইংরেজি হলে তো আমি কলম ধরতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বলে দিলেন, ওই দিনটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসে বক্তৃতা করবেন। পাবলিক এইসব চাচ্ছে

আজকাল। ইংরেজি বলতে গেলে হয়তো বা হৈ-হৈ করে উঠল: বাংলায়—বাংলায়। যত মুখ্যু নিয়ে কাজকারবার তো! সভা-সমিতির আর কোন ইজ্জত থাকতে দিল না।

করালীকান্ত এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি টিপ্পনী কাটেন: দেশের কী হাল হচ্ছে সার। বিয়ের মন্তোরও এর পরে বাংলায় পড়তে বলবে। পাবলিকে যেটা বোঝে।

দিনকে দিন বাংলা চালু হচ্ছে, এই নিয়ে হাসাহাসি চলল খানিকটা। দুঃখের কারণও বটে! কাজকর্ম কিছু আর হবার জো নেই। বেশি দূরে যেতে হবে কেন—ইস্কুল-কমিটির মিটিং হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারটা ধর না। এঁর আগের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ—নিজের বাড়ি কি করতেন জানা যায় না, কিন্তু বাইরের কাজেকর্মে ইংরেজি ছাড়া বাংলা বলতেন না। মিটিঙের মধ্যেও নিয়ম ছিল, যত কিছু কথাবার্তা ইংরেজিতে। আধ ঘণ্টার ভিতর দশটা আইটেম খতম হয়ে যেত। নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কেউ কিছু বলত না—ইংরেজি গ্রামার ভুল করে হাস্যাস্পদ হয়ে যায় পাছে। বাংলা হয়ে এখন ভয়-ভাবনা ঘুচে গেছে। দেদার বলে যাও, দরকার না থাকলেও মাতব্বরি দেখাবার জন্যে বল। একটা আইটেম সারা হতে এখন দুটি ঘণ্টার ধাক্কা। কাজকর্ম হবার জো আছে!

হেডক্লার্ক অমূল্য এমনি সময় এসে ঢুকল। গলার চাদরটা নিজের চেয়ারের উপর ফেলে অর্থাৎ উপস্থিতির পরিচয় রেখে আবার তক্ষুণি নিচে তামাক খাবার ঘরে ছোটে। হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়েছে—মউজ করে পুরো একটি ছিলিম টেনে তবে কাজে বসবে। কাজ ঘোড়ার ডিম—সেকেণ্ড-ক্লার্ক ফকিরচাঁদের কাছে কাজের কথা শোন গিয়ে। বড় গলায় হুকুমহাকাম ছাড়া—ওটার কি হল, এটা হয় নি কেন? আর কথায় কথায় সেক্রেটারির দোহাই পেড়ে আসর গরম করা। যখন খুশি আসে, যখন খুশি চলে যায়।

মাথার উপরে হেডমাস্টার একজন রয়েছেন, তাঁকে একটা মুখের কথা বলে যাওয়ার ভদ্রতা নেই।

চা খাওয়ার অনেকগুলো দল মাস্টারমশায়দের ভিতর। ফকির-চাঁদের কাউণ্টারের পিছনে জনকয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে যান। পয়সা জমা থাকে ফকিরের কাছে, ঘণ্টা বাজবার মুখে সে চা আনিয়ে রাখে, মাস্টারমশায়রা যেমন যেমন আসেন গেলাসে চা ঢেলে দেয়। ফকিরচাঁদ নাকি-কান্না কাঁদে এঁদের কাছে: অমূল্যবাবু কিছুই করেন না, একলা আমার কাঁধে যত চাপ।

ভূদেব বলেন, খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। ইস্কুলে একবার করে আসছে, সেই তো ঢের।

কালাচাঁদ বলেন, উঁহু, অমূল্য খাটে না একথা কদাচ বোলো না ফকির। অমূল্যর খাটনি অনেক বেশি তোমার চেয়ে। আমি দেখে থাকি। সকাল-সন্ধ্যা সেক্রেটারির বাড়ি তিথিকাকের মতো পড়ে থাকা। ইস্কুলের টাইপরাইটার সেক্রেটারি বাড়ি নিয়ে রেখেছেন—সে কি অমনি অমনি? চিঠিপত্তর, আর ওঁর কী ঘোড়ার ডিমের থীসিস আছে গাদা-গাদা সেই সমস্ত টাইপ করা। তার উপরে হল বা, কাছাকাছি বাজার আছে—এক ছুটে গিয়ে চাট্টি মাছ-তরকারি এনে দেওয়া। আর সেক্রেটারি সেই যখন বাড়ি বানাচ্ছিলেন—ওরে বাবা!

একটা গল্প খুব রসিয়ে করে থাকেন কালাচাঁদ। সেক্রেটারির নতুন বাড়ি হচ্ছে। কালাচাঁদ সেই সময়টা ইস্কুলের চাকরির উমেদার—তাঁর কাছে দিনরাত হাঁটাহাঁটি করছেন। যখনই যান, অমূল্য হাজির। একদিন কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেই তো পড়ে থাকেন, ইস্কুলে যান কখনো আপনি?

অমূল্য বলল, হ্যাঁ, যেতে হয় বইকি! পয়লা তারিখ, মাইনে নেবার দিন যাই।

বলল বড় বেদনার সঙ্গে। যেন মাইনেটা বাড়ি পৌঁছে না দেওয়ায় বিষম অত্যাচার হচ্ছে তার উপরে।

সেক্রেটারির যত কিছু বক্তব্য অমূল্যর মুখ দিয়ে এসে পৌঁছয়। তাকে অতএব সমীহ না করে উপায় নেই। চৌঠো ফেব্রুয়ারির কথা ডি-ডি-ডি কাল নিজে গিয়ে সেক্রেটারির টেবিলে লিখে রেখে এসেছেন। অমূল্যর কাছে খবরটা নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট তারিখ দিয়ে দিয়েছেন—সেক্রেটারির আপত্তি না থাকে তো হুড়োহুড়ি এবারে। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপতে দিতে হবে আজকেই। করালীবাবু মেডেলের কথা তুললেন: চাঁদিরূপোর হলে প্রত্যেকটা আট-দশ টাকা পড়বে। আবার আট আনা থেকেও আছে। বাজেট বুঝে বলুন এবারে সার, কি রকমের ক'টা আসবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, বড়-মেজো-সেজো কমিটির সব কর্তা সেদিন আসবেন। ইস্কুল-বাড়িও হয়তো ঘুরে ঘুরে দেখবেন। চারিদিক সাফসাফাই থাকে যেন করালীবাবু। আমতলার জঞ্জালের গাদা যেন সরানো হয়। ক'টা ডাল নিচু হয়ে পড়েছে, কেটে দেবেন ওগুলো। ক্লাসের দেয়ালে আর পায়খানায় ছেলেরা এটা-ওটা লেখে, চুনের পোঁচ টানিয়ে দেবেন তার উপর। ফুলের মালা আর তোড়া যা লাগবে, সে ভার মহিমবাবুর উপর দিন। কবি মানুষ, পছন্দ করে কিনবেন। আর একটা কাজ—আপনি শুনে নিন মহিমবাবু। ফাইন্যালের ছেলেগুলোকে লিস্টি ধরে আগে থাকতে নাম বলে দেবেন। সেদিন সকাল সকাল তারা ইস্কুলে চলে আসবে। ইস্কুল থেকে একত্র করে নিয়ে পার্কের একটা জায়গায় জমায়েত করবেন। ছড়িয়ে থাকলে কাজকর্মে দেরি হয়ে যায়। আপনি দাশু আর পতাকীবাবু তিনজনের উপর ভার। আর যাকে দরকার মনে করেন, নিয়ে নেবেন আপনাদের সঙ্গে।

অমূল্য ফিরছে এতক্ষণে তামাক খাওয়া সেরে। ডি-ডি-ডি কাছে ডাকলেন: আমার চিঠি দেখেছেন সেক্রেটারি? কি বললেন?

বিরক্ত ভাব কেমন যেন। বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না, অনেক পরামর্শ আছে। সন্ধ্যেবেলা আজ আবার যেতে বলেছেন।

বলে তিলার্ধ সময়ক্ষেপ না করে অমূল্য নিজের চেয়ারে চলে গেল।

নিমন্ত্রণ-পত্র কেমন হবে ডি-ডি-ডি তার মুশাবিদা করছিলেন। কলম থামিয়ে ক্ষণকাল গুম হয়ে রইলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, বিরক্ত হলে আমি কি করতে পারি? কালকে গিয়ে মশায় দেড় ঘণ্টা বসে থাকার পর শুনলাম রুগি দেখে ফিরলেন। খবর পাঠালাম—বলে, খেতে বসে গিয়েছেন। তারপরে বলে, নতুন রেকর্ড কিনে এনেছেন, খাওয়ার পর গান শুনছেন সকলে মিলে। আমার ট্রেনের সময় হয়ে যায়—কি করি, লিখে রেখে চলে এলাম। এত বড় গবর্নমেণ্ট চলছে লেখালেখির উপর, আমাদের তাতে হবে না—

মহিম সহানুভূতির স্বরে বলেন, বাড়িতে কাজ। এই সময়টা রোজ রোজ গিয়ে বসে থাকা—

রাত পোহালে কাল পাত্রপক্ষ পাকা দেখতে আসছে মেয়েকে। বাড়ি থেকে বলে দিয়েছে আজ সকাল সকাল ফিরতে। আর উনি বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না—নিজে যেতে হবে। না হলে আর কি করছি! যাব তাই, বন্ধিনাথের মন্দিরের মতো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকিগে। মেয়ের পাকা-দেখা যেমন হয় হবে।

মহিম অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাজকর্ম অনেকটা বুঝে নিয়ে করালীও উঠছেন। ডি-ডি-ডি বলেন, বসুন না একটু। অনেকগুলো বিল জমে আছে। নিরিবিলি আছি—দুজনে ওইগুলো দেখে পাশ করে রাখা যাক।

করালী কেটে দেন সঙ্গে সঙ্গে: আমি তো রেট দেখে একবার মিলিয়ে দিয়েছি। আর যা দেখবার আপনি দেখুন সার।

আবার বলেন, সেক্রেটারি আটটার আগে বাড়ি ফিরবেন মনে হয় না। এতক্ষণ কোথায় বসে থাকেন আপনি একা একা? মুশকিলের কথা হল। মাস্টারমশায়রা টুইশানিতে বেরবেন, খুন হয়ে গেলেও এসময় কাউকে পাবেন না। আমি থাকতে পারতাম। কিন্তু ওই

যে বললেন চুনের পোঁচ টেনে দেয়ালের লেখা ঢেকে দিতে হবে—রাজমিস্তিরির খোঁজে বেরব এখনই। কেঠোকুঠি লেনে না পেলে সেই পার্কসার্কাস অবধি দৌড়তে হবে।

সাড়ে-সাতটা। গড়ের মাঠে খুব কষে আজ সান্ধ্যভ্রমণ করেছেন ডি-ডি-ডি। সেখান থেকে সোজা কালীবাড়ি গিয়ে মায়ের দর্শন সারলেন। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন সেক্রেটারির বাড়ি অবধি। সময় কিছুতে কাটতে চায় না, ঘড়ির কাঁটা যেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে।· ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় এসে ডি-ডি-ডি বসে পড়লেন অবনীশের বৈঠকখানায় নয়, সিঁড়ির মুখে দরোয়ান যে বেঞ্চিখানায় বসে তার উপর। বৈঠকখানায় ঢুকে চুপচাপ বসে থাকেন, আর সেক্রেটারি এদিক দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যান। চাকরবাকরগুলোকে খবর দিতে বললে গা করে না। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের সকলকে তারা চিনে রেখেছে, মানুষ বলে ধরে না এঁদের।

আছেন দরোয়ানের বেঞ্চিতে। গেটের কাছাকাছি কতবার গাড়ি থামবার শব্দ হয়, ডি-ডি-ডি উঠে দাঁড়ান। কিছু নয়, রাস্তার চলতি গাড়ি কি কারণে থেমে গিয়েছিল একটু। আটটা বেজে যাওয়ার খানিক পরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল—এসেছেন। ডি-ডি-ডি'কে দেখে বললেন, কী আশ্চর্য, এখানে কেন মাস্টারমশায়? ভিতরে গিয়ে বসুনগে। যাচ্ছি আমি।

শোনা গেল, খেতে বসেছেন অবনীশ। ডাক্তার মানুষ—স্বাস্থ্যের নিয়ম ষোলআনা মেনে চলেন। খাওয়া সাড়ে-আটটার মধ্যে সারবেনই। যত কাজই থাকুক।

বসে আছেন ডি-ডি-ডি। আজ যখন স্বচক্ষে দেখে গেছেন, খাওয়া অন্তে রেকর্ড বাজাতে বসবেন না। তাই বটে। চাকরের উদয় হল ভিতরের দিক থেকে। ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, খুট করে

সুইস টিপে পাঁচ-বাতিওয়ালা ঝাড়টা জ্বেলে দিয়ে চলে গেল। অবনীশ এলেন। নমস্কার বিনিময় হল, কিন্তু বড় গম্ভীর। আলমারির কাছে গিয়ে খুঁজে খুঁজে এক ডাক্তারি বই নিয়ে বসলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে গিয়েছেন। পড়ছেন। পড়তে পড়তে পাতা উল্টাচ্ছেন।

দেয়াল-ঘড়িতে টকটক করে পেণ্ডুলাম দুলছে। ডি-ডি-ডি ওদিককার একটা চেয়ারে স্থাণুর মতো বসে। চোখের ঠিক সামনে দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা কেঁপে কেঁপে এগিয়ে চলছে। তা সত্ত্বেও নিজের বাঁ-হাত ঘুরিয়ে হাত-ঘড়ি দেখছেন বারংবার।

বই বন্ধ করে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। সাহস করে ডি-ডি-ডি ডাকলেন, স্পোর্টসের কথাটা সার—

হুঁ—বলে সাড়া দিয়ে অবনীশ পুনশ্চ আলমারির ধারে গেলেন। হাতের বইটা যথাস্থানে রেখে এবারে একটা ঢাউশ বই বের করে নিয়ে চেয়ারে ফিরে এলেন।

ফাঁক পেয়ে ডি-ডি-ডি অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন : চৌঠো স্পোর্টসের ফাইন্যাল। প্রেসিডেণ্ট তারিখ দিয়েছেন। সার আমায় আসতে বলেছিলেন এই ব্যাপারে।

হচ্ছে—বলে ঢাউশ বইটা খুলে অবনীশ তার মধ্যে ডুবে গেলেন। সাড়াশব্দ নেই।

মরীয়া হয়ে ডি-ডি-ডি বলেন, আমায় সার কোন্নগর যেতে হবে। সেখান থেকে যাতায়াত। এখানকার বাসা তুলে দিয়েছি।

হুঁ, জানি—বলে আঙুল জিভে ঠেকিয়ে অবনীশ ফসফস করে বইয়ের তিন-চার পাতা উল্টে গেলেন।

আরও অনেকক্ষণ গেল। ডি-ডি-ডি কাতর হয়ে বলেন, শেষ লোকাল বেরিয়ে গেছে। আর দেরি হলে বাসও পাওয়া যাবে না।

অবনীশ নিবিষ্ট একেবারে। ডি-ডি-ডি'র মনে হল, ভ্রূ দুটো তাঁর কুঞ্চিত হচ্ছে পাঠের মধ্যে বারংবার ব্যাঘাত ঘটানোর দরুন। কিন্তু

নিরুপায় হেডমাস্টারকে তবু বলতে হয়, মেয়ের পাকা-দেখা কাল সকালবেলা। ট্রেন পাব না, হাওড়া থেকে শেষ-বাস ছাড়বে ঠিক সাড়ে-ন'টায়। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে যদি উঠতে পারা যায়—

না রাম না গঙ্গা—কোন রকম জবাব নেই ও-তরফের। কানেই পৌঁছল না হয়তো। কি করবেন ডি-ডি-ডি, বসেই আছেন। আর মনে মনে ভারতী ইনস্টিট্যুশনের হেডমাস্টারি চাকরির মাথায় ঝাড়ু মারছেন।

ঘড়িতে ঠিক সওয়া-ন'টা, সেই সময় অবনীশ মুখ তুললেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, কী আশ্চর্য! এত রাত হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। আপনাকে তো অনেক দূর যেতে হবে। চলে যান আপনি। আজকে আর হল না, কাল আসবেন।

ডি-ডি-ডি আহত কণ্ঠে বলেন, এখন হাওড়া অবধি গিয়ে বাসও আর পাওয়া যাবে না। সে যা হয় হবে। অনেকক্ষণ বসে আছি, স্পোর্টসের কথাবার্তাগুলো হয়ে গেলে ভাল হয়। কাজে লেগে পড়তে হবে এইবারে তো!

প্রতিবাদের কথায় অবনীশ অসহিষ্ণু হলেন। বলেন, দু-হপ্তা সময় আছে, তাড়াতাড়ি কিসের? একটা শক্ত কেস নিয়ে পড়েছি, সঠিক ডায়োগনেসিস হচ্ছে না, মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপার। আজ হবে না, আপনি কাল আসবেন মাস্টারমশায়।

মাঘের ওই অত রাত্রে ছাড়া পেয়ে ডি-ডি-ডি কী বিপাকে পড়লেন, সে জানেন তিনি আর জানেন অন্তর্যামী ভগবান। কিন্তু পরদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখা গেল, জানতে কারও বাকি নেই—ইস্কুলময় চাউর হয়ে গেছে। অমূল্য ঠিক সাড়ে-দশটায় হাজিরা দিয়েছে আজ। তারই কাণ্ড। দাশু ফিসফিস করে বলে গেলেন, মাস্টারদের সঙ্গে সে খুব হাসাহাসি করছিল এই নিয়ে। আজকেও নাকি সারকে যেতে হবে। কতবার গিয়ে কাজ মেটে তাই দেখুন। আসল ব্যাপার,

এত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের দিনে রাতে কখন কি দরকার পড়ে—কোন্নগর থেকে এসে কাজ করা সেক্রেটারির গরপছন্দ। পাড়ার মধ্যে আবার সারকে বাড়িভাড়া করতে হবে—তা সে যেমন খরচাই হোক।

সেক্রেটারির বাড়ি যেতে যেতে ডি-ডি-ডি মনে মনে ঠিক করছেন, একটা কথা ওঁকে আজ স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে হবে। আপনি যা করুন আর যা-ই বলুন, অন্য লোকে টের না পায় যেন কিছুতে। জানাজানি হলে কেউ আর মানতে চাইবে না। অতগুলো ছাত্র-শিক্ষক চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো অসম্ভব হবে তার পরে।

কিন্তু কোন-কিছু বলবার অবকাশ হল না, এক কথায় সেক্রেটারি শেষ করে দিলেন। বললেন, পার্কে ব্যবস্থা করছেন শুনলাম। ফাঁকা জায়গা—মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকে যেন। রোদের বেশ চাড় হয়েছে।

এই মাত্র। এই পরামর্শের জন্য ডি-ডি-ডি তিনটে দিন নাজেহাল হলেন। অবনীশ চাটুজ্জের এই স্বভাব। ক্ষমতা আছে, সেইটে জাহির করা। কাজকর্ম করা উদ্দেশ্য নয়, বোঝেনও না কিছু। অন্যের অসুবিধা ঘটিয়ে আনন্দ।

॥ তের ॥

বক্তৃতা একটা দাঁড় করিয়েছেন মহিম। নাম হল দেহচর্চা। প্রেসিডেণ্টের মুখ দিয়ে বেরবে, যে-সে ব্যাপার নয়। খুব খেটেখুটে লিখেছেন। স্বদেশি দাদাদের কাছে সেই সব পুরানো আলোচনা ও পড়াশুনো বেশ কাজে লেগে গেল। খাসা উতরেছে লেখাটা। হেডমাস্টারকে দিচ্ছেন, পড়ে কি বলেন তিনি শোনা যাক।

দেখুন দিকি কি রকম হল ?

আমার দেখে কি লাভ ? আসল মানুষের দেখলেই হবে। না দেখে কি তিনি নিজের নামে চলতে দেবেন ?

মহিম বলেন, অত বড় লোকের হাতে যাবার আগে আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি সার।

বড্ড ব্যস্ত, দেখতে পাচ্ছেন তো ! পরে।

ডি-ডি-ডি খপ করে লেখাটা নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। করালী-বাবুর সঙ্গে কিসের একটা ফর্দ হচ্ছিল তখন। গম্ভীর কণ্ঠে করালী বললেন, ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে পড়তে হবে, তাড়াহুড়োর মধ্যে হয় না। সার রেখে দিলেন, কাজ হয়ে গেলে পড়ে দেখবেন।

খানিক পরে কাজকর্ম সেরে করালীকান্ত ঘরের বাইরে এলেন। মহিম ঘোরাঘুরি করছেন তখনও—এমন চমৎকার লেখাটা হেডমাস্টারকে পড়ে শোনাতে পারলে তৃপ্তি হত। কল্পনার চোখে দেখতে পান, হেডমাস্টারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, ওয়েল ডান ইয়ংম্যান—প্রতিভা আপনি একটি !

করালীবাবুকে বললেন, এইবারে যাওয়া যায় বোধ হয়। কি বলেন ?

করালী না বোঝার দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, কোথায় ?

তারপর মহিমকে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, ঘণ্টা, ঘণ্টা! কী শুনবেন উনি, আর কী বুঝবেন! লেখাপড়া জানেন নাকি? পাঁচলাইন ইংরেজি লিখতে তিনটে ভুল। দেশবন্ধুর মৃত্যু হল, ছুটির সার্কুলারে দেশবন্ধুর কোন বিশেষণ দেওয়া যায়—তিলকের মৃত্যুতে সেই কোন কালে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল, পুরানো খাতা ঘেঁটে ঘেঁটে সার্কুলার খুঁজে বেড়ান। আর আপনার ও-জিনিস তো বাংলা—জন্মে এক পাতাও পড়েন নি বোধ হয়। কমিটিও ঠিক এই রকম চান। পণ্ডিত হেডমাস্টার তো পড়াশুনো নিয়ে থাকবেন, এত বড় ইস্কুল সামলানো তাঁর কর্ম নয়। চাই এখানে দারোগা হেডমাস্টার। ভাল ভাল টিচার রয়েছেন, পড়াবেন তাঁরাই। ওঁর কাজ খবরদারি করা—টিচাররা ফাঁকি না দেয়, ছেলেপুলে হৈ-চৈ না করে। তারপরে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে নিয়মিত তেল দিতে হবে সেক্রেটারিকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সঙ্গে উপমা দিতে হবে। না দিতে পারলে বিগড়ে যাবেন। হেডমাস্টার স্কলার হলে ওইসব করতে আত্মসম্মানে বাধবে।

স্পোর্টসের ছেলেরা ব্যবস্থা মতো সকাল সকাল এসেছে। ইস্কুলের হলঘরে মহিম নিয়ে বসিয়েছেন। এদের মধ্যে মলয় চৌধুরি। ফুটফুটে দেবশিশুর মতন চেহারা, থোপা-থোপা কোঁকড়া চুল, নিষ্পাপ সরল চাউনি। এ শরীরে দৌড়ঝাঁপ হয় না, মলয় নেইও তার মধ্যে। মহিম তাকে আসতে বলেছেন প্রেসিডেন্টের গলায় মালা পরিয়ে দেবে এই জন্যে।

কখন সে ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিল। রামকিঙ্কর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন।

হল কি রামকিঙ্করবাবু?

অনেক বিদ্যে শেখাই তো আমরা। পায়খানার দেয়ালের উপর বিদ্যে জাহির করছিল। তামাক খাবার টিকে এনে রাখে, সেই

টিকে নিয়েছে একখানা। আমায় দেখে টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার চোখ রাঙায় : আমি নই সার, অন্য কে লিখেছে।

করালীবাবু কোন দিকে ছিলেন। দেয়ালে লেখার কথা কানে গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন :'অ্যাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা মিস্তিরি চুনটানা সারা করে দিয়ে গেল—নচ্ছার ছেলেপুলে চব্বিশ ঘণ্টাও দেয়াল সাদা থাকতে দেবে না? বিচ্ছের জাহাজ সব! দুখিরাম কোথায় গেলি রে? চুনের বালতি নিয়ে আয়, আর পোঁচড়াটা। একটান টেনে দিয়ে আসি। দত্তবাড়ির ছেলে হয়ে মিস্তিরিগিরিও কপালে ছিল রে!

দুখিরামকে নিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন। মহিমকে বলেন, আসুন মশায়। একটি বার যেতে হবে। আপনাকে না দেখিয়ে ও-জিনিস মোছা যায় না তো!

বজ্রমুষ্টিতে মলয়ের হাত এঁটে ধরলেন। নরম হাত গুঁড়ো হয়ে যায় বুঝি! মহিম আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, অত রাগ করছেন কেন? নতুন লিখতে শিখে ছেলেমানুষে লেখে অমন যেখানে-সেখানে।

করালী বলেন, লেখা বলে লেখা! রীতিমতো সাহিত্য একখানা। আপনি সাহিত্যিক মানুষ, কদর বুঝবেন। ফুলের মালা দেবার জন্য একে আনিয়েছেন, মালা এরই গলায় পরিয়ে দিতে হবে।

ইঙ্গিত বুঝে রামকিঙ্কর এবং আর যে দু-তিনটি শিক্ষক ছিলেন, সবাই চললেন দেখতে। লেখা পড়ে মহিমের আপাদমস্তক রি-রি করে জ্বলে ওঠে, বিষম এক চড় কষিয়ে দিলেন মলয়ের গালে। পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল।

রামকিঙ্কর শশব্যস্ত হয়ে কানে কানে বলেন, সামলে মহিমবাবু। বড়লোকের ছেলে—মারধোর করবেন না, গার্জেনের চিঠি নিয়ে আসবে।

মহিম গর্জন করে ওঠেন, খুন করে ফেলব ওকে।

বড্ড ভয় পেয়েছে মলয়। ঘাড় নেড়ে সে প্রবল প্রতিবাদ

করে : আমি লিখি নি সার। লিখেছে অন্য কেউ। আমি জানি নে।

সব ছাত্রই সমান শিক্ষকের চোখে। এ-বস্তু যে ছেলের হাত দিয়েই বেরুক, ক্ষিপ্ত হয়ে যাবার কথা। তবু মহিম একান্তভাবে চাচ্ছেন, মলয় না হয় যেন। যে ছেলে নতুন এসে তাঁর গায়ে হাত রেখেছিল : ভাল লাগে না সার, বাড়ি যাব, মায়ের জন্য প্রাণ পুড়ছে···

মহিম বলেন, দাঁড়া ওই লেখাটার সামনে। দেখব।

যেইমাত্র দাঁড়ানো, ঠাঁই-ঠাঁই করে আরও তিন-চারটে চড়। ঘাড় ধরে গেটের বাইরে দিয়ে এলেন। আর গর্জাচ্ছেন : মালা ওকে ছুঁতে দেব না। ফুল অপবিত্র হয়ে যাবে।

শাস্তির বহর দেখে করালী দয়ার্দ্র হয়ে বলেন, রামকিঙ্করবাবু চোখে ভাল দেখেন না, না-ও হতে পারে ও-ছেলে—

মহিম বললেন, তাই আমি দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেখে নিলাম। অন্যায় করেছে, আবার মিথ্যা বলে ঢাকতে যায়। ও-ছেলে অধঃ-পাতে গেছে।

সার্লক হোমস দেয়ালের লেখা দেখে বলে দেন, লোকটা লম্বায় কত। দাঁড়িয়ে লিখতে গিয়ে সাধারণ ভাবে লোকে চোখের সামনে দিয়েই লাইন ধরে। বিলাতি নবেলে পড়া এই পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ে দেখেছেন মহিম। মলয়ের বেলাতেও ঠিক ঠিক মিলে গেল।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে মহিম বলেন, কোন জজ ছাত্র নিয়ে আপনার তো বড্ড দেমাক—

রামকিঙ্কর সগর্বে বলেন, তার নাম সুখময় চক্কত্তি। আমারই হাতে মানুষ। ভর্তি হবার সময় এসেছিল এক নম্বরের হাঁদারাম, সেই মাল শেষ অবধি জজ হয়ে উতরে বেরুল।

করালী রামকিঙ্করের কথাই ঐ সঙ্গে জুড়ে দেন, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

মহিম বলেন, কোনকালে কি হয়েছিল জানি নে। সে দিনকাল উল্টে গেছে। এখন আমরা করে থাকি, ঘোড়া পিটিয়ে গাধা। এক বছরে চোখের উপর অন্তত এই একটাকে দেখলাম।

একটুখানি থেমে আবার বলেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, মাস্টারি করা পাপের কাজ।

পার্কের একপ্রান্তে রঙিন চাঁদোয়া খাটানো। অবনীশের যেমন নির্দেশ। পিছন দিকে পর্দা, থিয়েটারের সিনের মতো কতকটা। রাজসিংহাসনের ধাঁচের একখানা চেয়ার। আশেপাশের চেয়ার-গুলোও খারাপ নয়। এই চাঁদোয়ার নিচে প্রেসিডেণ্ট ও কমিটি-মেম্বাররা বসবেন। বিশিষ্ট কেউ যদি আসেন, তাঁকেও আহ্বান করে বসানো হবে এখানে। চাঁদোয়ার বাইরে দু-সারি হালকা চেয়ার, গুনতিতে খান পঞ্চাশেক। নিমন্ত্রিত গার্জেনদের জায়গা। দেড় হাজার চিঠি ছাড়া হয়েছে—কুলাবে না সেটা আগে থাকতেই জানা। লোক-দেখানো—জায়গা করে রাখতে হয়, তাই। না কুলালো তো দাঁড়িয়ে থাকবেন এধারে ওধারে। দাঁড়াতে না চান, চলে যাবেন। মাথার দিব্যি কে দিয়েছে থাকবার জন্যে ?

এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর বলা যায় করালীকান্তকে। সাজগোজে আজকে বড্ড বাহার। চুলের ঠিক মাঝখান দিয়ে টেড়ি চালিয়ে দু-পাশ ফাঁপিয়ে দিয়েছেন। এলবার্ট কাটা বলে এই পদ্ধতি—মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এলবার্ট নাকি এমনি টেড়ি কাটতেন। প্রেসিডেণ্টের চেয়ারের সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের উপর প্রাইজের জিনিসপত্র সাজানো। করালীবাবু সেই সমস্ত আগলে আছেন। যথাসময়ে মহিম নাম ডেকে যাবেন, আর করালী প্রাইজগুলো চটপট প্রেসিডেণ্টের হাতে তুলে দেবেন, তিলেক দেরি না হয়। মহিম ওদিকে স্পোর্টস শেষ হওয়া মাত্র ছেলেগুলোকে ফের এক জায়গায় এনে লাইন সাজিয়ে লিস্টি করে ফেলবেন। সময় বেশি দিতে

পারবেন না প্রেসিডেণ্ট, অন্যত্র কাজ আছে। শিক্ষক আরও পাঁচ-সাতজন এইদিকে ছুটাছুটি করছেন এমনি নানা কাজকর্মে। বাকি সব মাঠের ডিসিপ্লিন রাখছেন। তার মানে মজা তাঁদের। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজা করে দৌড়ঝাঁপ দেখবেন।

এর মধ্যে করালীবাবু একবার মহিমকে বললেন, আরে মশায়, আপনার সেই লেখা নিয়ে তো বিস্তর কথাবার্তা—

মহিম পুলকে ডগমগ হয়ে বলেন, কি রকম, কি রকম? কে কি বললেন শুনি।

বলছিলেন নবীন পণ্ডিত। হেডমাস্টার ওঁকে দেখতে দিয়েছিলেন। যা ওঁর স্বভাব—অন্যের কিছু ভাল দেখতে পারেন না। বললেন, ছ্যা-ছ্যা—এই ছেঁদো জিনিস প্রেসিডেণ্টের হাতে দেওয়া যায় না। ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মুখ কালো করে মহিম বললেন, পড়ে দেখে বললেন এই?

পড়েন কি আর উনি? বিদ্যাসাগর মশায়ের পরে কে কবে বাংলা লিখল যে উনি পড়তে যাবেন! হেডমাস্টারের খাতিরে চোখ বুলিয়েছিলেন হয়তো একটু। বক্তৃতাটা ওঁরই লেখবার কথা। উনি পাখসাট মারলেন বলে আপনার ঘাড়ে এসে পড়ল। তাই বললেন হেডমাস্টার: আপনি করলেন না, মহিমবাবু যা-হোক একটা দাঁড় করিয়েছেন। এর উপরে কিছু দাগরাজি করে আপনি চলনসই করে দিন, প্রেসে পাঠানো যাক। আমিও সাহস দিলাম: প্রেসিডেণ্ট বাংলা স্টাইলের কি জানেন! কোন দিন পড়েছেন ওঁরা বাংলা? যা হাতে দেবেন, সোনা হেন মুখ করে পড়ে যাবেন।

মহিম সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। নবীন পণ্ডিতের দাগরাজিতে কী দশা দাঁড়াল লেখাটার! প্রেসিডেণ্ট এসে কতক্ষণে বক্তৃতা করবেন—ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট তার আগে খোলা হবে না।

অবশেষে এলেন প্রেসিডেণ্ট। সেক্রেটারি অবনীশ ও হেডমাস্টার পার্কের দরজা অবধি ছুটে গিয়ে এগিয়ে আনলেন। করালীবাবু

এবং দাশুও ছুটেছেন। এঁরা দু-জন বিষম কাজের মানুষ, ছুটাছুটি ও হাঁকডাকে জাহির করছেন সেটা কর্তাদের সামনে। কী তাজ্জব, যা বলেছিলেন একেবারে ঠিক তাই—ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্রভাত পালিত। স্পোর্টসের চেয়ে এইটেই যেন বড় দর্শনীয় বস্তু, আঙুল দিয়ে এ-ওকে দেখাচ্ছে। কে-একজন বলে উঠল, সবে তো কলির সন্ধ্যে। আসছে বারে দেখো খদ্দর পরে মাথায় গান্ধিটুপি চড়িয়ে আসবে এই মানুষ।

গলা শুনে মহিম মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মানুষটির দিকে। আবার কে—তারক কর মশায়—ম্যাকলিন কোম্পানির ক্যাশিয়ার, বড় বোন সুধার ভাসুর। তারক-দাদা বলে ডাকেন তাঁকে। থাকেন বেহালার দিকে—এ তল্লাটে নয়। ভারতী ইনস্টিট্যুশনে তাঁর ছেলেপুলে পড়ে না, নিমন্ত্রণ-পত্রও যায় নি। তবু এসে জুটেছেন তিনি, এক চেয়ার দখল করে জাঁকিয়ে বসে আছেন। নিজেই বলছেন, রবিবারে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাই। ফিরে যাচ্ছি, দৌড়ঝাঁপ দেখে বসে পড়তে হল। আমারও খুব নাম ছিল এক সময়, খুব দৌড়তে পারতাম। তা দেখ, শহরে থেকে ট্রামে-বাসে চড়ে চড়ে শরীরে কিছু পদার্থ থাকে না। হাঁটতেই দম বেরিয়ে যায়, তার দৌড়নো। দূর দূর, এসব নচ্ছার জায়গায় মানুষ থাকে!

ট্রাম-বাসের উপর দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু বয়স এদিকে ষাটের কাছাকাছি এল, সে কথা ভাবছেন না তারক-দাদা। মাথায় একগাছি কালো চুল নেই, চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোন বয়সে দৌড়তে পারতেন—তার পরে কত কাল কেটে গেছে, সেটা খেয়াল থাকে না তাঁর।

একটা-কিছু বলতে হয়, মহিম তাই বললেন, অনেক দিন আপনার বাসায় যাওয়া হয় নি। একের পর এক এইসব চলছে। আজ রবিবারেও এই দেখছেন। ফুরসত পাই নে।

তারক বলেন, তোমার একটা বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম। তোমার

মা খুব করে বলেছিলেন। উচিত বটে! পাশ করেছ, চাকরি হয়েছে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বললেন, চাকরি না হলে কিন্তু বিয়েটা ঠিক লেগে যেত। আমাদের এক্সপোর্ট সেকসনের বড়বাবুর সেজো মেয়ে। মেয়েটা ভাল—ইস্কুলে পড়ে ফার্স্ট ক্লাসে। এক্সপোর্টের কাজে ভাল রোজগার—পাওনা-থোওনার দিক দিয়ে ভালই হত। কিন্তু ফেঁসে গেল, ইস্কুল-মাস্টারকে মেয়ে দেবে না।

মহিম বলেন, বিয়ে আমি করব না তারক-দাদা। মা বললে কি হবে। কিন্তু আমার ব্যাপার বলে নয়। শিক্ষক শুনেই বিগড়ে যান কেন, সেইটে জিজ্ঞাসা করি। ছেলে মানুষ করা মহৎ কর্ম। পুণ্য কর্ম। দেশের কাজও বটে।

তারক বলছেন, তোমায় দেখে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ক'দিন আগে নিজে তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন। ভেবেচিন্তে শেষটা আমায় বললেন, না ভাই, মেয়ে তো শত্তুর নয়। উপোস করে শুকিয়ে মরবে, জেনেশুনে সেটা হতে দিই কেমন করে?

মহিম রাগে গরগর করছেন। বলেন, শিক্ষক না হয়ে করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর—নিদেনপক্ষে মার্চেন্ট-অফিসের বিলক্লার্ক হলেই মেয়ে বোধ হয় রাজ্যসুখ ভোগ করত! আমার কথা হচ্ছে না, আমি তো বিয়ে করবই না। লোকের এমনি ধারণা মাস্টারের সম্পর্কে। বললেন না কেন দাদা, হেডমাস্টারের কাছ থেকে মাইনের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু মাস-মাইনের ওই ক'টা টাকা আমরা অন্ধ-খঞ্জকে দান করে আসতে পারি পয়লা তারিখ। মাইনের টাকা ফাউ, আসল রোজগার সকাল-সন্ধ্যায়। একদিন শুনিয়ে দেবেন, ইস্কুলের মাস্টার ও-রকম ফুটো বড়বাবুকে বাজার-সরকার করে পুষতে পারে।

এসবে কান না দিয়ে তারক কতকটা নিজের মনে চু-চু করছেন ঃ

বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। এবারে সম্বন্ধ এলে ঘুণাক্ষরে মাস্টারির কথা বোলো না। বরঞ্চ বোলো, বেকার হয়ে ঘুরছি। তাতেও একটা আশা থাকে। কিন্তু পাত্র মাস্টারি করে শুনলে একেবারে বসে পড়ে মেয়ের বাপ।

জবাব অনেক ছিল, বলতেন মহিম অনেক কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতার জন্য। কী বিষম জরুরি কাজ, বক্তৃতা সেরে দিয়েই উনি চলে যাবেন। প্রাইজ বিলি করবেন সেক্রেটারি। ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট খুলে করালীকান্ত বিতরণের জন্য ছাড়ছেন এবার। মহিম এক গোছা নিয়েছেন। শতেক হাত বাড়ানো নানান দিকে। মাংনা-পাওয়া জিনিস কেউ ছাড়ে না। কিছু না হোক কান চুলকানো যাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকিয়ে নিয়ে।

বক্তৃতার শেষ দিকে সেই মোক্ষম জায়গাটা। দেহের সঙ্গে চরিত্র-চর্চার কথা এসে পড়েছে। খুব হাততালি প্রভাত পালিত যখন পড়ছেন। তারক অবধি ঘাড় নেড়ে তারিপ করছেন, না, ভেবেছে সত্যি লোকটা। নতুন কথা বটে! এতদূর কেউ তলিয়ে ভাবে না।

ভাবনাটা বক্তারই বটে! মহিম মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবনা নয়, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। যাঁদের মুখের কথা এ সমস্ত—শুধুমাত্র কথা বলেই খালাস নয়, দেহ-মনের অপরূপ সমন্বয়ে বিরাট চরিত্র তাঁরা এক একটি। সেই যে বলে থাকে, বজ্রের চেয়ে কঠিন ফুলের চেয়ে কোমল—একেবারে তাই। কিন্তু খুলে বলা তো চলে না। মহা চরিত্রবান পুরুষ প্রভাত পালিত ভেবে ভেবে এইসব লিখেছেন, জানুক তাই সকলে। হাততালি পড়ুক।

কাজকর্ম চুকে গেল। বক্তৃতা জমেছে ভাল, মহিমের শ্রম সার্থক। কিন্তু তার মধ্যে তারকের কথাগুলো খচখচ করে এক একবার মনে বিঁধছে। মাস্টার না হয়ে বিল-সরকার কিংবা পুরোপুরি বেকার হলেও মেয়েওয়ালার এত বিতৃষ্ণা হত না। শুধু মেয়েওয়ালা কেন—

যে-কেউ মাস্টারির কথা শোনে, মুখে ভক্তি-গদগদ ভাব : এমন আর হয় না। মনের ভিতরে করুণা : লেখাপড়া শিখে মরণদশা—আহা বেচারি গো !

বোঝেন সেটা মহিম, ষোলআনা অনুভব করেন। হিরণের মামার প্রশ্নে বরাবর তাই পাশ কাটিয়েছেন—টুইশানি করি, গল্পটল্প লিখি। পুরো মাস্টার—জেরার গুঁতোয় শেষটা স্বীকার করতে হল। ফৌজদারি উকিলকে হার মানিয়ে যান বড়বাবুটি। আর নয়, ছেড়ে দেবেন ইস্কুলের চাকরি। ঐ যে 'মাস্টারমশায়' 'মাস্টারমশায়' করে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে ডাক উঠছিল, মাস্টারমশায়, আমায় একটা কাগজ দিন, ও মাস্টারমশায়—মহিমের কানের ভিতর সিসা ঢেলে দেয় যেন ওই ডাকে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি নিরীহ-নির্বিষ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ একটা নরচিত্র মনে আসে ওই ডাকের সঙ্গে। তাঁর এই বয়সে অবিরত 'মাস্টারমশায়' ডেকে ডেকে জরার পথে ঠেলে দিচ্ছে—'মহিমবাবু' বলে ডাকবে না, যেমন অন্য চাকরেকে ডাকে লোকে। মাস্টারি ছাড়বেন, এ-ও এক কারণ তার বটে। চাকরির জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার। স্পোর্টসের দরুন কাল ইস্কুল বন্ধ। সকালের দিকে রমেনকে গিয়ে ধরবেন কোন নতুন খবর আছে কিনা করপোরেশনের।

হেডমাস্টার ডাকলেন, শুনে যাবেন মহিমবাবু। আপনি বক্তৃতা লিখেছেন, তার বড্ড নিন্দে হয়েছে।

মহিম আকাশ থেকে পড়লেন। বলেন, ছেড়ে দিন নবীন পণ্ডিত মশায়ের কথা। ওঁরা সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার স্টাইল ধরে বসে আছেন। গালভরা কথা না হলে মন ওঠে না। পড়া শেষ হয়ে গেলে বত্রিশ পাটি দাঁতের সবগুলো যদি টিঁকে রইল তবে আর কি হল !

নবীন পণ্ডিত সরে পড়েছেন, অতএব এ-জায়গায় স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে বাধা নেই কোন রকম।

হেডমাস্টার বললেন, পণ্ডিতমশায়ের কথা নয়। নিন্দে খোদ প্রেসিডেণ্টের মুখে। রাগই করে গেলেন: এ রকম শয়তানি জিনিস লেখাবেন জানলে আমি নিজে ব্যবস্থা করে নিতাম।

সভয়ে মহিম বলেন, ওর মধ্যে আপত্তিকর কোন কথা—কই, আমি তো কিছু জানি নে।

আপত্তিকর কি একটা দুটো যে মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বেড়াতে হবে? রাগে রাগে হেডমাস্টার পকেটের ভিতর থেকে ছাপা অভিভাষণ একখানা বের করলেন। মেলে ধরে মহিমকে দেখান: পাতা ভরে কড়াই-ভাজা ছড়িয়ে রেখেছেন—আর বলছেন, জানেন না কিছু। এই, এই দেখুন—'বজ্রনির্ঘোষ', এই 'উপচিকীর্ষা', এই হলগে 'প্রতিদ্বন্দ্বী', আর এটা কি হল? দেখুন, আমিই পেরে উঠছি নে—'অবিমৃষ্যকারিতা'। বাপরে বাপ, এক একখানা উচ্চারণ করতে কালঘাম ছুটে যায়। তাই তো প্রেসিডেণ্ট বললেন, শয়তানি করে এক একটা শক্ত শব্দ বসিয়ে রেখেছে। যাতে উচ্চারণ আটকে গিয়ে সভার মধ্যে অপদস্থ হই।

মহিম বলেন, কী সর্বনাশ! আমার কথা এর একটাও নয়। নবীন পণ্ডিতমশায়কে দিয়েছিলেন, বিদ্যে জাহির করেছেন তিনি।

হেডমাস্টারও ভাবছেন, তাই হবে। জোলো ভাষা পণ্ডিতমশায় নিরেট করে দিয়েছেন।

মহিম বলেন, আমার মূল লেখা বের করুন। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বিচার হবে। 'অবিমৃষ্যকারিতা' বানান করতে আমিই তো মুখ থুবড়ে পড়ব। কিচ্ছু জানি নে আমি, কোন দোষে দোষী নই। প্রেসিডেণ্টের কাছে মিছিমিছি আমায় বদনামের ভাগী হতে হল।

হেডমাস্টার সরে গেলে করালী খলখল করে হাসেন: কিছু না ভায়া, চুপ করে থাকুন, আপনার কিছু হয় নি। মরতে মরণ হেড-মাস্টারের। আপনার নাম করবেন—উনি সেই পাত্র কিনা! নিজে

লিখেছেন বলে যশ নিতে গিয়েছিলেন। ইস্কুলে যে যা ভাল করবে—নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলবেন, আমি করেছি। হয়েছে তেমনি এবার। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি ছিলাম সেই সময়টা—হাসি আর চেপে রাখতে পারি নে।

॥ চোদ্দ

পরদিন সকালবেলা মহিম রমেনের বাসায় গেলেন। করপোরেশনের খবরাখবর নেবেন। লাইসেন্স-অফিসার শ্বশুর কি বলেন—খালি-টালি হল এদ্দিনে?

রমেন অবাক হয়ে বলে, অমন সোনার চাকরি পেয়ে গেছ, আবার চাকরির খোঁজখবর কেন? তাই দেখছি, মানুষের লোভের কোন মুড়োদাঁড়া নেই।

চাকরি তো ইস্কুলের মাস্টারি। সোনার চাকরি বলছ একে?

রমেন বলে, কোন ইস্কুল, বল সেটা একবার। কত নামডাক!

ওই শুনতেই কেবল। তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। মাইনে কত দেয় জান?

রমেন বলে, মাইনে কি শোনাবে আমায়? এখনকার চাকরির আগে কিছুদিন ইস্কুলে কাজ করে এসেছি। সবাই করে থাকে। সে আবার তেমনি ইস্কুল! তোমার মতন কপাল-জোর ক-জনার—তিরিশ টাকা খাতায় লিখে পনের টাকা নিতে হয় না, পুরো মাইনে একদিনে একসঙ্গে হাতে গণে দিচ্ছে। তার উপরে টুইশানির টাকা মাস ভোর চলেছে। আমাদের কি—পয়লা তারিখে পকেট ভরে টাকা নিয়ে এলাম চিনির বলদের মতন। মুদি-গয়লা বসে আছে বাড়িতে, সন্ধ্যের পর ঠিকে-ঝি আর কয়লাওয়ালা এল, রাত না পোহাতে বাড়িওয়ালা। সমস্ত ভাগযোগ করে নিয়ে নিল—সারা

মাস তার পরে খালি পকেটে ডন কষে বেড়াও। দুই পয়সার ট্রামে চড়ে অফিস যাব, সে উপায় থাকে না, পায়ে হেঁটে মারতে হয়। ঝাড়ু মারি চাকরির মুখে—তোমার সঙ্গে বদলাবদলি করে নিতে রাজি আছি ভাই।

এ মানুষ কিছু করবে না, বোঝাই যাচ্ছে। খালি বকবকানি। উঠানে কলের ধারে বসে গেঞ্জি আর রুমালে সাবান দিতে দিতে কথা বলছে। উঠে দাঁড়িয়ে চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে জল ঢালে এবার মাথায়। এর পর খেতে বসবে। জল ঢালা বন্ধ রেখে রমেন বলে, একটা উপকার কর মহিম, সন্ধ্যের একটা টুইশানি জুটিয়ে দাও আমায়। ইস্কুল-মাস্টার না হই, গ্রাজুয়েট তো বটে। টুইশানি বরাবর করেও এসেছি। এখনই পাই নে তোমাদের মাস্টারদের ঠেলায়। রাঘববোয়াল যত—একজনে আট-দশটা করে ধরবে, তোমাদের মুখ ফসকে এলে তবে তো বাইরের লোকের! ঘাঁটি আগলে আছ তোমরা। তা ভাই দয়াধর্ম করে দিও একটা আমার দিকে ছুঁড়ে। চালাতে পারছি নে।

মেসে ফিরছেন মহিম। কালাচাঁদ ইতিউতি চেয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে পথ চলেছেন।

কী মশায়, কোত্থেকে?

হেসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন না।

তা কেন বলা যাবে না! জিজ্ঞাসা করার বরঞ্চ মানে হয় না। মাস্টার মানুষ বেলা সাড়ে-ন'টায় চলছেন—নিশ্চয় টুইশানি।

যাচ্ছি টুইশানিতে, না ফেরত আসছি?

মহিম একটুখানি ইতস্তত করছেন তো কালাচাঁদ উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন: ভেবে বলতে হবে? না মশায়, বছর ঘুরে গেল, কিছুই এখনো শিখতে পারলেন না। হাঁটা দেখেই তো বুঝবেন, ফেরত চলেছি এখন। টুইশানিতে যাবার হলে কি কথা বলতাম দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে? সাঁ করে বেরিয়ে যেতাম। খুব পেয়ারের লোক হলে একটা আঙুল তুলতাম মানুষটার দিকে, তার অর্থ যা হয় বুঝুক গে।

মহিম বলেন, আমায় একটা টুইশানি দেবেন বলেছিলেন।

সন্ধানে আছি। ভাল না পেলে দেব না। আপনি তো আর উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে বসে নেই। করবেন একটা-দুটো, বেশ ভাল পেলে তবেই করবেন।

পড়াব আর বাড়িতে থাকব, এমনি যদি পান তো ভাল হয়।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করেন, কেন, মেসে কি অসুবিধা হচ্ছে?

ল-কলেজে ভর্তি হব সামনের সেসনে। মেসে হৈ-হুল্লোড়—পড়াশুনো হয় না। সেই জন্যে নিরিবিলি কোন বাড়ি থাকতে চাই।

কালাচাঁদ অবাক হয়ে বলেন, আইন পড়ে উকিল হবার বাসনা? উকিল হয়ে গাদা-গাদা লোক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। মক্কেল শিকারের জন্য গাছতলায় সমস্ত দুপুর তাক করে আছে, দেখে আসুনগে একদিন আলিপুর গিয়ে।

মহিম তিক্তকণ্ঠে বলেন, তবু উকিল বলে তাদের। মাস্টারমশায় নয়। মাস্টারি আর করতে চাই নে।

কথা বলতে বলতে চার রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছেন। কালাচাঁদ বলেন, বাড়ি থাকলে যা খাটিয়ে নেয়। তখন আর টাইম-বাঁধা রইল না তো! আমি ছিলাম এক জায়গায়। বাপ এসে বলবে, মাস্টার-মশায় ধোবার হিসাবটা ঠিক দিয়ে দিন। ঝি এসে দেশের বাড়ি চিঠি লেখাতে বসবে।

জগদীশ্বরবাবু পিছন দিক দিয়ে নিঃসাড়ে এসে কালাচাঁদের কাঁধে হাত রাখলেন। বাঁ-হাতে তেলে-ভাজা বেগুনি। বললেন, বেড়ে বানায়। খাবেন? কিন্তু ইচ্ছে হলেও খাই বসে কোন জায়গায়? শতেক চক্ষু শত দিকে। আর ঠিক এই সময়টা গুরুভক্তি উথলে ওঠে: নমস্কার সার! তেলে-ভাজা দেখুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর কোন জুত থাকে না।

কালাচাঁদ বলেন, হয়ে গেল এবেলার মতন?

জগদীশ্বর বলেন, হল আর কোথায়! আমার সেই যে আহ্লাদি ঠাকরুনটি আছে—সন্ধ্যেয় সিনেমায় যাবে, নয়তো মাসি-পিসি আসবে। আজকে ভাবলাম, ছুটি আছে তো সকালবেলা ঘুরে আসিগে। মেয়ের মা চটে আগুন: সাত সকালে কেন আসেন? ঘড়িতে তখন ন'টা। বলেন, পলির ওঠার দেরি আছে। ভোরে উঠলে সর্দি ধরবে। বাড়ির বাজার-সরকার আমায় ডেকে বলে, আপনার অত কি মশায়—মাইনে তো আগাম পেয়ে যাচ্ছেন। মাস্টার রাখা বড়-লোকের ফ্যাশান, তাই রেখেছে। পড়ানোর জুলুম করলে চাকরি কিন্তু না-ও থাকতে পারে। সরকার মানুষটি বড় ভাল। খানিকটা বসে গল্পগুজব করে ফিরে যাচ্ছি।

হঠাৎ এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, খবর শুনেছেন তো? ছুটি আমাদের বোধ হয় বেড়ে গেল।

কেন, কেন?

ছুটির মতন আনন্দ মাস্টার-ছাত্রের অন্য কিছুতে নয়। দু-জনেই প্রশ্ন করছেন, কি হয়েছে, বলুন না খুলে।

প্রেসিডেন্ট নাকি এখন-তখন। হয়তো বা টেঁসেই গেল এতক্ষণ। মাস্টার মলে পুরো দিন ছুটি দেয়। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এঁদের বেলা নির্ঘাৎ দুটো দিন। কি বলেন?

জগদীশ্বরের পুলকে মহিম যোগ দিতে পারেন না। উপকারী মানুষ প্রভাত পালিত। ইস্কুলের চাকরি তাঁরই দৌলতে। বলেন, কাল পার্কে এসে সভা করলেন, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল?

কেলেঙ্কারি কাণ্ডবাণ্ড মশায়। রেবেকা বলে এক ইহুদি মাগি আছে, সেখানকার ব্যাপার। আসল ঘটনা পালিতের বাড়ি থেকে চাউর হতে দিচ্ছে না। তারা এটা-ওটা বলছে। আমার ছাত্রীর বাড়ি আর প্রেসিডেন্টের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি তো—ওঁরা সব জানেন। সরকার সমস্ত বলল আমায়।

শনিবারে কোর্ট করে প্রভাত পালিত কোথায় নিরুদ্দেশ হতেন, সে রহস্য মহিম এত দিন পরে জানলেন। যেতেন কড়েয়া রোডে রেবেকার বাড়ি। সেখান থেকে কখনো বা হাওড়ার পুল পার হয়ে চন্দননগরে—গঙ্গার ধারে কোন এক বাগানবাড়িতে। বাড়ির ছেলেপুলে লোকজন সবাই জানে; গেঁয়ো মানুষ বলে এত বার যাতায়াত সত্ত্বেও মহিম কিছু জানতেন না। প্রভাতের স্ত্রী অনেক দিন গত হয়েছেন। দিনরাত্রির এই খাটনি, এত রোজগার, এমন নামডাক। সপ্তাহান্তে একটু বিশ্রাম নেবেন, কেউ কিছু মনে করে না এতে। এই বারে কেবল অনিয়ম ঘটল। এক বড় মামলার ব্যাপারে বাইরে থেকে ব্যারিস্টার এসেছেন, শনিবার রাত্রে তাঁর সঙ্গে কনসালটেশন ছিল। রবিবার সকালে ইস্কুলের স্পোর্টসের হাঙ্গামা। বক্তৃতা সেরেই জরুরি কাজের নাম করে ওই যে ছুটলেন, বোঝা যাচ্ছে, মন ছটফট করছিল তখন রেবেকার জন্য।

ইহুদি মেয়ে রেবেকা। বড়মানুষদের সমাগম সেখানে। দেশের বড় বড় সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হয় তার ড্রইংরুমে বসে। রেবেকার ভিতর-ঘরের বন্দোবস্ত আলাদা। সেই বন্দোবস্ত ক্রমে শনিবারের রাত্রিটা এবং পুরো রবিবার প্রভাত পালিতের। প্রভাত উপস্থিত না থাকলেও তাঁর দিন ফাঁকা থাকবে। সেটা হয় নি। অন্যায় রাখাল দাশের। মামলা এবং তদুপরি সভাসমিতির খবর জেনে নিয়ে রাখাল ঢুকে পড়েছিল। হ্যাঁ, রায়সাহেব রাখাল দাশ, পুলিশের বড়-কর্তাদের একজন। এমনি দু-জনে বড় বন্ধু। মোটা দু-জনে, ভুঁড়ি উভয়ের। কিন্তু ও-জায়গায় খাতির নেই।

বলতে বলতে সরকার লোকটা হি-হি করে হাসে। জগদীশ্বর দুঃখিত হয়ে বলেন, মানুষ মারা যায়, আপনার এরকম হাসি আসে কেমন করে?

সরকার বলে, হাসি কি দেখছেন মাস্টারমশায়, কেউ কিছু না বলে তো মালা কিনে প্রভাত পালিতের গলায় পরিয়ে দিয়ে আসি।

লড়নেওয়ালা বটে। যা ঘুসোঘুসি হল দুই বন্ধুর মধ্যে! রাখাল, শুনলাম, প্রভাতের সাড়া পেয়ে রেবেকার খাটের নিচে ঢুকে যাচ্ছিল। ভুঁড়িতে বাদ সাধল। ভুঁড়ি থেকে পা অবধি খাটের বাইরে মেজের উপর। জুত পেয়ে প্রভাত বেধড়ক পেটাচ্ছেন। রেবেকা মাঝে পড়ে টেনে হিঁচড়ে রাখালকে বের করে দিল। তখন রাখালও আবার শোধ তুলছে। প্রভাত রাখালের হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে দিয়েছেন। যে হাত দিয়ে বেত মেরে মেরে সে স্বদেশি ভলন্টিয়ারদের পিঠের চামড়া তুলে নিত। আর প্রভাতের, ওই তো শুনলেন, এখন-তখন অবস্থা। মরেন তো শহীদ বলে পূজো করব প্রভাতকে। বাড়ির লোকে ঢাকতে গেলে কি হবে—খবর বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ষাটের উপর বয়স—এতদূর বলবীর্য দেখে ভরসা হয়, আমাদের স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শোনা কথায় অনেক রঙ চড়ানো থাকে। বিকালবেলা মহিম নিজে প্রভাত পালিতের বাড়ি গেলেন। অন্য সময় মানুষজনে গমগম করে। আজকে একটি প্রাণীকেও দেখা যায় না। যেন ছাড়া বাড়ি, গা ছমছম করে। অবশেষে পাঁচুলালকে দেখতে পেলেন। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন, কি হে, কি দেখতে এসেছ? ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে পোড়ানো শেষ। যাও।

পরদিন কাগজে বেরল, প্রবীণ ও সুবিখ্যাত উকিল প্রভাতকুমার পালিত সোমবার বেলা একটার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। দাতা ও পরোপকারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইস্কুলের সামনে সকাল থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের আনাগোনা। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর জন্য ছুটির সার্কুলার লটকে দিয়েছে কিনা।

উদ্যোগী কেউ কেউ ভিতরে ঢুকে বুড়ো দরোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। না, সেক্রেটারি বা হেডমাস্টার কেউ কোন খবর পাঠান নি, চুপচাপ আছেন, ইস্কুল বন্ধ হবে কিনা বলবার উপায় নেই। কী আশ্চর্য, খবর জানেন না ওঁরা—সারা অঞ্চল জুড়ে কাল থেকে এত রসালো কল্পনা-জল্পনা, ওঁরা দু-জন কানে ছিপি এঁটে বসে আছেন নাকি? মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজেও দিয়েছে। পরশু-দিন তাঁকে সভাপতি করে বসিয়ে কত মাতামাতি, মরার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্ক শেষ? হয় হোকগে, কিন্তু মানুষটার খাতিরে দুটো-একটা দিন ইস্কুলের ছুটি দেবে তো অন্তত।

সার্কুলার যখন নেই, খেয়েদেয়ে ইস্কুলে আসতে হল সাড়ে-দশটায়। এই শোকগ্রস্ত অবস্থায় ভোগান্তি হয়তো বা সেই চারটে অবধি। লাইব্রেরি-ঘরের সামনে ডি-ডি-ডি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

অতবড় মানুষটা গেলেন—শুধু এক সার্কুলার ছুঁড়ে ছুটি দেওয়া যায় না। সবাই এসে পড়েছেন—আজকের দিনটা হিসাবে ধরা হবে না। দু-দিন ছুটি—কাল আর পরশু। আপনারা যে যার ক্লাসে চলে যান তাড়াতাড়ি। ঘণ্টা পড়বে, ছুটির সময় যেমন পড়ে থাকে—একবার দু-বার তিনবার। একটা করে ক্লাস ছাড়বেন—ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ছেলেরা বেরবে। শোকের ব্যাপার, টুঁ-শব্দটি না হয়। আর ততক্ষণ প্রেসিডেন্টের গুণপনা বুঝিয়ে বলুনগে ক্লাসের ছেলেদের কাছে।

ভূদেববাবু বললেন, শনিবারেও ছুটি আছে সার। খৃস্টান-পরব। বুধ-বিষ্যুৎ না করে এই ছুটি যদি বিষ্যুৎ আর শুক্কুরবারে করে দিতেন, একসঙ্গে চারদিন পড়ত। অনেকে বাড়ি যেতে পারতেন।

ডি-ডি-ডি বলেন, সেক্রেটারিকে না বলে আমি পারি নে। তিনিও করবেন না। শোকের ব্যাপার মুলতুবি রাখা যায় কেমন করে?

ক্লাসে যেতে যেতে জগদীশ্বর মহিমকে বলেন, আপনি তো গল্পটল্প লেখেন। বানিয়ে দিন না একটা গল্প।

কিসের গল্প ?

প্রেসিডেন্টের গুণপনা ছেলেদের বোঝাতে হবে। হেডমাস্টার বলে দিলেন। কি বোঝাব, বলুন দিকি ? রাখাল দাশকে ঠেঙানি দিয়ে আত্মদান করেছেন ? ষাট বছর বয়সের মধ্যে এই একটা বোধহয় ভাল কাজ করেছেন উনি। কিন্তু ছেলেদের কাছে রেবেকার বাড়ির কথা বলা ঠিক হবে কি ? তাই বলছিলাম, কল্পনায় আপনি কিছু বানিয়ে দিন।

এক-একটা ক্লাস করে ছেলেরা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ইস্কুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার ডি-ডি-ডি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। বাইরে গিয়ে চেঁচামেচি করছে : কী মজা, কী মজা ! স্পোর্টসের ছুটি কাল গেছে। আবার এই প্রেসিডেন্টের ছুটি। নিত্যি নিত্যি একটা করে হয় যদি এমনি !

সলিলবাবু সই করে ছাতা তুলে নিয়েছেন, ডি-ডি-ডি বলেন, উঁহু, আপনারা চলে যাবেন না। অতবড় মানুষ—রীতকর্ম আছে তো একটা ! চলুন সকলে ফার্স্ট-বি ঘরে। দুখিরাম, মাস্টারমশায়দের ডেকে নিয়ে এস। যে যেখানে আছেন, ফার্স্ট-বি ঘরে চলে আসুন। রেজল্যুশন লেখা আছে, দু-মিনিটে হয়ে যাবে।

করিৎকর্মা লোক ডি-ডি-ডি। বক্তৃতা-টক্তৃতা নয়, তিনি মাত্র দুটো কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট কত বড় লোক, সবাই আমরা জানি। পরশুদিন সভাপতি হয়ে বক্তৃতা করলেন, কত নীতি-উপদেশ দিলেন। শোক-প্রস্তাব পাশ করে দিয়ে চলে যান আপনারা। শুক্কুরবারে আসবেন। মিস্টার পালিতের ছেলেদের কাছে প্রস্তাবটা আমি পাঠিয়ে দেব।

সভাভঙ্গ হল। অনেকেই টুইশানিতে ছুটলেন। ছেলেরা ছুটি

পেয়ে বাড়ি যাচ্ছে, তাদের পিছন ধরে গিয়ে চুকিয়ে আসা যাক রাত্রের কাজটা। আয়েশি দশ-বারো জন রইলেন, তুপুরের রোদে যাঁরা বেরতে চান না। করালীকান্তকে ধরেছেন : প্রাইজ তো সুভালাভালি মিটে গেল। আপনি কর্মকর্তা—খাওয়ালেন কই? আজকে এমন সুবিধা আছে। ভিড়ও নেই। খাওয়ান।

করালী বলেন, খাওয়াচ্ছি। তার জন্যে কি! দত্তবাড়ির ছেলে—আমার বাপ-পিতামহ খাইয়েই ফতুর। ফতুর হয়ে গিয়ে এখন মাস্টার হয়েছি। এই তুখিরাম, চা এনে দাও মাস্টারমশায়দের। আট আনার চা আর আট আনার বিস্কুট।

সত্যি, অবস্থা পড়ে গেছে—কিন্তু বংশের ধারা যাবে কোথায়? করালীবাবুর মেজাজ আছে। এক কথায় এই ষোল আনা বের করে দিলেন, দৃকপাত করলেন না। কে দেয় এমন!

চা-বিস্কুট এল। মাস্টার কেরানি ও দরোয়ান-বেয়ারায় উপস্থিত আছেন জন কুড়ি। বিস্কুট একখানা করে হাতে হাতে নিলেন সকলে। আস্ত আর আধ-ভাঙা মিলে কাপ বেরল চারটা। আর গেলাস ছ'টা। অনেক হয়ে গেল। পুরো এক কাপ নিলে সকলের ভাগে হবে না। আধ কাপ আন্দাজ ঢেলে ঢেলে নিচ্ছেন। খাওয়া হয়ে গেলে কাপ ও গেলাস জলে ধুয়ে অন্যের হাতে দিলেন। দিব্যি জমানো গেল যা-হোক এই ছুটির তুপুরটা।

॥ পনের ॥

কালাচাঁদ মহিমকে টুইশানি দিয়েছেন। খাওয়া-থাকা ছাত্রের বাড়ি। বনেদি গৃহস্থ, এখন ফোঁপরা হয়ে গেছেন। বাড়ির কর্তা সাতকড়িকে চাকরি করে খেতে হয়। রেলের চাকরি—এমন-কিছু বড় চাকরি মনে হয় না। পৈতৃক অট্টালিকা। মোটা মোটা থাম, নিচের তলায় পুরু দেয়ালের বড় বড় আধ-অন্ধকার ঘর। দিনমানেও আলো জ্বালিয়ে রাখলে ভাল হয়। মহিমকে তারই একটা ঘর দিল। বাড়ির লোকে দোতলায় থাকে। নিচে রান্নাঘর আর খাবারঘর। পড়ুন না কত পড়তে চান নিরিবিলি একা একা।

ইস্কুলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে ল-কলেজে বেরিয়ে পড়েন মহিম। পৌনে-পাঁচটায় ক্লাস। কলেজ থেকে বাড়ি আসেন না, পুরানো টুইশানিটা সেরে একেবারে ফেরেন। সকালবেলা তো এই বাড়িতে। কথা হয়েছিল, বড় ছেলে পাটুকে এক ঘণ্টা পড়াবেন, তার পরে নিজে পড়াশুনো করবেন। কয়েকটা দিন তাই চলল।

একদিন পাটু ছোট ভাই বটুকে সঙ্গে করে নিচে নামল। বলে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

কেন ?

ওর মাস্টার ক'দিন আসছেন না। অসুখ করেছে। আমাদের ইস্কুলেই সেভেন্থ ক্লাসে পড়ে। কাল ক্লাসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মা বললেন, আপনার কাছ থেকে পড়াটা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে চলে যাবে। এই বটু, তাড়াতাড়ি কর। আমার আবার আছে আজ অনেক।

বুঝে নিল বটু একটি একটি করে সমস্ত পড়া। তার পরেও চলে যায় না। তক্তাপোশে মহিমের বিছানার উপর বসে পড়ল। পড়া তৈরি করে নিচ্ছে ওখানে থেকে। ক্ষণে ক্ষণে উঠে এসে জিজ্ঞাসা

করে নেয়। কী বলবেন মহিম—এমন আগ্রহশীল ছাত্রের কাছে কেমন করে মুখ ফেরান? সত্যি তো ব্যবসা নয় এটা! আগেকার দিনে শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন, আর আহার-আশ্রয় দিতেন ছাত্রদের। এখন পেটের দায়ে পয়সাকড়ি নিতে হয়, আশ্রয়ও নিতে হয় ছাত্রের বাড়িতে। তা বলে চশমখোর হওয়া যায় না। পড়ে যাক—কী আর হবে!—বটুর মাস্টার যতদিন সুস্থ হয়ে না আসছেন।

আরও বিপদ। বটুর পিঠোপিঠি বোন মায়া—সে-ও দেখি বটুর পিছনে গুটি গুটি পা ফেলে আসছে। কি সমাচার? ওই মাস্টার তারও—বটু আর মায়া দু-জনকে এক মাস্টার পড়ান। তিনি আসছেন না; ইস্কুলের দিদিমণি খুব বকাবকি করেছেন কাল। মায়াকেও পড়া বলে দিতে হবে।

মাসখানেক হতে চলল, ওদের মাস্টার আসেন না। কী অসুখ রে বাপু! মাস্টারের বাড়ি খোঁজখবর নিয়ে দেখ—চুপিসাড়ে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেল কিনা।

সমস্ত সকালটা এমনি ভাবে কেটে যায়। ল-কলেজের লেকচার কানে শুনে এলেন—তারপরে বই খুলে একটু যে ঝালিয়ে নেবেন, সে ফুরসৎ মেলে না। মুট-কোর্ট হয় মাঝে মাঝে—বলা যেতে পারে, কলেজের ভিতরে আদালত-আদালত খেলা। সেই আদালতের হাকিম হলেন প্রফেসর। আর ছাত্রদের মধ্য থেকে কতক বাদী পক্ষের ব্যারিস্টার, কতক বিবাদী পক্ষের। মহিমের উপর ভার হল, আসামির হয়ে লড়তে হবে। ইস্কুল থেকে হন্তদন্ত হয়ে ল-কলেজে এসে সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকে ল-রিপোর্ট এনেছেন, যার মধ্যে এই মামলাটা রয়েছে। কিন্তু একটিবার চোখ বুলিয়ে নেবার সময় হল না। ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। অতিকায় বইটা হাতে নিয়ে মহিম ঢুকলেন। প্রফেসর তাকিয়ে দেখে বললেন, বোসো ওইখানে। রোল-কল হয়ে গেছে, তা হলেও পার্সেণ্টেজ দেব মুট-কোর্টের কাজ কেমন হয় দেখে।

মূল ক্লাস হয়ে যাবার পর মুট-কোর্ট বসল। ফরিয়াদি পক্ষ তাঁদের কথা বললেন, এবারে মহিমের বক্তৃতা। প্রফেসর চোখ বুঁজে শুনছেন, আর মাঝে মাঝে তারিপ করছেন—বাঃ, চমৎকার! বক্তৃতা অন্তে মহিম বসে পড়লে তিনি চোখ খুলে বললেন, আসামি পক্ষের সুশিক্ষিত কৌন্সিল আইনের জটিল তথ্য সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আসামি ছাড়া পাবে, কোন সন্দেহ নেই। তবে কিনা—

একটুখানি হেসে মহিমের দিকে তাকালেন : এই মামলা অনেক বছর আগে যখন হাইকোর্টে উঠেছিল, বারওয়েল সাহেব অবিকল এমনি ভাবে আসামিকে সমর্থন করেছিলেন। মহৎ ব্যক্তিরা একই রকম চিন্তা করেন। এমন কি, বক্তৃতার ভাষাও হুবহু এক—কমা-সেমিকোলনের পার্থক্য নেই।

ক্লাসসুদ্ধ হেসে উঠল। প্রফেসরটি চতুর। ডেস্কের উপর ল-রিপোর্ট বইটা খুলে রেখে মহিম বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন, চোখ বুঁজে থেকেও তিনি সমস্ত জানেন। কিন্তু উপায় কি? দিনরাত্রির নিরেট ঘণ্টাগুলোর মধ্যে এক মিনিটের ফাঁক পাওয়া যায় না। দেখা যাক, পূজোর ছুটি তো সামনে। সেই সময়টা কিছু পড়াশুনো করে নেবেন।

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন, পড়াশুনো কেমন চলছে মহিমবাবু?

আরে মশায়, পড়িয়েই কূল পাচ্ছি নে, নিজে পড়ি কখন? রক্ত-বীজের ঝাড়। দিন-কে-দিন বেড়েই যাচ্ছে। ভাই-বোনে মোটমাট কতগুলো, ঠিকঠাক একদিন জেনে নিতে হবে।

কালাচাঁদ বলেন, বলেছিলাম না গোড়ায়! আপনারা সকলে মতিবাবুর কথা তোলেন। আরে মশায়, টুইশানি পাওয়াও ভাগ্য। মতিবাবুর মতন রাজসিক টুইশানি ক'জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে!

ওই মায়ার সঙ্গেও বিপদের শেষ নয়। ক'দিন পরে আবার একটি মায়ার পিছন ধরে আসে। নস্তু।

মায়া বলে, বড্ড জ্বালাতন করে নন্তুটা, কাজকর্ম করতে দেয় না। মা তাই বলে দিলেন, বসে থাকবে এখানে চুপচাপ। বই এনেছিস কইরে নন্তু ?

হেসে বলে, অ-আ পড়ে। এক-আধবার দেখিয়ে দেবেন, তাতেই হবে। মা বলে দিলেন।

রীতিমতো এক পাঠশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিমের ধৈর্য থাকে না। বলেন, আর ক'টি আছে বল দিকি ?

মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে মায়া বলল, ভাই-বোন ক'টি আমরা, জিজ্ঞাসা করছেন মাস্টারমশায় ?

তাই বল।

এই তো, চারজনে পড়তে আসি। এর পরে অন্তু আর ছায়া আছে। আর নেই।

সে দুটি আসবে কবে থেকে ?

মায়া খিলখিল করে হেসে উঠল : তারা কেমন করে আসবে মাস্টারমশায় ? ছায়া আট মাসের—কথাই ফোটে নি। আর অন্তু এই সবে হাঁটতে শিখেছে।

মহিম তিক্ত কণ্ঠে বলেন, ব্যস ব্যস ! হাঁটতে শিখেছে যখন হেঁটে হেঁটে চলে এলেই তো পারে।

বাড়ির লাগোয়া এঁদেরই এক শরিকের বাড়ি। মহিমের ঘরের পূবদিকে গলি—সেই গলির পথে তাঁদের যাতায়াত। একদিন যথারীতি সমারোহের সঙ্গে পড়ানো চলেছে। গঙ্গাস্নানের ফেরত বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা ভিজা কাপড় সপসপ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। ছেলেমেয়েরা জ্যাঠাইমা জ্যাঠাইমা করে উঠল।

মহিলা মধুর হেসে বললেন, আমি জ্যাঠাইমা এদের। আমার দেওরের বাড়ি এটা। গঙ্গায় যাই আমি—জানলা দিয়ে তোমায় দেখতে পাই বাবা। বড্ড যত্ন করে পড়াও তুমি, আমার খুব ভাল

লাগে। রোজ ভাবি, গিয়ে কথাবার্তা বলে আসি। আবার ভাবি, কী মনে করবে হয়তো। আমাদের সংসারে সব পুরানো রেওয়াজ—আজকালকার মতন নয়। মেয়েরা বাইরের কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। শেষটা আমি সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমার ছেলে মধুসূদনের বয়স হবে তোমার। ছেলের সঙ্গে মা কেন কথা বলবে না? তাই এসেছি বাবা।

মহিম বলেন, সে তো সত্যি কথা। এবং উঠে গিয়ে পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে প্রণাম করলেন। ধবধবে গায়ের রং, যেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুন। বনেদি বাড়ির ছাপ সর্বাঙ্গে।

এইবারে আসল কথা পাড়লেন তিনি: আমার মেয়ে মঞ্জুরাণীকে তুমি পড়াও। বড্ড ভাল পড়ানো তোমার। একটা মাস্টার পড়াত—যেমন বজ্জাত, তেমনি ফাঁকিবাজ। সেটাকে দূর করে দিয়েছি। মেয়ে ম্যাট্রিক দেবে এইবার।

ম্যাট্রিক দিচ্ছে সেই মেয়ে পড়বে তাঁর মতন ছোকরা-বয়সি একজনের কাছে! অস্বস্তি লাগে মহিমের। বললেন, সময় তো নেই। এই দেখুন, সকালবেলাটা যায় এদের নিয়ে। সন্ধ্যায় ল-কলেজে যাই।

জ্যাঠাইমা বলেন, আমার ছেলেও ল-কলেজে গিয়েছিল কিছুদিন। সে তো বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। কলেজের পরে কি কর তুমি?

বলবার ইচ্ছা ছিল না যে বাইরে আরও টুইশানি করে বেড়ান। কিন্তু কথার বঁড়শি দিয়ে যেন টেনে বের করলেন জ্যাঠাইমা। বললেন, সেইটে ছেড়ে দিয়ে আমার মঞ্জুরাণীকে পড়াও। ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে না, একটা জায়গায় হয়ে গেল। গলির মধ্যে এই বাড়ির লাগোয়া।

মহিম বললেন, অনেক দিনের পুরানো ঘর কিনা, তাই ভাবছি পূজো তো এসে গেল। নিজের পড়াশুনোর জন্য থাকতে হবে

কলকাতায়। ছুটির মধ্যে দুপুরবেলার দিকে সাহায্য করতে পারি। ছাড়া না ছাড়া ছুটির পর ভাবা যাবে।

জ্যাঠাইমা বললেন, এরা সব বাইরে যাবে পূজোয়। সাতকড়ি রেলের পাশ পায় কিনা, পূজোর সময়টা কলকাতা থাকে না। কোথাও না কোথাও যাবেই।

পাটু বলে উঠল, চুনারে যাচ্ছি এবার আমরা। শেরশা'র ফোর্ট আছে গঙ্গার উপর। আপনি চলুন না মাস্টারমশায়। বড় সুন্দর জায়গা, বাবা বলছিলেন।

লোভ হয় বটে! নিজে খরচা করে দেশ-বিদেশ যাওয়া কোনদিন হয়তো হবে না। দোমনা হলেন মহিম: অনেক পড়াশুনো রয়েছে। সময় পাই নে, ছুটিতে পড়ব বলে ভেবে রেখেছি। বাইরে গিয়ে তো হৈ-হুল্লোড়—পড়াশুনো ঘটে উঠবে কি? তা দেখ তোমাদের মা-বাবাকে বলে। তাঁরা কি বলেন—

ছাত্র-ছাত্রী পুরো এক গণ্ডা, কেউ-না-কেউ বলে থাকবে মায়ের কাছে। ক'দিন পরের কথা। সাতকড়ি ভাত খেতে বসেছেন। মহিম কলঘর থেকে শুনতে পাচ্ছেন কর্তা-গিন্নির কথাবার্তা। গিন্নি বললেন, নিয়ে গেলে হত মাস্টারকে। ছেলে-মেয়ে এই চার হপ্তা বইপত্তর ছোঁবেও না দেখো। ইস্কুল খোলার পরেই এগজামিন।

সাতকড়ি বলেন, ক্ষেপেছ! বিদেশ জায়গা—একটা মানুষ টেনে নিয়ে যাওয়ার খরচ কত! ঝিটা শুধু যাবে। একজন ঠিকে-ঠাকুর আর এক ঠিকে-মাস্টার দেখে নেব ওই ক'দিনের জন্যে।

কলের জল অঝোর ধারে মাথায় ঢেলেও মহিমের মনের উত্তেজনা কাটে না। পায়ে ধরে সাধলেও যাবেন না ওদের সঙ্গে। ছি-ছি, রসুই ঠাকুর আর তাঁর একসঙ্গে নাম করল! মানুষের এমনি মনোভাব মাস্টারের সম্বন্ধে। টাকা দেয় না মাস্টারকে—কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ, কণিকা প্রমাণ সম্মানও দেয় না। ওকালতি পাশের যেদিন খবব বেরবে, মাস্টারিতে ইস্তফা সঙ্গে সঙ্গে।

মহালয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সাতকড়িরা রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ি ফাঁকা। ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে গেছেন, শুধু পুরানো চাকরটা আছে। কোন গতিকে সে নিজের মতন দুটো চাল ফুটিয়ে নেয়। মহিম মেসে গিয়ে খেয়ে আসেন দুবেলা। আইনের বই-টই খুলে নিয়েছেন।

জ্যাঠাইমা পরের দিনই এসে পড়লেন: কই বাবা? কথা দিয়েছিলে যে!

মহিম বলেন, এবাড়ির এরা নেই যখন, সকালবেলাই একবার গিয়ে পড়িয়ে আসব। কাল থেকে যাব।

কাল কেন বাবা? এখনই চল না আমার সঙ্গে। পড়া-টড়া নয় আজকে, আলাপ-পরিচয় করে আসবে। অফিসের ছুটি, আমার ছেলে মধুও বাড়ি আছে।

গেলেন মহিম। জ্যাঠাইমা তাঁকে একেবারে দোতলায় নিয়ে তুললেন। সাতকড়ির বাড়ি এত দিনের মধ্যে কেউ তাঁকে দোতলায় ডাকে নি। ছবি সোফা ফুলদানিতে সাজানো চমৎকার ঘর। ছুটির দিন হলেও মধুসূদন বাড়ি থাকে না, ছিপ-বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। জ্যাঠাইমা হেসে বলেন, কী নেশা রে বাপু! সমস্তটা দিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধ্যেবেলা খালি হাতে ফিরে আসা।

মধুসূদন বলে, মিছে কথা বোলো না মা মাস্টারমশায়ের কাছে। মাছ আনি নি কোনদিন?

আনবে না কেন, বাজার থেকে কিনে এনেছিলে। আমরা টের পাই নে বুঝি!

হাত গণে তুমি সব টের পাও মা—

হাত গণতে হবে কেন? বরফ-দেওয়া চালানি মাছ পুকুর থেকে তোমার ছিপে উঠে আসে—কানকো উঁচু করলেই তো টের পাওয়া যায়।

বেশি কথা বলার সময় নেই এখন মধুসূদনের। হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে গেল। বেশ্ সংসার! মায়ে ছেলেয় হাসাহাসি হল কেমন সমবয়সির মতো। কিন্তু মাস্টারমশায় বলল মহিমের সম্বন্ধে, এইটে বড় বিশ্রী। চেহারায় সত্যি কি মাস্টারের ছাপ পড়ে গেছে এই বয়সে? তাঁর যেন আলাদা কোন নাম নেই—মাস্টার, মাস্টার, মাস্টার (খাঁটি কলকাত্তাই কেউ কেউ আবার উচ্চারণ করেন, ম্যাস্টার)। শুনলে গা বমি-বমি করে।

ওদিকে মেয়েকে ডাকছেন জ্যাঠাইমা: মঞ্জু আসছিস নে কেন? কী লজ্জা হল! যার কাছে পড়বি, তাকে লজ্জা করলে হবে না তো! চলে আয়।

সর্বরক্ষে, মাস্টারমশায় বলে জ্যাঠাইমা উল্লেখ করেন নি এবার। মঞ্জুরাণী এল। রাণীই বটে! জ্যাঠাইমার গর্ভের মেয়ে—সে আর বলে দিতে হয় না। ম্যাট্রিক দেবে, বছর ষোল বয়স হওয়া উচিত—কিন্তু বাড়ন্ত গড়নের বলে কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়। ঘর যেন আলো হয়ে গেল রূপে।

মহিম বলেন, কোন্ ইস্কুলে পড়া হয়?

এ রকম রূপবতী বড়-ঘরের মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা এই প্রথম। 'তুমি' মুখে আসে না, অথচ ছাত্রীকে 'আপনি' বলাই বা যায় কেমন করে!

জ্যাঠাইমা বললেন, চাট্টি খেয়ে যাবে বাবা।

মহিম আমতা-আমতা করেন: না না—খাওয়া আবার কি জন্যে?

মেসে গিয়ে খাও তুমি, আমি জানি। তার দরকার নেই। ওরা যদ্দিন না ফিরছে, দুবেলা এখানে খাবে।

মেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে একমাসের মতো—

মানা করে এস। আমার দেওর সাতকড়ির বাড়ি খেতে পার, আমার বাড়ি খেলে কি জাত যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কি জাত তোমরা বাবা? সেন উপাধি বদ্যির হয়, আবার কায়স্থেরও হয় কিনা।

কায়স্থ।

আমরাও কায়স্থ। তবে তো স্বজাত আমরা। আমার হাতের রান্না নিরামিষ তরকারি পাতে দিতে পারব। আসছি আমি। তোমরা কথাবার্তা বল। একেবারে খেয়ে যাবে এখান থেকে।

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, চানটান হয় নি—

চান-ঘর এবাড়িতেও আছে। আচ্ছা, চান করেই এস ওবাড়ি থেকে। বেশি দেরি কোরো না।

বাপরে বাপ, কী আয়োজন! কতগুলো তরকারি থালা ঘিরে গোল করে সাজানো! খাওয়ার সময়টা জ্যাঠাইমা সর্বক্ষণ সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করেন। বেশি আদর-যত্নে মহিমের অসুবিধা লাগে। কিন্তু মুখ ফুটে বলাও যায় না কিছু।

শ্যামাপূজো এসে পড়ল। ফট-ফট আওয়াজে বাজি ফুটতে শুরু হয়েছে রাস্তাঘাটে। শ্যামাপূজোর আগের দিন সাতকড়িরা সব এসে পড়লেন। ইস্কুলে এখনো ছুটি আছে, ছুটি চলবে জগদ্ধাত্রীপূজো অবধি। মা বড্ড চিঠি দিচ্ছেন, দেশে যাবে এইবার ক'দিনের জন্য। সত্যিই তো, একমাত্র ছেলে—ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে হবে না মায়ের? বড় বোন সুধাও আর আলতাপোলে থাকতে পারছে না। তার ভাশুর তারক কর মশায়ের সংসার অচল, তিনি তাকে বেহালার বাসায় নিয়ে আসবেন। মা তখন একেবারে একা। তারও একটা বন্দোবস্ত করে আসতে হবে।

মঞ্জুর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংসারের যাবতীয় খবরাখবর নেন। বলেন, তোমারই তো অন্যায় বাবা। বুড়ো মাকে একলা কেন পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখবে? বাসা কর। আচ্ছা, বিয়েথাওয়া হয়ে যাক, তারপরে বাসা করবে। বিয়ের কথা মা কিছু বলেন না?

মহিম মুখ নিচু করে থাকেন, জবাব দেন না। মঞ্জুর মা বলেন, মা তো আমিও। কোন্ মা চায় যে ছেলে আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াক। কিন্তু তোমরা আজকালকার সব হয়েছ, মনের তল পাওয়া যায় না। আমার মধুর জন্যেও মেয়ে দেখছি। তার অবশ্য বলবার কথা আছে—বোনের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে ভাইয়ের বিয়ে। সেটা ঠিক বটে! মঞ্জুরাণী বড় হয়ে গেছে। নিজের মেয়ের কথা জাঁক করে কি বলব—দেখছ তো তাকে চোখে। পড়াচ্ছ যখন, সবই জান। পাত্তর অনেক এসেছিল, তখন গা করি নি। বলি, পড়ছে পড়ুক না—পাশটাশ করে যাক, বিয়ের কথা তারপরে। কিন্তু পাশ করে তো আর দুখানা হাত বেরবে না। বিয়ে হয়ে গেলে তার পরেও পড়তে পারবে। ভাল ছেলে পেলে দিয়ে দেওয়া উচিত। কি বল?

সে তো বটেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তোমার ইস্কুলের চাকরি কদ্দিন হল বাবা?

মহিম তাড়াতাড়ি জবাব দেন, দু-বছর হয় নি এখনো। ছেড়ে দেব আইন পাশ করে। ভাবলাম, সন্ধ্যেবেলার একটুখানি তো ক্লাস—সমস্তটা দিন বসে বসে কি করা যায়—

মঞ্জুর মা লুফে নিলেন কথাটা: বেশ করেছ। লেখাপড়া শিখেছ, বাড়ির টাকা এনে শহরে বসে কি জন্য খাবে? এই রকম ছেলেই আমার পছন্দ। দেশের ঠিকানাটা দাও তো বাবা। আমি তোমার মাকে চিঠি লিখব।

ঘেমে উঠেছেন মহিম, বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে। বলছেন কি ইনি—বনেদি ঘরের এই অপরূপ রাজকন্যা মহিমের মতো মাস্টারের হাতে দেবেন? ম্যাকলিন কোম্পানির হামবড়া কেরানি এক-কথায় যে সম্বন্ধ নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মঞ্জুর মা বলছেন, একটি মেয়ে আমার—গয়নাগাঁটি মেয়ের গা সাজিয়ে দেব। আমার নিজের পুরানো একসেট জড়োয়া গয়না—

তা-ও মেয়ে পাবে। এই পৈতৃক বাড়ি মধুর। কালীঘাটে আলাদা একটা বাড়ি কর্তা মেয়ের নামে কিনে দিয়ে গেছেন। ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা করে ভাড়া দেয়। মেয়ে আমার শুধু-হাতে যাবে না। জগদ্ধাত্রীপূজোর পর ফিরে আসছ—তার মধ্যে তোমার দেশের বাড়ি চিঠি চলে যাবে। মাকে তুমি বুঝিয়েসুজিয়ে সমস্ত বোলো।

নিচে নেমে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন। মঞ্জুরাণী লুকিয়ে লুকিয়ে কথাবার্তা ঠিক শুনেছে। দরজার ধারে সে দাঁড়িয়ে। মহিমও থমকে দাঁড়ান। তাকান এদিক-ওদিক। কেউ কোন দিকে নেই।

মঞ্জু বলে, মাস্টারমশায়, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আগের মাস্টার পড়াতেন ভাল। শিক্ষিত মানুষ। শেষটা মাইনেও নিতেন না। তবু তাঁকে তাড়িয়ে দিল।

থেমে পড়ল মঞ্জু হঠাৎ। বলে, না, এখন হবে না। মানুষজন চারদিকে। অন্য সময়। আপনাকে বলতে হবে সব কথা—কেন সে মাস্টার তাড়া খেলেন। এমনি তাড়ানো নয়, মেরে বাড়ির বের করে দিল। গাঁয়ের মানুষ আপনি, ভাল মানুষ—সমস্ত আপনার জানা দরকার।

বলেই চক্ষের পলকে কোন দিকে সে সরে গেল, পাখির মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল যেন।

সেই রাত্রে। গলির জানলায় টোকা পড়ছে, ঘুমের মধ্যে শুনছেন মহিম। খুট—খুট—খুট। আর, মাস্টারমশায় মাস্টারমশায়—বলে ফিসফিসানি।

ধড়মড়িয়ে মহিম শয্যায় উঠে বসলেন। জানলার ওধারে মঞ্জুরাণী। মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

সাঁ করে মঞ্জু একটুখানি পাশে সরে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকছে, বাইরে আসুন। কথা আছে—সেই কথা।

ঘুমের আবিল কাটে নি। কি করবেন মহিম, বুঝে উঠতে

পারেন না। মঞ্জুরাণী তাড়া দেয় : আঃ, আমি চলে এসেছি, আপনি আসবেন না?

তরল অন্ধকার। তার মধ্যে দেখা যায় মঞ্জুকে। দিনমানের ছাত্রী মেয়ে নয়, রাতের রহস্যময়ী। গায়ের উজ্জ্বল রং এখন যেন জ্বলছে।

একেবারে কাছে চলে এল সে। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান। এলোচুল, আলুথালু কাপড়চোপড়। কোন গতিকে কাপড় জড়িয়ে এসেছে। চলার সঙ্গে টলমল করে যৌবন, পাত্র ছাপিয়ে যেন উছলে পড়ে। মহিমের গা শিরশির করে ওঠে।

আগে আগে মঞ্জু নিজেদের বাড়ির সামনে গেল। দরজা ভেজানো, নরম হাতে নিঃসাড়ে খুলে ফেলল। এক পা ভিতরে গিয়ে দরজা ধরে ডাকে, আসুন।

পাথর হয়ে গেছেন মহিম। পা দুখানা অচল।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, কে দেখে ফেলবে। ভিতরে চলে আসুন।

ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। মঞ্জুর মুখে কেমন এক ধরনের হাসি। বলে, ভয় করে? তবে থাক। কথা শুনে কাজ নেই। আপনি ঘোমটা দিয়ে বেড়াবেন মাস্টারমশায়। আপনার কাছে পড়ব না।

দরজা বন্ধ করল মঞ্জু ভিতর থেকে। সর্বনেশে ব্যাপার! কথা বলার এই হল সময়? তাড়াতাড়ি মহিম ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ভাল করলেন কি মন্দ করলেন ভাবছেন। ঘুম আসে না, এপাশ-ওপাশ করেন। সর্বদেহে যেন অগ্নিজ্বালা। কী কথা ছিল ওই রাণীর মতো মেয়েটার, কোন এক গূঢ় বেদনা! যার স্ত্রী হতে যাচ্ছে, মনের গোপন কথা তার কাছে খুলে বলতে চেয়েছিল। মহিম ভয় পেয়ে গেলেন। কলঙ্কের ভয়, ওর ওই উচ্ছল উন্মত্ত যৌবনের ভয়। আশৈশব বাঁধাধরা রীতিনীতির মধ্যে অভ্যস্ত জীবন, তার বাইরে পা বাড়াতে পারলেন না মাস্টার মানুষটি।

॥ ষোল ॥

আলতাপোল গিয়ে মহিম দেখলেন, মা আর দিদি উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁর বিয়ের জন্য। চিঠির পর চিঠি—ঠিক এই ব্যাপারই আন্দাজে এসেছিল। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা তাতিয়ে দিচ্ছেন আরও মাকে : পাশ-করা ছেলে, চাকরির পয়সা হাতে রমারম আসছে এখন। না মহিমের মা, মোটে আর দেরি কোরো না। কোন সাহসে দেরি করছ, তা-ও তো বুঝি নে। কলকাতার শহর, শাসন-নিবারণের কেউ নেই মাথার উপরে। কোন ডাকিনীর ফাঁদে পড়ে যাবে, ছেলে তখন আর তোমার থাকবে না। তাই বলি, ঘোষগাঁতিতে আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়ে—ডাগরডোগর, কাজকর্মে ভাল, সাত চড়ে রা কাড়বে না—মেয়েটা তুমি নিয়ে নাও মহিমের মা। দেবে-থোবেও একেবারে নিন্দের নয়।

ডাকিনীর ফাঁদে পড়ে পেটের ছেলে মাকে দাসী-বাঁদীর মতো জ্ঞান করে—দৃষ্টান্ত তুলে তুলে শোনানো হয়েছে। হরেন আলতাপোল পোস্টঅফিসের পোস্ট-মাস্টার। মহিমের সঙ্গে বড় হয়েছে, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। তাকে ডেকে সেনগিন্নি বললেন, তুমি না লাগলে হবে না হরেন। মহিম বাড়ি এলে দুজনে গিয়ে মেয়েটা দেখে এস। ছেলেয় মেয়েয় দেখাদেখি হয় তো আজকাল—আমাদের পাড়াগাঁয়েও বিস্তর হচ্ছে। ছাড়বে না তুমি, ধরেপড়ে নিয়ে যাবে।

সুধা গিয়ে মহিমের কাছে কথাটা তুললেন : মেয়ে নিজের চোখে দেখে বিয়েথাওয়া হওয়া ভাল। বাবা কি বড় ভাই মাথার উপরে থাকলে তাঁরাই অবশ্য দেখতেন। একেবারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়, কি বল ?

মহিম সাগ্রহে সমর্থন করেন, ঠিকই তো!

তাহলে যাও ভাই, ঘোষগাঁতির মেয়েটা দেখে এস। 'মঙ্গলে

উষা বুধে পা'—কাল বুধবার ঘোর-ঘোর থাকতে বেরিয়ে পড় তুমি আর হরেন। তুমি বাড়ি আসছ, মেয়েওয়ালাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়ে দেখতে পাঠানো হবে, তা-ও তারা জানে।

মহিম অবাক হয়ে বলেন, কী মুশকিল! এতখানি এগিয়েছ তোমরা, আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সুধা মুখ টিপে হেসে বলেন, কি ভেবেছ তবে? মুখে রক্ত তুলে খেটে খেটে সংসারের টাকা পাঠাও, খেয়েদেয়ে আমরা খালি ঘুমোই—এই ভাবতে বোধ হয়? হরেন কাপড়চোপড় কেচে তৈরি হয়ে আছে, বলে আসি তাকে।

সত্যি সত্যি তখনই চললেন বুঝি হরেনকে বলতে। ঘাড় নেড়ে মহিম বলেন, কিছু বলতে যেও না দিদি। বয়ে গেছে আমার এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে হট্ট হট্ট করে বেড়াতে। ক'টা দিন বাড়ি এসেছি, শুয়ে বসে থাকব। এক পা নড়তে পারব না।

আরও দু-চার বার বলায় মহিম রাগ করে উঠলেন : বেশ, যেতে বল তো যাচ্ছি একেবারে কলকাতায় চলে। অন্য কোথাও নয়।

মেয়েকে দিয়ে হয় না তো সেনগিন্নি নিজে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

কবে যাবি ঘোষগাঁতি?

যাব না তো। বলে দিয়েছি দিদিকে।

করবি নে তবে বিয়েথাওয়া? স্পষ্ট করে বলে দে। লোকের কাছে আমি অপদস্থ হতে চাই নে।

মহিম বলেন, তুমি যে ক্ষেপে গিয়েছ মা! ব্যস্ত কিসের? সময় হলে হবে।

ক্ষেপে যেতে হয় তোমার কাণ্ড দেখে। সুধা থাকছে না, তার ভাশুর তাকে বাসায় নিয়ে যাবে। একলা আমি পড়ে থাকব। তখন কেউ খুন করে রেখে গেলে পচে দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পড়শির কাছে খবর হবে না।

চোখে আঁচল দিলেন মা। মহিম হেসে বললেন, আজেবাজে ভেবে মরা তোমার স্বভাব। একলা কি জন্য থাকতে যাবে? আমিও বাসা করব কলকাতায়, তোমায় নিয়ে যাব।

মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: আমি বুড়ো বয়সে হাঁড়ি ঠেলতে পারব না তোমার বাসায়। হ্যাঁ, সাফ জবাব।

আচ্ছা সে দেখা যাবে হাঁড়ি ঠেলবার মানুষ পাওয়া যায় কিনা কোথাও। এখন তাড়া করলে তো হবে না মা।

ডাক এলে ঢপঢপ করে চিঠির উপর শিলমোহর পড়ে। শব্দ শুনে মহিম পোস্টঅফিসে ছোটেন। হরেনকে বলেন, কলকাতার চিঠিপত্তর আসে না কেন বল তো?

কেউ দেয় না বলেই আসে না। এত উতলা কেন? চিঠি দেবার মানুষ জোটাও, ভারি ভারি খাম চলে আসবে রোজ।

মহিম বলেন, ঠাট্টা নয়। একটা জরুরি চিঠি আসার কথা। কাজের চিঠি। তোমার ওই মুখ্যু রানারটা শিল মারে আর বাঁ-হাতে চিঠি ঠেলে দেয়। কোনখানে সেই সময় পড়েটড়ে গেল কিনা কে জানে!

হরেন বলেন, পড়লেও এই ঘরখানার মধ্যে থাকবে। আসে নি, এলে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব।

মহিম গেলেন না তো ঘোষগাঁতি থেকে মেয়ের খুড়ো এসে পড়লেন। হয়তো বা সেনগিন্নিই খবর পাঠিয়েছিলেন সেখানে।

এই ঘোষগাঁতি সূর্যকান্তর বাড়ি। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টার ভাইপোর আশ্রয়ে শিলিগুড়ি আছেন। নয়তো মহিম নিশ্চয় চলে যেতেন গেল-বারের মতো। মেয়ের খুড়োর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূর্যবাবুর সমস্ত কথা শোনা গেল। বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে, বিয়ে করে ফেলেছে লীলা। সূর্যবাবুর প্রপিতামহী বিধবা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়েছিলেন, তাঁর মেয়ে বিধবা হবার পর আবার বিয়ে করে সংসারধর্ম করছে। বড় ভাইপো পুলিশ-

ইনস্পেক্টরের সেই শ্যালকটি। কলকাতায় নিয়ে ট্রেনিং-এ ঢুকিয়ে দিয়েছে ঠিকই—তার পরে দু-জনে মিলে এক চিঠিতে বাপের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাল। সূর্যকান্ত জবাব দেন নি। কোন সম্পর্ক নেই ও-মেয়ের সঙ্গে। রানীর মতো লীলাও মরে গেছে, এই তিনি ধরে নিয়েছেন। শিলিগুড়ি থেকে ভাইপোর ছেলেমেয়েগুলোকে পড়ান, আছেন একরকম।

মহিমকে ডেকে সুধা বললেন, মেয়ে তো দেখতে গেলে না—এই দেখ, মেয়ে ওঁরা বাড়ি তুলে এনে দেখাচ্ছেন।

পাত্রীর ফোটো। ফোটো সকলের হাতে হাতে ঘুরছে। নোলক-পরা নাকচোখ টানা-টানা খাসা ফুটফুটে মেয়ে। নাম সরসীবালা।

মা বলেন, পাকা কথা দিয়ে দিই, কি বল?

শশব্যস্তে মহিম ঘাড় নাড়েন : না মা। এখন থাক, তাড়াতাড়ি কিসের?

মুখ কালো করে মা সরে গেলেন। বাক্যালাপ বন্ধ।

দিন তিনেক পরে কলকাতা রওনা হবার সময় মহিম মাকে প্রণাম করলেন। তখনও রাগ পড়ে নি। পোস্টঅফিসটা ঘুরে হরেনকে শেষ একবার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন। না, আসে নি কোন চিঠি।

সাতকড়ির বাড়ি পা দিয়েই রহস্যের সমাধান হল। মাস্টার মশায় দেশ থেকে ফিরলেন, ছাত্রছাত্রীরা ধুপধাপ করে নেমে এসেছে। মায়া কলকণ্ঠে বলে, ও-বাড়ির মঞ্জুদিদির বিয়ে হয়ে গেল পরশুদিন। বাড়িসুদ্ধ সবার নেমন্তন্ন। আপনি থাকলে আপনারও হত।

মহিম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ধুলোয় ভর্তি জুতো-জোড়াও খুলে রাখতে যেন ভুলে গেছেন। তারপর বললেন, আমার কথা হয়েছিল নাকি?

না, হয় নি। যদি থাকতেন, একজনকে কি আর বাদ দিয়ে বলত?

পাটু বলে, ফুলশয্যার আগেই আজ সকালে মঞ্জুদিদি চলে এসেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নাকি বড্ড খারাপ। গোঁয়ার-গুণ্ডা লোক। বাবা সেই কথা শুনে খুব রাগ করলেন: তুটো দিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে ফেলল। কাউকে কিছু বলল না, খোঁজখবর নিল না ভাল করে। হবেই তো এমনি।

মায়া বলে, এসে অবধি যা কান্না কাঁদছে মঞ্জুদিদি! দেখে কষ্ট হয়। আমি গেলাম, তা একটা কথা বলল না। চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

বিয়ে হতে না হতে এই। মহিমের কষ্ট হচ্ছে মঞ্জুরাণীর জন্মে। এত রূপসী মেয়ে, তার ভাগ্যে এই! রাগ হচ্ছে ওই মা আর ভাইটার উপর। অত আমড়াগাছি করল কি জন্য তাঁকে? পড়াবার নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে—চর্ব্যচোষ্য খাইয়ে? পড়ানো তো বাজে অজুহাত—বোঝা গেছে সমস্ত। আসলে হল মেয়ে দেখানো, মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে দেওয়া। ইস্কুল-মাস্টার বলে তার পরেও আগুপিছু করছিল বোধ হয়—হঠাৎ ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশ করল এমন মেয়েটার। মা আর ভাই তুজনে মিলে। তুটোকে কেটে কুচি-কুচি করে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে তবে রাগের শোধ যায়।

বেশি নয়, হপ্তা তুই কেটেছে তার পরে। বার্ষিক পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের উপর—ছাত্রদের বড্ড চাড় হয়েছে, প্রাইভেট মাস্টারকে ছাড়তে চায় না, জোঁকের মতন লেপটে থাকে। টুইশানি সেরে মহিম ফিরছেন, রাত্তিরটা বেশি হয়ে গেছে। দেখেন, গলির ঠিক মোড়ের উপর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনের পিছনের আলো নিভানো। ট্যাক্সির ভিতরে ষণ্ডা ষণ্ডা কয়েকটা লোক শীতের জন্যই বোধ করি গাদাগাদি হয়ে আছে। মহিমের দিকে তারা কটমট করে তাকায়। পথ একেবারে নির্জন। রকম-সকম মহিমের ভাল লাগে না।

অনতি পরেই প্রলয় কাণ্ড একেবারে। চেঁচামেচি মঞ্জুদের বাড়ি থেকে। মহিম ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, জানলা খুলে ফেললেন। লোক জমেছে, ওদিকে টিনের বস্তিতে ক'ঘর ভাড়াটে ওঁদের—তারা সব এসে পড়েছে। বেশভূষায় রীতিমতো বাবু এক ছোকরা—ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দিল তাকে মঞ্জুদের বাড়ি থেকে।

ছোকরা চেঁচাচ্ছে, কোথায় সব ? দেখ, মারছে আমায় শালারা।

মধুসূদন অগ্রণী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিল-ঘুষি টিপঢাপ ঝাড়ছে সে ছোকরার পিঠে। ভিড়ের মানুষরাও ছাড়ে না—সুযোগ পেয়ে তারাও যথাসম্ভব হাতের সুখ করে নিচ্ছে।

ছোকরা রাস্তার দিকে মুখ করে হাঁক দেয় : এই, কী করছ সব তোমরা ?

সাতকড়ির উপরের ঘরের জানলা খট করে খুলে গেল : হল্লা কিসের ? আরে, কী সর্বনাশ! জামাইকে মারছ মধু ?

মাতাল হয়ে এসেছে দেখুন কাকা। বলে, বউ নিয়ে যাব, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি। ঠাকুর উঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল, ট্যাক্সিতে গুণ্ডা বোঝাই। মঞ্জুকে নিয়ে ওরা খুন করে ফেলবে।

জামাই বলে, গুণ্ডা কেন হবে। আমার মাসতুতো আর মামাতো ভাইরা। বউ বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। এই, কি করছ তোমরা ? বেরিয়ে এস না।

ট্যাক্সি কোথায় তখন! মামাতো-মাসতুতো ভাইদের নিয়ে দৌড় দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে।

সাতকড়ি তাড়া দিয়ে উঠলেন : এত রাত্রে কিসের বউ নিয়ে যাওয়া ? বউ নিতে হলে দিনমানে এস। চলে যাও। ভদ্রলোকের পাড়া—মাতলামির জায়গা নয় এটা।

জামাই ক্ষেপে গেল একেবারে। উপর দিকে মুখ করে আকাশ ভেদ করার মতন কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে : ওরে আমার ভদ্দোরলোক! পোয়াতি মেয়ের সঙ্গে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে এখন ভদ্দোরলোক ফলাতে

এসেছে। বের করে আনুক মেয়ে—দশজনে দেখেশুনে পরখ করে ভদ্দোরপাড়া থেকে বস্তিতে তুলে দিয়ে আসুক, তবে যাব এখান থেকে।

উল্লুকটাকে দূর করে দাও—। সংক্ষেপে আদেশ দিয়ে সাতকড়ি সশব্দে জানলা বন্ধ করলেন। কিন্তু যারা মারধোর করছিল, হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে হাত থেমে গেছে তাদের। মজাদার কথা, রসের খবর। বনেদি ঘরের মেয়ের কুৎসা। জামাই হাঁকডাক করে বলছে, সময় দিচ্ছে সেই জন্যে। বলে নিক শেষ করে। দূর করে দেওয়া মিনিট কতক পরে হলে ক্ষতি হবে না।

সেই রাত্রেই মহিম পোস্টকার্ড লিখলেন: মা, কখনো আমি কি আপনার কথার অবাধ্য হইয়াছি? আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই করিবেন। পাত্রী দেখিবার আমি কোন প্রয়োজন মনে করি না···

॥ সতেরো ॥

ম্যাকলিন কোম্পানির বড়বাবু মাস্টার বলে মেয়ে না দিলেন—কিন্তু বাংলাদেশ এটা, খেয়াল রেখো। ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলেও বিয়ের মেয়ে কত গণ্ডা চাই? সরসীবালার বাপ-খুড়ো কৃতার্থ হয়ে গেলেন কন্যাদান করে। মানুষের মন পড়া যায় এমনিতরো চশমা আজও বেরল না—তাহলে দেখতে আরও কতজন নিজেকে বাপান্ত করছে, টপকে পড়ে এমন পাত্রটা নিজের মেয়ের সঙ্গে গাঁথতে পারে নি বলে।

তারক কর মশায় ভ্রাতৃবধূ সুধাকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। সেনগিন্নি বুড়ো হয়েছেন, তাঁকে এখন সদাসর্বদা দেখাশোনার দরকার। সুধা সেই কাজ করতেন। বুড়ো মায়ের উপরে অধিকন্তু

এক ছেলেমানুষ বউয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে গাঁয়ে ফেলে রাখা যায় কেমন করে? মহিমকেও বাসা করতে হল অতএব। ইস্কুলের কাছাকাছি নিচের তলায় ছোট একখানা ঘর আর ঘেরা বারান্দা পাওয়া গেছে। ভাল হয়েছে, ইস্কুলে যাতায়াতে সময় লাগবে না। টিফিনের সময়টাতেও এসে একটু গল্পগাছা করা যাবে। সকালবেলা সাতকড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতেন, সেখান থেকে চলে এসে ওই সময়টা এখন ছুটো টুইশানি নিয়েছেন। রাত্রের পুরানো ছাত্রীটাও আছে। ছেড়ে দেন নি ভাগ্যিস মঞ্জুর মায়ের কথায়!

পয়লা তারিখে মাইনে পাওয়া গেছে। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের এই রীতিটা বড় ভাল, প্রায় যা কোন ইস্কুলে নেই। রসগোল্লা বানাচ্ছিল এক খাবারের দোকানে। বড়ি বড়ি ছানা ফুটন্ত চিনির রসে ফেলেছে, ফুলে-ফেঁপে রসে টইটম্বুর হচ্ছে। মাইনে পেয়ে মনমেজাজ আজ ভাল—ছ' আনার ছ'টা রসগোল্লা কিনে খুরিতে নিয়ে বাড়ি চললেন।

সরসীবালাকে বলেন, গরম রসগোল্লা খেয়েছ কখনো? একেবারে হাতে-গরম। টুপ করে ছুটো গালে ফেলে দাও দিকি। জুড়িয়ে গেলে মজা থাকবে না।

সরসীবালা কথা কম বলে। বড় বড় চোখ তুলে তাকায়, আর মুচকি হাসে কথায় কথায়। হাসি আর চাউনি ভারি চমৎকার। খুরি নিয়ে সে চলে গেল। ক্ষণপরে বাটিতে করে ছুটো রসগোল্লা আর এক গেলাস জল মহিমের সামনে এনে রাখল।

চা খেয়ে এস নি তো? চা করে আনি—

চিনি তো নেই, কাল থেকে শুনছি। চিনি এনে দিই তবে।

উঠছিলেন মহিম। হেসে কাঁধে হাতের মৃত্যু চাপ দিয়ে সরসীবালা বসিয়ে দিল: এই এলে, এক্ষুণি আবার দোকানে ছুটতে হবে না। রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় আনলে হবে। এখন চিনি লাগছে না, রসগোল্লার রস দিয়ে চা করব। জেনে ফেললে তাই, খেয়ে কিন্তু মোটেই ধরতে পারবে না চিনির রসের চা।

তাড়াতাড়ি চা করতে যাবে। কিন্তু যেতে দিচ্ছেন না মহিম, হাত ধরে ফেললেন।

আমায় তো দিলে। তোমরা খাবে না?

সরসীবালা বলে, মার জন্য দুটো তুলে রেখে এলাম এঁটো হবার আগে। সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর দেব।

নিজের কথা বলছ না—তুমি খাবে কখন?

সরসী বলে, কষ্ট করে এলে, তোমায় আগে চা করে দিই। চা খেয়ে কলেজে চলে যাও। আমার খাওয়ার কত সময় রয়েছে।

হাত-পা অলস ভাবে ছড়িয়ে মহিম বলেন, এখন কলেজে গিয়ে কী আর হবে! গিয়ে পৌঁছতেই তো প্রায় সাড়ে পাঁচটা। পুরো একঘণ্টা কোন প্রফেসর ধৈর্য ধরে পড়ান না, আগেভাগে ছুটি দিয়ে দেন। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখব, কেউ নেই—ছুটি হয়ে গেছে।

সরসী বলে, পরশু তো কামাই করলে। ও-হপ্তায় করেছ তিন দিন। হত ইস্কুলের মতো: গার্জেনের চিঠি আন, নয় তো বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেব—তা হলে জব্দ হতে।

মহিম বলেন, কিসের জব্দ? তোমাকেই বলতাম যে চিঠি লিখে দাও—বিষম অসুখ। গিয়ে দেখাতাম, এই যে চিঠি আমার গার্জেনের।

মুখ টিপে হেসে সরসীবালা বলে, তা-ই বটে! শুয়ে পড়ে থাকার অসুখ নয়, বসে বসে পাগলামি আর ফষ্টিনষ্টির অসুখ। কলেজ কামাই করে নিত্যিদিন তুমি অসুখে ভুগবে, আমার যে এদিকে সৃষ্টি-সংসারের কাজ পড়ে থাকে।

মহিম বলেন, কলেজে একটি দিনও কামাই নেই আমার। তাই দেখ—বাড়ি বসে অসুখে ভুগি, আবার কলেজ করেও যাচ্ছি কেমন একসঙ্গে।

সরসীবালা সেই বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে, বুঝতে পারে না। মহিম ফলাও করে বোঝাচ্ছেন: আমাদের ল-কলেজে না

গিয়েও হাজির থাকা যায়। আমি তবু তো একই কলকাতা শহরের উপর রয়েছি। একজনে ধরা পড়ে গিয়েছিল—বরিশাল শহরের এক বড় ইস্কুলে কাজ করে, দশটায় ইস্কুলে যায় চারটেয় সই করে বাড়ি ফেরে, আবার ঠিক চারটে-পঁয়তাল্লিশে কলকাতায় দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ ক্লাস করছে। পুরো দুটো বচ্ছর এমনি করে আসছে।

সরসীবালা বলে, কেমন করে হল?

পাকা বন্দোবস্ত। মাসিক একটা বরাদ্দও থাকে—এত করে দেব, রোল-কলের সময় রোজ 'প্রেজেন্ট' বলে যাবে।

বল কি! প্রফেসররা তো আচ্ছা বোকা, ধরতে পারেন না?

বড্ড ভাল প্রফেসররা। এই কাজে লুকোছাপা কিছু নেই, সকলের জানা। মস্তবড় ক্লাসঘরে পনেরটি ছাত্র হয়তো টিমটিম করছে। প্রফেসর ষাট-সত্তরটি হাজির লিখেছেন। একটা নাম ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, প্রফেসর হেসে বলবেন, দুর্ভাগা ভদ্রলোক—একটি বন্ধুও থাকতে নেই ক্লাসে!

তারপর বলেন, এক এক সময় ভাবি, ওই রকম পাকা বন্দোবস্ত আমিও করে ফেলব। কোন দিন কলেজে যাব না, অন্য লোকে প্রক্সি দিয়ে যাবে। রাত্তিরে যে পড়ানোটা আছে, সেটা সাঁজের ঝোঁকে সেরে আসব। পুরো রাত্তির হাতে রইল—গড়ের মাঠে খানিক বেড়ানো গেল। হল বা সিনেমায় গিয়ে বসলাম একদিন।

সরসীবালা বলে, পড়াশুনো?

মহিম লুফে নিয়ে বলেন, তাই বলতে যাচ্ছিলাম। আইনের বই এখন ছুঁতেই পারছি নে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাও দেওয়া গেল না। কাজকর্মের ঝঞ্ঝাট সকাল সকাল সেরে রাত জেগে চুটিয়ে পড়া যাবে। উকিল হয়ে না বেরনো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। মরীয়া হয়ে উঠেছি।

বর উকিল হবে, সরসীবালারও সাধ খুব। উকিল একজন আছেন তাদের ঘোষগাঁতিতে, ছেলেবয়স থেকে দেখে আসছে। মোটাসোটা,

গোলগাল, মাথায় টাক। পূজোর সময় বাড়ি আসেন। রেল-স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক পথ, সবাই হেঁটে চলে আসে, উকিলবাবু পালকি চেপে আসেন আট বেহারার। আট বেহারা ও-হো ও-হো ও-হো ডাক ডেকে অঞ্চলের মধ্যে সাড়া তুলে গ্রামে আসছে—মাঠ ভেঙে আড়াআড়ি সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু উকিলবাবুর ওই পথে আপত্তি : তা কেন! পৌঁছলে তো ফুরিয়ে গেল। পূবপাড়া পশ্চিমপাড়া উত্তরপাড়া—তিনটে পাড়া বেড় দিয়ে যাও। চোখ টাটাবে কত জনের, বুক ফাটবে, ঘুমতে পারবে না। তবেই তো পয়সা খরচ সার্থক।

সরসীবালার বড় ইচ্ছা, উকিল হয়ে মহিম পাল্কি-বেহারা হাঁকিয়ে একদিন আলতাপোলের বাড়ি যাবেন।

সে যাকগে। পরের কথা পরে। আজ এখন কলেজে যাচ্ছেন না, সেটা ঠিকই। আটটা অবধি আছেন বাসায়। জামা খুলে বারাণ্ডায় একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন, সেটা নিয়ে সরসীবালা ভিতরের আলনায় রাখল। ইস্কুলের জুতাজোড়া সরিয়ে নিল ; মোটর-টায়ার ফিতের মতন কেটে খড়মের উপর বসানো—সেই বস্তু এনে রাখল মহিমের পায়ের কাছে। বলে, আজকে পয়লা তারিখ, তাই বল। মাইনে পেয়েছ। তা পকেটে অমনভাবে টাকাকড়ি রাখে! বাসন মাজতে মাজতে ঝি'টা তাকাচ্ছিল আড়ে আড়ে। টাকাটা আমি তুলে রেখে এলাম—সাঁইত্রিশ টাকা ছ-আনা —তাই তো ? একটা মনিব্যাগও নেই—পকেটের ভিতর আজেবাজে কাগজের মতন নোটগুলো পড়ে থাকে। রোসো, মনিব্যাগ বুনে দিচ্ছি একটা। কুরুসের কাঁটা কিনে এনে দিও তো আমায়। আর সমস্ত আছে।

পকেটের টাকা সরসীবালা সাবধান করে তুলে রেখেছে। মহিমের অন্য-কিছু এখন কানে ঢুকছে না। নতুন বউ গণেগেঁথে বরের মাসমাইনে দেখল সাঁইত্রিশ টাকা ছ-আনা। চল্লিশের মধ্যে

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আড়াই টাকা এবং রসগোল্লার ছ-আনা বাদ। বি. এ. পাশ-করা গ্রাজুয়েট বর—এই মাইনেয় তিনি শহরে চাকরি করেন, বাসা করে বউ নিয়ে আসেন।

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, হ্যাঁ, মাইনে তো দিল আজ। মাইনের ভিতর থেকে আটত্রিশটা টাকা মোটে দিল। হতভাগা ইস্কুল পুরো মাইনে একদিনে দিতে পারে না। বলে, আপনার একলার তো নয়, সকলকে কিছু কিছু করে দিতে হবে। তা দিয়ে দেবে আর ছুটো তিনটে কিস্তিতে।

ল-কলেজে যাওয়া বন্ধ, প্রক্সি চলছে সেখানে। ইস্কুল থেকে ফিরে মহিম গল্পগুজব করেন খানিকটা। আটটা নাগাদ বেরোন ছাত্রী পড়াতে। দিন পাঁচেক পরে ইস্কুল থেকে এসে তিনি বলেন, টাকাটা পকেটে পড়ে আছে গো! আজকে আবার দিল কিছু—পনেরটি টাকা। যেন ফকিরের ভিক্ষে। তুলে রেখে দাও, কী আর হবে!

সকালবেলা যে ছু-বাড়ি টুইশানি করেন, তারই এক জায়গায় মাইনে দিয়েছে। পেয়েছেন সকালেই। সারা দিন চেপে ছিলেন—ইস্কুল থেকে ফিরে আসার পর তবেই ইস্কুলের মাইনে পকেটে থাকতে পারে।

এর পরে ঠিক এমনি নিয়মে আর ছু-কিস্তিতে পনের আর আঠার টাকা ইস্কুলের মাইনে এসে পড়ল। এবং সরসীবালা পকেট থেকে নিয়ে গণেগেঁথে তুলে রাখল। মোটমাট পঁচাশিতে দাঁড়াল—নেহাৎ নিন্দের নয়। পঁচাশি টাকার স্বামীকে নতুন বউয়ের রীতিমতো মান্য করা উচিত। আরও কত বাড়বে! উকিল হয়ে আদালতে গেলে তো কথাই নেই।

রাত্রে যে পড়ানো, সময় বদলাতে তারা রাজি নয়। পড়ে মেয়ে, সন্ধ্যাবেলা তিন দিন তার গানের মাস্টার আসে। গান যেদিন

না হয়, চোর-পুলিশ খেলে ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে। রাত হয়ে গেলে তারা তো ঘুমিয়ে পড়বে! মহিমের কাছে সন্ধ্যাবেলা কিছুতে পড়বে না মেয়েটা।

মা বললেন, তবে আর মিছামিছি কলেজ কামাই করা কেন? আবার যেতে লাগ।

মহিম বলেন, কলেজে গিয়ে লাভ কিছু নেই মা। মিছে ট্রাম-খরচা গোলদীঘি অবধি। এ হলগে ল-কলেজ—অন্য দশটা ইস্কুল-কলেজের মতন নয়। প্রফেসররা হাইকোর্টে সারা দিন মামলা করেন, তাঁরা কেউ পড়াতে চান না। ছাত্র যারা, তারাও চাকরি-বাকরি করে—পড়বার জন্য যায় না কেউ। পড়াশুনো যত-কিছু বাড়িতে। খেয়েদেয়ে শুয়ে শুয়ে খানিকটা করে আমি পড়ে থাকি।

মা এবার সরসীবালার কানে না যায় এমনিভাবে বললেন, সন্ধ্যাবেলা তবে আর একটা পড়ানো দেখে নে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পোয়াতি বউমা খাটতে পারে না বেশি, ঠিকে-ঝি রাখতে হল। বাচ্চা হবার সময় খরচা, হয়ে যাবার পরে আরও বেশি খরচা। ইস্কুলের পর আজেবাজে গল্প না করে ওই সময়টা যাতে দু-পয়সা আসে সেই চেষ্টা দেখ।

বছরের মাঝখানে ভাল টুইশানি মেলে না। সেসব জানুয়ারি মাসে নতুন সেসনের মুখে দেখতে হয়। দু-একটা রদ্দি মাল পড়ে থাকে এখন। অত্যন্ত কম মাইনের বলে মাস্টার জোটাতে পারে নি, অথবা ছেলের বাঁদরামির জন্য টুইশানি ছেড়ে দিয়ে কোন মাস্টার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। মা যা বলছেন—বউয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করায় সময় নষ্ট না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই সই। পাওয়া গেল বার টাকার একটা।

মাসের পয়লা তারিখে মহিমের পকেটে যথারীতি মাইনের টাকা —সরসীবালা গণেগেঁথে তুলে রেখে এল। এসে মুখ টিপে

হেসে বলে, বরাবর আর তিনটে কিস্তি আসে। এ মাসে তার উপরে আবার একটা। কিছু মাইনে-বৃদ্ধিও হয়েছে, কি বল ?

ধরণী দ্বিধা হও, মহিম-মাস্টার তন্মধ্যে প্রবেশ করবেন। বউ দেখা যাচ্ছে ভিজে বেড়াল একটি, জেনেশুনে ন্যাকা সেজে থাকে। মাস্টারি চাকরি কিছুতে নয়, ওকালতিটা পাশ হলে যে হয়। কিন্তু সে আশাও মরীচিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতদিনের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাই দেওয়া ঘটে উঠল না, পার্সেন্টেজ পচে যাবে। কলেজে প্রক্সি দেবার ভার যার উপর—খবর নেওয়া গেল, সে লোক পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে কোথায় চলে গেছে। সকলের বড় বাধা, ছ-মাস মাইনে দেওয়া হয় নি—কলেজের খাতায় নাম কেটে দিয়েছে। আর সংসার-খরচের যা বহর, টুইশানি আরও একটা বিকালের দিকে জুটিয়ে নেবেন কিনা ভাবছেন।

॥ আঠার ॥

ইস্কুলের ঠিকানায় মহিমের নামে একখানা পোস্টকার্ড এল। সুরেশ নামে কে-একজন লিখেছে : আপনার শিক্ষক সূর্যবাবু অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন। কার্জন-ওয়ার্ডের আঠাশ নম্বর বেড। আপনাকে তিনি দেখিতে চান।

ইস্কুল থেকে সোজা মহিম বেরিয়ে পড়লেন। একটু না হয় রাত হবে টুইশানি শুরু করতে। কামাই হবে না-হয় ছাত্রীটার ওখানে। ঘুরে ঘুরে এনকোয়ারি-অফিসে খোঁজখবর নিয়ে অবশেষে জায়গাটায় হাজির হলেন। একতলার একটা ঘরের শেষ প্রান্তে ফ্রী-বেড।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসপাতাল মানুষজনে ভরে গেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা ফল নিয়ে ফুল নিয়ে মিষ্টিমিঠাই নিয়ে রোগিদের দেখতে

আসছে। সূর্যকান্তর কাছে কেউ নেই, একলাটি পড়ে আছেন। চিরদিনই রোগা শরীর—এখন যেন বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে আছেন একেবারে। ঠোঙায় করে চারটে কমলালেবু নিয়ে মহিম বিছানার পাশে দাঁড়ালেন।

আয় বাবা—বলে সূর্যকান্ত আহ্বান করলেন। উঠতে যাচ্ছেন, একটু বোধ হয় ঘাড়ও তুলেছেন। কিন্তু সিস্টার তাকিয়ে পড়লেন। যেমন তেমনি শুয়ে পড়লেন আবার তিনি।

অসুখ হয়ে কলকাতায় এসেছেন, কিছুই জানতাম না মাস্টার-মশায়। সুরেশ বলে একজন চিঠি লিখেছেন—

সুরেশ আমার ছোট জামাই। আসবে। আলাপ করে দেখিস, বড্ড ভাল ছেলে। অমন ছেলে হয় না। লীলা আর সুরেশ দু-জনে এসে যাবে এখনই।

নতুন জামাইয়ের প্রশংসায় শতমুখ। মহিমের বিস্ময় লাগে। প্রপিতামহী সতী হয়েছিলেন—চিরকাল সেই আদর্শের বড়াই করে এসে এখন সূর্যকান্ত বিধবা-বিবাহের পক্ষে। বলেন, বেঁচেছে আমার মেয়েটা। সুরেশের বাপ করপোরেশনের বড় অফিসার, তাঁর চেষ্টাতেই লীলার এত শিগগির চাকরি। কিন্তু বিয়ের পরে ছেলে-বউকে তিনি বাড়ি ঢুকতে দেন নি। বস্তির টিনের ঘর ভাড়া করে ওরা আছে। মাস্টারির হাড়-ভাঙা খাটনি খেটে লীলা সত্তরটি টাকা আনে। সুরেশ কিছু জোটাতে পারে নি, এখানে-ওখানে বইয়ের প্রুফ দেখে দু-দশ টাকা যা পায়। কিন্তু কী আনন্দে আছে যে দুটিতে! চোখে না দেখলে বুঝতে পারবি নে বাবা। টিনের চালের নিচে স্বর্গধাম বানিয়েছে। তাই দেখ—টাকার কোন সুখ নেই, সুখ মনে। ভাইপোর ওখানে ছিলাম। মাইনে আর উপরি মিলে রোজগার খুব ভাল, কিন্তু ঝগড়া-কচকচির ঠেলায় বাড়ি তিষ্ঠানো দায়।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, তবু কিন্তু এখানে সহজে আসতে

চাই নি। আমার মনের কথা জানিস তুই—রেখে-ঢেকে আমি কিছু বলি নে, অঞ্চলসুদ্ধ সবাই জানে। অসুখের খবর শুনে সুরেশ টেনেটুনে নিয়ে এল শিলিগুড়ি থেকে। সারাদিন একলা শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবি। দেখ, আমি ভুল করেছিলাম। কাল তো স্থির দাঁড়িয়ে নেই—এক সময়ের নীতি-নিয়ম আর এক সময়ে বাতিল। লোমশ ম্যামথ হিমযুগের সঙ্গে সঙ্গে বিলয় হয়, লোমহীন হাতি আসে সেই জায়গায়। সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি। আমার প্রপিতামহীর আমলে স্বামী ছাড়া মেয়েদের কি ছিল জীবনে? স্বামী অন্তে বেঁচে থাকার যে দুঃখ, তার চেয়ে চিতায় পুড়ে মরা আরামের। কিন্তু আমাদের মেয়েরা জীবনে হাজার পথ খোলা পাচ্ছে। স্বামী ওদের যথাসর্বস্ব নয়, নানা সম্পদের মধ্যে একটি। স্বামী না থাকলেও জীবনের অনেক-কিছু থেকে যায়। ওরা কোন দুঃখে তবে চিতায় মরবে? কিংবা জীবনে বেঁচে থেকেও মরার মতন থাকবে?

অনেক কথা বলে সূর্যকান্ত ক্লান্তিতে চুপ করলেন। শিয়রে টুলের উপর বসে মহিম ধীরে ধীরে তাঁর কপালে হাত বুলাচ্ছেন। একসময়ে প্রশ্ন করেন, অসুখটা কি মাস্টারমশায়?

কী আর এমন! খেতে পারি নে, পেটে যন্ত্রণা। অম্বলের দোষ আর কি। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় লীলাদের গলিতে। সেখানকার ডাক্তারবাবু বললেন, এক মাসের মধ্যে রোগ সেরে দেবেন। কিন্তু ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিষম ভয়তরাসে। জোরজার করে হাসপাতালে এনে তুলল। আর হাসপাতালের এরাও কী লাগিয়েছে আমায় নিয়ে! কত রকমের এক্স-রে ছবি তুলল। নাকের ফুটো দিয়ে পেট অবধি নল ঢুকিয়ে কচ্ছপ চিত করে রাখার মতো ফেলে রাখল পুরো একটা বেলা। ডাক্তার এসে দেখে যান, হাউস-সার্জন আসে, সিস্টার তো আছেই। তার উপরে আছে ছাত্রেরা—ও এসে নাড়ি টেপে, সে এসে চোখ টেনে দেখে। মচ্ছব লেগে গেছে।

ঝিকঝিকে সাদা দু-পাটি দাঁত মেলে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। বলেন, গাঁয়ের ভাগাড়ে শকুন পড়া দেখেছিস—সেই ব্যাপার।

একটু পরে লীলা আর সুরেশ এসে পড়ল। ইস্কুলের মিস্ট্রেসদের নিয়ে মিটিং ছিল, ঝামেলা মিটিয়ে লীলার বাসায় ফিরতে ছ'টা। সুরেশও কোথা থেকে একগাদা প্রুফ নিয়ে এসেছে আজ, দুপুর থেকে একটানা তাই দেখেছে। রোগির পথ্য দুধ-বার্লি ফুটিয়ে নিয়ে এলুমিনিয়ামের পাত্রে ঢেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বাসে যা ভিড়—তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে তবে জায়গা হল দুটো মানুষের একটু দাঁড়িয়ে আসবার।

লীলা গড় হয়ে প্রণাম করল মহিমকে। স্ত্রীর দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে সুরেশও প্রণাম করে। বলে, আমার চিঠি পেয়েছেন তবে দাদা? বাসা কোথায় জানি নে, তাই ইস্কুলের ঠিকানায় দিয়েছিলাম।

কী মধুর আলাপ-ব্যবহার! পুরানো মতামত বিসর্জন দিয়ে কেন সূর্যবাবুর অত উচ্ছ্বাস, বুঝতে পারা যায়। বিছানার ধারে বসে লীলা এখন বার্লি খাওয়াচ্ছে বাপকে। মুখ দেখে কে বলবে অত খাটনি খেটে এসেছে—যেন ফুলের বিছানা পেতে সারা দিন সে আলস শয্যায় শুয়ে ছিল। সুরেশও যে ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ প্রুফ দেখেছে, চেহারায় কথাবার্তায় ধরা যাবে না।

মহিম বলেন, মাস্টারমশায় ভীতু বলে তোমাদের নিন্দে করছিলেন। সামান্য একটু অম্বলের অসুখ, হোমিওপ্যাথিতে সেরে যেত—কী কাণ্ড লাগিয়েছ তোমরা তাই নিয়ে!

সামান্যই বটে! সুরেশ বলে, তাই হোক দাদা, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

কানে কানে বলে, ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছে।

হাউস-সার্জন ছোকরা মানুষ, অল্প দিন পাশ করে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে মহিম দেখা করলেন। রোগ ক্যান্সারই। সারবে না।

কয়েকটা এক্স-রে প্লেট নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে অপারেশনের সুবিধা হবে কিনা। নিরাময়ের আশা নেই, জীবনের মেয়াদ এক বছর দেড় বছর বাড়তে পারে বড় জোর। এর অধিক কিছু নয়।

মহিম অবিশ্বাসের সুরে বলেন, ক্যান্সারে শুনতে পাই ভয়ানক কষ্ট। এঁর তো কষ্ট কিছু দেখছি নে। হেসে হেসে কতক্ষণ ধরে গল্প করলেন।

আমরাও তাই দেখি। কষ্টের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু হচ্ছে নিশ্চয় কষ্ট, না হয়ে পারে না। চেপে আছেন। অদ্ভুত সহ্যশক্তি।

ধ্বক করে মহিমের মনে আসে, ওঁর ছাত্র চারুও অমনি। গুবরেপোকা নাভির উপর ছেড়ে বাটি উপুড় করে চাপা দিয়ে দেয়। তাতে বড় কষ্ট, স্নায়ুর উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া—পাগল হয়ে ওঠে মানুষ। চারু-দা'কে তাই করেছিল নাকি। তিনি সর্বক্ষণ হেসেছিলেন, পুলিশ একটা কথাও বের করতে পারে নি।

পরের দিনও এলেন মহিম। প্রায়ই দেখতে আসেন। ডাক্তার মহিমকে বলেন, অপারেশনের কথাটা ওঁকে শুনিয়ে দেবেন। উনি রাজি আছেন কিনা।

সূর্যকান্ত বলেন, দরকার হলে করবেন বইকি। কিন্তু দরকার আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা এখন যা-ই ভেবে বলুন, এসব মানুষের দরকার থাকে না কোন-কিছুতে। কোন দিন ছিল না। ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামান না—ইহকালে যেমন, পরকালের জন্যও তেমনি কোন প্রার্থনা নেই কারো কাছে। মানুষের যাতে ভাল হয়, তাই চিরদিন করে এসেছেন। কোন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, না করে পারবার জো নেই।

অপারেশন আর হল না। এর পরে ক'টা দিন রোগির বেহুঁশ অবস্থায় কাটল। আধেক চক্ষু মেলে নিঃসাড় হয়ে থাকেন, ঘুম কি

জাগরণ বোঝা যায় না। মহিম কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করেন, মাস্টারমশায়, আমি—আমি মহিম। চিনতে পারেন ?

হয়তো বা অতি-অস্পষ্ট হুঁ—আওয়াজ একটু এল।

বাসার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন মহিম। বিকালবেলা ইস্কুল থেকে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছেন, খালি-পা উচ্ছৃঙ্খল-চুল গায়ে শুধুমাত্র একটা আলোয়ান সুরেশ এসে বলে, চলুন দাদা—

সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই। ক'দিন থেকেই এখন-তখন অবস্থা। পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলে মহিম বিনা বাক্যে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা : তোমাকেই আসতে হল ?

সুরেশ বলে, লীলাও বেরিয়েছে। কাঁধে করে নিয়ে যাবার চারটে মানুষ চাই অন্তত। কলকাতার মতন শহরে তা-ও জোটানো দায় হয়েছে।

জুটে গেল অবশ্য। সুরেশকে যেতে বলে দিয়ে মহিম পুরানো মেসে চললেন। মড়ি পোড়ানোর কাছে ভূদেববাবুর উৎসাহ খুব—এক কথায় তাঁকে রাজি করানো গেল। তিনি কাঁধ দেবেন। রাত্তিরের টুইশানি কামাই হবে। হোকগে। তা বলে এত বড় একজন শিক্ষকের গতি হবে না ? কাঁধে গামছা ফেলে মহিমের পিছু পিছু ভূদেব ট্রামে গিয়ে উঠলেন।

লীলাও কোথা থেকে আর দুটিকে জুটিয়ে এনেছে। একসময়ে ছাত্র ছিল তারা সূর্যবাবুর। পুরুষ পাঁচজন হল—আবার কি! আর মেয়ে লীলা।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে হাসপাতালের ছাড় করে বেরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। মড়ি-বওয়া খাটিয়া আনল সুরেশ। অত্যন্ত ছোট, দামে যত সস্তা হয়। সূর্যকান্ত ছোটখাট মানুষটি—কুলিয়ে যাবে একরকমে। বরঞ্চ ভালই হল, হালকা জিনিস কম মানুষে

বয়ে নিতে কষ্ট হবে না। চারজনে কাঁধ দিয়েছে, আর একজন পিছু পিছু যাচ্ছে। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তার সঙ্গে বদলাবদলি হবে।

শ্মশানে সেদিন বড় জাঁক। মস্ত এক বড়লোক এসে পড়েছেন ভবলীলা সাঙ্গ করে। লোকারণ্য। কীর্তনের দল তিন-চারটে। বৃষ্টির ধারার মতো খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এসেছে সমস্ত পথ। শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে কয়েকটা ছোকরা এখন ঘাটের বাঁধানো চাতালের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে, আর হাসাহাসি করছে: নেপাল-দা গোপাল-দা বড্ড যে দিলদরিয়া! বুড়ো বাপ এদ্দিনে রেহাই দিল, সেই আনন্দে নাকি?

আর একজন বলে, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমার ভয় করছে মাইরি। মড়ি পাশমোড়া দিয়ে বসে হয়তো বা হুমকি দিয়ে উঠবে। চিরকেলে কঞ্জুষ মানুষ, ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসের উপরে কোন দিন চড়েন নি—সেই তিনি চোখ বুঁজলেন, অমনি যেন দেখিয়ে দেখিয়ে সারা পথ পয়সার হরির লুঠ দিয়ে এল। পরলোকে ওঁর কি ভাল ঠেকছে একটুও?

মোটরগাড়ি সঙ্গে এসেছে অমন বিশখানা। সামনের রাস্তাটার আগাগোড়া জুড়ে আছে। বড় দরের আত্মীয়কুটুম্ব ও মেয়েরা এসেছে গাড়িতে। গয়না কত মেয়েদের গায়ে—ঝিকমিক করছে। নজর করলে পাউডারের প্রলেপও দেখা যাবে মুখের উপর। পাঁচ-দশ জন চোখ মোছামুছি না করছে এমন নয়। ওদিকে গঙ্গার একেবারে উপরে ধুনি জ্বেলে এক সাধু বসে আছেন। সাধুবাবার কাছাকাছি কয়েকটা বাবু মানুষ পকেট থেকে বুঝি বোতল বের করে বসল।

একটা গাছের তলায় সূর্যকান্তকে নামিয়ে রেখে মহিম আর ভূদেব যাচ্ছেন ডেথ-সার্টিফিকেট দেখিয়ে দাহের জন্য অফিসে টাকা জমা দিতে। এই সমারোহ দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। ভূদেব বলে উঠলেন, আমাদের মাস্টারমশায় এসেছেন, কেউ একেবারে টেরই পেল না।

মহিম বলেন, জীবন চুপিসারে কাটালেন, মরণেও ঠিক তাই। যে আমলের গ্রাজুয়েট, ইচ্ছে করলে কেষ্টবিষ্টু একজন হতে পারতেন। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে ছেলেপুলে নিয়ে চিরকাল পড়ে রইলেন।

ঘোষগাঁতির বাড়ি সেই একদিন কথাবার্তা হয়েছিল, মহিমের মনে পড়ে যায়। খুব বড় শিল্পী সূর্যকান্ত—কচিকোমল শিশুদের হাতে নিয়ে বছরের পর বছর ধীরে ধীরে মানুষ গড়ে তুলতেন। শ্রমের পুরস্কার অর্থে নয়, সৃষ্টির সফলতায়। সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার বোধ হয় চারু-দা। চারু-দার কাজকর্ম নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখে। গুলিগোলায় ডর ছিল না, ডরাতেন কেবল প্রশংসা। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত এক বুড়িকে দিনরাত্রি সেবা করেছিলেন, কেমন করে সেটা চাউর হয়ে গেল। চারু-দা ঘাড় নেড়ে মহাবেগে না-না—করতে লাগলেন : আমি কিছু করি নি, আমি কিছু জানি নে। কিন্তু অনেকে সমস্বরে একই কথা বলছে—চারু-দা'র অবস্থা তখন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার মতন। মুখ-চোখ রাঙা করে সকলের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। এই একটি দিনের ব্যাপার দেখেছিলেন মহিম।

সূর্যকান্তও তাই। গুরুর এবং ছাত্রের জীবনে এক মন্ত্র—আত্ম-বিলুপ্তি। আধময়লা জামা-কাপড়, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—হঠাৎ দেখে কে বলবে মানুষটির কিছুমাত্র মূল্য আছে। কথা বলতে যাও, মিনমিন করবেন অচেনা লোকের কাছে। কিন্তু ক্লাসের ছাত্র হয়ে পড়ানো শোন একদিন এই মানুষটির—সে আর-এক মূর্তি। গলার স্বরও যেন সেই সময়টা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু সে হল গ্রাম্য ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ক্লাস, বাইরের গণ্যমান্যেরা কী খবর রাখেন!

মহিম ও ভূদেব ইতিমধ্যে অফিসে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কাউন্টারের মানুষটির হাড়সর্বস্ব আগুনে-ঝলসানো চেহারা। চিতার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে এমনি হয়েছে বোধ হয়। আজকের আগন্তুক ওই

বড়লোকটির প্রসঙ্গ হচ্ছে পাশের একজনের সঙ্গে : হুঁঃ, ভারি দেমাক দেখাতে এসেছে! বিহারের এক জমিদারকে নিয়ে এল সেবার— একমানুষ সমান চন্দনকাঠের চিতে, আর টিন টিন ঘী। হাতের হীরের আংটি ঘুরিয়ে এরা বলে কিনা, ডবল-চিতের খরচা ধরে নিন। আরে ডবল হোক যা-ই হোক, আমকাঠের উপরে তো নয়। আমার কাছে কেউ যেন ফুক্কুড়ি করতে না আসে। আজকের চাকরি নয়। সকাল নেই রাত্রি নেই, চিতে আর চিতে। ষাট-সত্তর হাজার হয়ে গেছে। পুরো এক লক্ষ পুড়িয়ে তারপর নিজে একদিন চিতের উপর চড়ে বসব। সেই শেষ।

সূর্যকান্তর কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে ঘাড় তুলে মহিমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, পুরো না ঠ্যাং-ভাঙা?

মহিম জানেন না ব্যাপারটা। বহুদর্শী ভূদেব বুঝিয়ে দিলেন। মড়ি পোড়ানোর দুই রকম রেট। এক হল সাড়ে-তিন টাকা— তাতে ঠ্যাং ভেঙে পোড়ানো হবে। ঠ্যাং ভাঙার দরুন মড়ির দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে চিতার সাইজ ছোট হয়, কম কাঠ লাগে। সস্তা সেইজন্য। পুরোপুরি লম্বা করে শুইয়ে পোড়াবেন তো আর এক টাকা বেশি—সাড়ে-চার। কী ভাবে পোড়াতে চান বলুন— সেইমতো রশিদ কাটা হবে।

ফিরে এলেন তাঁরা পরামর্শের জন্য। সুরেশ-লীলাও আনাড়ি— এ সম্বন্ধে সঠিক জানা ছিল না, ফুল কিনে বাড়তি খরচ করে ফেলেছে। এ-ওর মুখে তাকাতাকি করছে। মহিম পকেট থেকে আনা আষ্টেক বের করে দিলেন। অফিসে গিয়ে বলেন, ঠ্যাং-ভাঙার রশিদ কাটুন মশায়। সাড়ে-তিন টাকা।

চিতা জ্বলল। মহিমের মনে হচ্ছে, প্রাচীন এক আদর্শবাদ আগুনে তুলে দিয়েছেন। অত বড় ভারতী ইনস্টিট্যুশন—এক গঙ্গাপদবাবু ছাড়া শিক্ষক তো মেলে না সেখানে। মিস্ত্রি-কারিগর সকলে। ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে—ক্বচিৎ বা মাটি খুঁড়ে

কঙ্কালের অল্পসল্প পাওয়া যায়। কৃষ্ণকিশোর, সূর্যকান্ত একে একে সবাই তো চলে গেলেন। লোকের মুখে মুখে গল্প হয়ে ঘুরবেন কিছুকাল।

॥ উনিশ ॥

সতের বছর কেটেছে তারপর। প্রথম সন্তান মেয়ে—মহিম নাম রাখতে চাচ্ছিলেন সরস্বতী। সে নাম বাতিল করে সরসীবালা শৌখিন নাম দিল দীপালি। বলে, নামে তো পয়সা খরচ নেই, তবে বাগড়া দাও কেন? সেকেলে নামে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতেই এগুবে না। বিয়ের মুখে নাম বদল করতে হবে। সেই ঝামেলা গোড়াতেই চুকিয়ে রাখা।

দীপালির পিঠে ছেলে—শুভব্রত। তারপর যমজ মেয়ে হল। দুটোই মরে গেছে। তাদের পরে পুণ্যব্রত—চার বছরেরটি এখন। পুণ্যব্রত হল, আর মহিমের মা সেনগিন্নিকে গঙ্গায় নিয়ে গেল তার ঠিক দুটো দিন পরে। সরসীবালার শরীরও ভাঙল সেই থেকে—জ্বর, গেঁটেবাত, লিভারের ব্যথা—উপসর্গ একটা না একটা আছেই। অনেক দিন বাদ দিয়ে এই এবারে মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আঁতুড় থেকে বেরিয়ে সরসীবালা উঠে বসতে পারে নি আর একদিনও। ঘুসঘুসে জ্বর সর্বক্ষণ নাড়িতে। তেজপাতার মতন ফ্যাকাসে চেহারা, শরীরে একফোঁটা রক্ত নেই—উঠতে গেলে পড়ে যায়। কোলের মেয়েটা কিন্তু দিব্যি হয়েছে। ধবধবে রং—মেমদের মতো। সরসীবালা এই অবস্থার মধ্যেও দীপালির সঙ্গে নামকরণের কথা বলে, রূপালি দিলে কেমন হয় রে? দীপালির বোন রূপালি—কি বলিস?

মা শয্যাশায়ী, সংসার দেখবার দ্বিতীয় মানুষ নেই। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে তারপর থেকে দীপালি আর ইস্কুলে যায় না। আঁচলে

চাবি বেঁধে গিন্নিপনা করে বেড়ায়। শুভব্রত পড়ে ভারতী ইনস্টিট্যুশনে। মাস্টারের ছেলে বলে মাইনে লাগে না। বইও কিনতে হয় না, মাংনা পাওয়া যায়। ইস্কুলের শিল-মারা চিঠি নিয়ে পাবলিশারদের কাছে গেলেই হল: একটি গরিব মেধাবী ছাত্রের জন্য একখানা করিয়া বই দিবেন। বাপ-বাপ বলে তারা দেবে, নয়তো আগামী বছর বই কাটা পড়বে লিস্টি থেকে। মেধাবী ছাত্র শুভব্রত, সেটা কিন্তু মিথ্যা নয়। ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। চেক চালাচালি করতে হয় না, বিনা তদ্বিরেই হয়ে থাকে।

কিন্তু মুশকিল হল সকলের ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে। যার নাম রূপালি। এককোঁটা মায়ের দুধ পায় না। দিন দিন সলতে হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারদের মধ্যে পতাকীচরণ মানুষটা তুখড়। যত ছাত্র আর গার্জেন, নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখেন তিনি সকলের। দুনিয়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে মেলামেশা। করেনও তিনি পর-অপরের জন্য। মহিম তাঁকে গিয়ে ধরলেন: বাচ্চাকে তো বাঁচাতে পারি নে পতাকীবাবু। ওর মা'র যা দেখছি, নিজের অসুখের যন্ত্রণার চেয়ে বাচ্চার জন্য দুঃখটা বেশি। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল কাল। তারপরে সারা রাত্রি আর ঘুম হল না। সত্যি, কী জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের! পড়ানো আর পড়ানো—সংসারের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখার সময় হয় না।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, ঘাঁতঘোঁত সমস্ত আপনার জানা। একটা উপায় করে দিন পতাকীবাবু। দিতেই হবে।

পতাকী হাসিমুখে নির্বিকারভাবে বললেন, কি চাই সেটা তো খুলে বলবেন—

গ্লাকসো কিংবা ঐ জাতীয় কিছু।

ক'টা চাই?

মহিম অবাক হয়ে বলেন, লোকে তো চৌপর দিন মাথা খুঁড়ে একটাই যোগাড় করতে পারে না।

আবার কায়দা জানলে ডজন ডজন যোগাড় হয়ে যায়। আচ্ছা, কাল বলব আপনাকে।

পরদিন পতাকী বলেন, হবে। দুটো বা তিনটে আপাতত।

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে মহিম বলেন, ও, বাঁচালেন ভাই। শিশুর প্রাণদান দিলেন।

পতাকী বলেন, দরকার হলে পরে আরও পাবেন। কিন্তু দামটা কিছু চড়া।

মহিম ভীতস্বরে প্রশ্ন করেন, কত? আড়াই টাকা তিন টাকার জিনিস ছ-সাত টাকায় কিনছেন নাকি কেউ কেউ। মরি-মরি করে তা-ই না হয় দেওয়া যাবে। প্রাণের বড় কিছু নয়।

পতাকীচরণ দরাজ ভাবে হাসতে লাগলেন : কার কাছে শোনেন মশায় ছ'টাকায় পাওয়া যায়, কে এনে হাতে তুলে দিচ্ছে? বাঘের দুধ হয়তো জোটানো যায়, কিন্তু এই সমস্ত ফুড কি দরকারি অষুধ-পত্তর একরত্তি বাজারে পাবেন না। যদি পান, ভেজাল মাল। কিন্তু দরদাম আমি টাকার হিসাবে বলছি নে। টেস্ট-পরীক্ষা দিয়েছে—পাশ করিয়ে একেবারে 'সেণ্ট আপ' করে দিতে হবে ছেলেটাকে।

ফিসফিস করে পতাকীচরণ ছেলের নাম বললেন। অলক-কুমার ঘোষ।

মহিমের চমক লাগে : আরে সর্বনাশ, সেই দামড়া ছেলেটা তো! ছেলে আর বলছেন কেন তাকে—বয়সের গাছ-পাথর নেই। ম্যাট্রিক দিতে চায়, কিন্তু বি. এ. পাশ করলেই মানান হত বয়সের পক্ষে।

পতাকী বলেন, সেই ম্যাট্রিকও তো দিতে দিচ্ছেন না আপনারা। টেস্টে ফেল করিয়ে আটকে রাখবেন। বয়স বেড়ে গেছে, আরও বাড়বে। আবার তা-ও বুঝুন—বাপের কালোবাজারি কারবার। সেই বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে মাল সরিয়ে এনে দেওয়া। একফোঁটা পুচকে ছোঁড়া হলে পারত এই কাজ?

মহিম বলেন, আপনি টাকায় দেখুন পতাকীবাবু। ছ'টাকায় না হল তো আরও কিছু বাড়ানো যাবে।

পাবেনই না মোটে। হাত ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে পতাকী বলেন, বিশ বছর মাস্টারি হতে চলল, এখনো সলজ্জ নববধূটি! ঝামেলা বেশি-কিছু নয়—আজেবাজে ইস্কুলে ফেল করে করে বয়স বেড়ে গেছে। কালাচাঁদবাবুকে টিউটর রেখে তবে এদ্দিনে এই ইস্কুলে ঢুকতে পারল। গোড়া বেঁধে সব কাজকর্ম। কালাচাঁদবাবু হিস্ট্রির খাতা দেখছেন, একশ'র কাছাকাছি তো পাবেই। নবীন পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত—কালাচাঁদবাবু, দেখেন নি, ঘুণ হয়ে বসে তাঁর খবরের কাগজের ব্যাখ্যা শোনেন—সেটা এমনি নয়। পাশের নম্বর আদায় হয়ে যাবে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে। বাংলায় তো আপনাআপনি পাশ হয়ে যায়, ফেল করানোই বরঞ্চ মুশকিল। বাকি আর কি রইল তবে? অঙ্ক আর ইংরেজি। অঙ্ক আপনি দেখছেন, ইংরেজি দাশুর কাছে। নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে দাশুর পায়াভারি—কালাচাঁদবাবুর উপর রাগও আছে, ওকে টুইশানি জুটিয়ে দেন নি। আরে, ফাঁকিবাজ মাস্টার—ছেলেরা চায় না, কালাচাঁদবাবুর কি দোষ? সে যাই হোক, দাশুরটা আপনাকে দেখতে হবে মশায়। কালাচাঁদবাবু পড়ান, সেটা টের না পায়। টের পেলে আর হবে না। চেষ্টা করে দেখুন, না হলে কী করা যাবে! এক সাবজেক্টে ফেল—কালাচাঁদবাবুই তখন হেডমাস্টারকে গিয়ে বলবেন।

মহিম দোমনা হলেন। ওর চেয়ে ভাল ছেলেরা পড়ে থাকবে, আর তদ্বিরের জোরে ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে যাবে অলক। অন্যায়, অধর্ম।

মনের কথাটা কেমন করে বুঝে নিয়েই যেন পতাকী বললেন, আরও দশজনার গরজ আছে বেবি-ফুডে, সকলকে বাদ দিয়ে আপনি নিচ্ছেন—এটাও কিছু ধর্মকাজ নয়। এত খুঁতখুঁতানি বলেই আমাদের মাস্টারদের কিছু হয় না। বলি, ব্যাপার হল তো কিছু মার্ক

দেওয়ার। নিজে দেবেন, আর কিছু পাইয়ে দেবেন। সত্যি কথা বলুন মহিমবাবু, দেন নি কোনদিন কারো নম্বর বাড়িয়ে? খাতিরে দিতে হয়েছে। এখানেও তাই। বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচানোর খাতিরে দেবেন।

···অবোধ শিশু ক্ষিধের জ্বালায় সারারাত্রি কেঁদেছে কাল, চিলেকোঠা থেকে শুনতে পেয়ে মহিম নিচে নেমে এলেন। রোগার্ত্ত সরসীবালা কুক ছেড়ে দিয়ে কাঁদছেন। ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দীপালিও ভেবে পায় না, কী করা উচিত। উনুন ধরিয়ে বার্লি ফুটিয়ে তাই খানিক গেলানো হল বাচ্চাটাকে···

মহিম রাজি। অলক ছেলেটা বিনয়ী, কথাবার্ত্তা বলে খাসা। বলল, লজ্জার ব্যাপার সার। আপনি নেবেন, আপনার লজ্জা; আমি দেব, আমারও লজ্জা। শখের ব্যাপার তো নয়, তাহলে একাজে যেতাম না। অসুধ না হলেও পথ্যি। খালের উপর বটগাছ আছে, সন্ধ্যের পর বটতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। গায়ে আলোয়ান থাকে যেন সার।

খিদিরপুর বাজারের পিছন দিকে খুব নিরিবিলি জায়গা। জায়গাটা অলক ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। রাতের টুইশানি সেদিন কামাই করতে হল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরোয় নি—এখন এক-আধবেলা কামাই করলে তত বেশি আপত্তি হয় না। দাঁড়িয়ে আছেন মহিম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, রাস্তা নয় বলে আলো দেয় না এদিকটা। ঝাঁকড়া বটগাছ মাথার উপরে ডালপালা মেলে আছে। অন্ধকারের মধ্যে সাঁ করে অলক চলে এল। ফিসফিস করে বলে, তিনটে হল না সার, আজকে দুটো নিয়ে যান। আলোয়ান জড়িয়ে ফেলুন গায়ে, আলোয়ানের নিচে ঢেকে দিন। বেরিয়ে পড়ুন, দেরি করবেন না। পুলিশ অনেক সময় ঘাপটি মেরে থাকে।

কৌটা দুটো পর পর কাগজে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছে—

আলোয়ানের নিচে হাতে ঝুলিয়ে নিতে অসুবিধা নেই। এদিকটায় মহিমের আসা-যাওয়া কম। ঘুরে এসে রাস্তায় পড়লেন। হনহন করে চলেছেন। পিছন থেকে কে ডাকছে, মহিম না? দাঁড়াও মহিম, অত ছুটছ কেন? তোমায় আমি খুঁজছি।

সাতু ঘোষ। প্রথমটা মহিম চিনতে পারেন নি। সাতু ঘোষ ইদানীং দাড়ি রাখেন—পাকা দাড়ি। নৈমিষারণ্যবাসী পৌরাণিক ঋষিতপস্বীর মতন। এমন চেহারায় একনজরে চিনবেন কি করে?

সাতু বলেন, আমি খোঁজাখুঁজি করছিলাম। তারপরে শুনি, ভারতী ইস্কুলের মাস্টার হয়েছ, প্রাইভেট পড়ানোয় খুব নাম করে ফেলেছ। ইস্কুল থেকে তোমার বাসার ঠিকানাও এনে রেখেছি। যাব-যাব করছিলাম। আমার ছেলেটাকে এবারে ওই ইস্কুলে ঢুকিয়েছি। জানব কি করে তুমি ওখানে—তাহলে তো কম ঝামেলায় হয়ে যেত। চালানি কারবার একটা ফেঁদেছি এই বাজারে। এস আমার সঙ্গে। কথা আছে।

বৃহৎ টিনের ঘর। সামনের দিকে তিন-চারটা খোপ—একটায় অফিসের মতন চেয়ার-টেবিল সাজানো। সাতু ঘোষ এক চেয়ারে বসে পড়লেন। মহিমকে বলেন, মেসের সাইনবোর্ডে মার্চেন্টস লিখেছিলাম, মনে পড়ে? সেই গোড়ার আমলেই এত সব ভেবে রেখেছি। একটা একটা করে সবগুলো ফলে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কার্স লিখেছিলাম—ব্যাঙ্কও হয়েছে একটা। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক—নাম শোন নি? বোসো—বোসো না হে ভাল করে। ম্যানেজার, এই মহিমকে আমিই প্রথম কলকাতায় নিয়ে আসি। আজকে গণ্যমান্য হয়েছে। এক কাপ চা দিতে বল তাড়াতাড়ি।

ম্যানেজার খুব বিচলিত। বলে, এ যে দিনে-ডাকাতি হতে চলল। এক ডজন গ্লাকসো ঘণ্টা খানেক আগে বের করে দিয়েছি। ক্যানিঙের ক্ষুদিরাম সাহার ঘরে উঠবে—এখন মিল করতে গিয়ে দেখছি দুটো কম।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, ন্যাকামি রাখ ওই সমস্ত। এটা যাচ্ছে, ওটা যাচ্ছে—যত চোরের আড্ডাখানা হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে যায় কোথায়? কোটোর গায়ে পাখনা গজায় নি, উড়ে যেতে পারে না। কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবে না, সার্চ করব সকলকে। শীতকাল বলে মজা হয়েছে—আলোয়ান গায়ে ঘোরাফেরা করে, তার নিচে মাল সরায়। কে কে ছিল ও-ঘরে?

ক্যাশিয়ার চুণিবাবু—

তাঁকে বাদ দাও। আর কে?

হাজারি আর কুলচন্দ্র বওয়াবয়ি করছিল। আর শুনলাম খোকাবাবু একবার এসে ঢুকেছিলেন।

সাতু ঘোষ ভ্রূকুটি করলেন: খোকাবাবু মানে তো অলক? বাড়িতে পড়াশুনো করবে, সে কি জন্য আসতে গেল এখানে? মানা করে দিয়েছি তো, গুদামের ওদিকটা তাকে ঢুকতে দেবে না—কী দরকার, আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

ম্যানেজার বলে, আমি তখন ছিলাম না। আর চুণিবাবুকে জানেন তো—খোকাবাবু ঢুকতে গেলে পথ আটকাবেন, তাঁর কি সেই তাগত আছে?

আচ্ছা, খুঁজে দেখগে ভাল করে—

বলে ওই প্রসঙ্গ চুকিয়ে দিয়ে সাতু ঘোষ মহিমের দিকে তাকালেন: জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।

ছেলে পড়ানো আছে। ছুটতে হবে এখনই।

সাতু জিজ্ঞাসা করেন, এদিকে কি জন্যে এসেছিলে?

অদৃষ্ট ভাল, মিথ্যেকথা চট করে এসে গেল মহিমের: ডায়মণ্ডহারবার রোডে এক বন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম। অসুখ তার।

সাতু ঘোষ বলেন, ভাল হল তোমায় পেয়ে। শোন, আমার ছেলে টেস্ট দিয়েছে তোমাদের ইস্কুলে। তাকে পড়াতে হবে।

কালাচাঁদবাবু তো পড়িয়ে থাকেন।

বোলো না, বোলো না। ওরকম ফাঁকিবাজ জন্মে দেখি নি। এটা-সেটা লেগেই আছে, কামাই-এর অন্ত নেই। ওঁকে মাস্টার রেখে একমাসের মাইনে অগ্রিম দাদন দিয়ে তবে ভর্তি করতে পেরেছি। এখনো টেনে যাচ্ছি—টেস্ট দিয়েছে, ফাইন্যালেও যদি গিয়ে বসতে দেয়। কালাচাঁদবাবুর মাইনে আমি পড়ানোর হিসাবে ধরি নে, তদ্বিরের খরচা। তা দেখ, দু-জন মাস্টার রেখে পড়াবার ক্ষমতা আছে আমার। উনি পড়ালেন না পড়ালেন গ্রাহ্য করি নে। তোমায় পড়াতে হবে ভাই।

বলেন, এক ছেলে ওই আমার। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই যে গ্লাকসোর কথা শুনলে—কৌটো দুটো অন্য কেউ নয়, অলকই সরিয়েছে। তোমার কাছে গোপন কি—কারবারে যথেষ্ট উন্নতি করেছি, কিন্তু মনে শান্তি নেই। ছেলেটা চোর হয়ে গেল, হামেশাই জিনিসপত্র সরায়। সিগারেট ফোঁকে, সিনেমায় যায়, অসৎসঙ্গে পড়ে গেছে।

কাতর হয়ে বলতে লাগলেন, তুমি সাধুচরিত্র। ম্যানেজারকে দেখলে—আমার সঙ্গে থেকে ওই লোকও কলকাতার উপর একখানা বাড়ি তুলেছে। তোমারই তো এসব হবার কথা। কিন্তু টাকাপয়সা হাতের ময়লা তোমার কাছে। বড় আদর্শ নিয়ে সৎ জীবন যাপন করছ। ওতেই সুখশান্তি—বুড়ো বয়সে আজকে তা বুঝতে পারছি। ছেলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করে ভালই। কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামাই নে। তোমার দৃষ্টান্তে অলক মানুষ হয়ে উঠুক, এই আমি চাই। তুমি ওর ভার নাও। কথা না পেলে উঠতে দেব নে ভাই।

কথা দিয়ে আসতে হল। নয়তো হাত জড়িয়ে ধরতে যান (হাতে কৌটা দুটি)। সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি কথা দিতে হয়।

টুইশানি ইদানীং আসে অনেক। শুষ্ক মুখে হাসি টেনে এনে অন্য মাস্টাররা বলেন, টুইশানি-রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট। আগে ছিলেন

সলিলবাবু, সেই সিংহাসনে এখন মহিমবাবু বসেছেন। সত্যি, খুব জমে গেছে। বিশেষ করে এই সময়টা—টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। টিউটরদের লগনসা হল এই তিনটে মাস। কত রকমের কত টুইশানি আসে, কিন্তু অলকের এই টুইশানি এসে গেল মজার অবস্থায়। সাধুত্বের প্রশংসা করছেন সাতু ঘোষ। আর সেই সময়ে আলোয়ানের নিচে বুকের উপর গ্লাকসোর কৌটা দুটো চেপে ধরে আছেন, বুক ধড়াস-ধড়াস করছে মহিমের। হাঁ—বলে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এসে বাঁচলেন।

একদিন দাশুর বাড়ি গেলেন অলকের ইংরেজির তদ্বিরে। ভাল ভাল খোশামুদি কথা মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছেন। আগের মতন শুধু দাশু নয়—দাশুবাবু বলতে হবে।

এত বড় ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলে দাশুবাবু, ভগবান তোমায় বড় করেছেন। বড্ড খুশি আমরা সকলে।

ভগবান এমনি-এমনি বড় করলেন? খেয়ালখুশি মতো?

ইঙ্গিত বুঝে মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, গুণ না থাকলে কি কেউ বড় হয়? গুণীর উপর ভগবানের দয়া। তবে দয়াটা আদায় করে নিতে হয়। তোমার ভাই গুণ রয়েছে, সেই সঙ্গে উদ্যোগও রয়েছে। এই বয়সে সকলের মাথার উপরে। একটা দরবারে এলাম দাশুবাবু। আমার ছাত্রের পাশ-নম্বরটা করে দিতে হবে।

বড় পদে উঠে গিয়ে দাশু ন্যায়নিষ্ঠ হয়েছেন। এক কথায় কেটে দিলেন: নম্বর দেবার মালিক আমি তো নই। নম্বর সে নিজে নেবে, নম্বর আছে তার খাতায়। যেমন লিখেছে, ঠিক সেই রকম পাবে।

আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, অন্য কথা থাকে তো বলুন। প্রবীণ শিক্ষক হয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন, দেখে দুঃখিত হলাম। এসব কথা উপরে চলে গেলে চাকরি নিয়ে টান পড়বে।

মহিমের হঠাৎ কী রোখ চেপে গেল, উচিত জবাব না দিয়ে পারলেন

না। বললেন, উপর অবধি কেন যাবে দাশুভাই? তেমন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে তো নয়। প্রথম যেবার এখানে আসি—ইস্কুলের হালচাল কিছু জানি নে, মাস্টারি মহৎ কর্ম বলে মনে করি, প্রেসিডেন্টের বাড়ি সর্বদা যাতায়াত তখন—তুমিই একটা ছাত্রের ব্যাপারে গিয়েছিলে আমার কাছে। সেসব কথা প্রেসিডেন্ট অবধি যায় নি, এখন কি জন্য তবে যাবে?

দাশুর কিছুই মনে পড়ছে না।

মহিম বলেন, ছাত্রের নামটাও বলে দিচ্ছি। মলয় চৌধুরি। ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো ছেলে। সেই ছেলে একদিন পায়খানায় খারাপ কথা লেখার জন্য ধরা পড়ে গেল।

দাশু বলেন, ও। কিন্তু নম্বর কমানোর জন্য বলেছিলাম, বাড়াতে বলি নি তো। তাতে দোষটা কি হল? একশ টাকা পাওনার জায়গায় পঞ্চাশ নিলে দোষ হয় না, পঞ্চাশের জায়গায় একশ দাবি করলেই দোষ দাঁড়ায়।

কি ভেবে দাশু উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির মাথা থেকে খাতার বাণ্ডিল নামালেন।

কোনটা আপনার ছাত্র?

অলককুমার ঘোষ—এই যে।

ছত্রিশ পেলে পাশ, সাইত্রিশ করে দিলাম। হল তো?

ভিতরে কি আছে, দেখলে না তো!

দাশু বলেন, দেখতে হয় না। ছেলেদের নাড়িনক্ষত্র জানা। ক্লাসে দিনের পর দিন দেখছি—এখন আবার খাতা খুলে নতুন কি দেখব? এই অলক ঘোষ পাবে সাত কি আট—ফেল মানে একেবারে জবর রকমের ফেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সামনে পাতায় পাতায় নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। আটের উপরে সিকি নম্বর পায় তো বুঝতে হবে টুকে মেরেছে।

কেল্লা ফতে করে মহিম প্রসন্নচিত্তে ফিরলেন। টুইশানিতে পারত-

পক্ষে তিনি না বলেন না। টাকার বড় প্রয়োজন। মায়ের শ্রাদ্ধ বেশ জাঁকিয়ে করেছিলেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধশান্তি হল। মৃতের কল্যাণে ভূরিভোজন—এখানকার বাসায় মাস্টারমশায় সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, আবার আলতাপোল গিয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের সমাজ ডাকলেন। মোটা দেনা হয়েছিল, টুইশানির টাকায় সমস্ত শোধ করে এনেছেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, তার বিয়ের জন্য সঞ্চয় এবারে। পাখি যেমন বাসার জন্য খড়কুটো বয়ে আনে, মহিম তেমনি দশ বাড়ি পড়িয়ে এখান থেকে দু-খানা ওখান থেকে আড়াইখানা নোট এনে এনে জমাচ্ছেন। মবলগ টাকার ব্যাপার। কন্যাদায় চুকে গেলে তার পরে আবার ছেলের দায়। শুভব্রতকে মানুষ করতে হবে। নিজেদের যত কষ্টই হোক, ছেলের শিক্ষা-ব্যাপারে কৃপণতা করবেন না। যতদূর পড়তে চায় পড়বে। ছেলে মানুষ হলে দুঃখ ঘুচে যাবে তাঁদের।

॥ কুড়ি ॥

ডি-ডি-ডি অবসর নিয়েছেন অনেক দিন। নতুন হেডমাস্টার এখন—কমবয়সি চটপটে মানুষ। পাশ করানোর ব্যাপারে মহিমের দক্ষতা তাঁরও কানে গিয়েছে। টেস্ট পরীক্ষায় ছেলে এক বিষয়ে কম নম্বর পেয়েছে—হেডমাস্টার বলে দিলেন, মহিমবাবুকে ধর, উনি যদি ভার নেন, পাশ করিয়ে দেবেন আমার কাছে বলে যান, তবে তোমায় পাঠাতে পারি। হেডমাস্টারের কাছ থেকে এসে ছেলে মহিমকে ধরে। হাসতে হাসতে বিপুল আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মহিম বলেন, হেডমাস্টার মশায় জানেন কিনা! তিনি তো বলবেনই। কিন্তু কতজনের ভার নেব, বল্‌ দিকি! মেরে ফেলবি নাকি আমায় তোরা?

আপনি বললে তবেই হেড-সার পাঠাবেন। বলে দিন কবে থেকে যাবেন।

মহিম আপাতত তা-না না-না করে ছেড়ে দিলেন। ঘুরুক দুটো-একটা দিন, দর উঠুক। নাছোড়বান্দা ছাত্র পরের দিন বাড়ি থেকে অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে আসে। বাবা, কাকা কি দাদা।

মহিমবাবু আপনি? নমস্কার! চোখে না দেখেও নাম জানি খুব। ছেলে বলে, আপনি যাদের পড়ান তাদের কেউ ফেল হয় না। অফিস কামাই করে এসেছি, অসিতের অঙ্কটা আপনি না দেখলে কিছুতে হবে না।

মহিম বলেন, আপনারা আগে কোথায় থাকেন বলুন তো? ভাল পড়াচ্ছি কি এই টেস্টের রেজাল্ট বেরনোর পর থেকে? মার্চের প্রথম হপ্তায় ফাইন্যাল—এর মধ্যে কি শেখাব, আর কতই বা নম্বর পাওয়াব?

অভিভাবক বলেন, শেখাতে হবে না মাস্টারমশায়। পাশ-টাশ করে নিয়ে কপালে থাকে তো ধীরেসুস্থে পরে শিখবে। শেখার কি শেষ আছে জীবনে? নম্বর পেলেই হল—টায়েটোয়ে পাশের নম্বরটা নয়, তার কিছু উপরে।

আরে মশায়, নম্বর দেবে তো য়্যুনিভার্সিটি। নম্বর কি আমার বাক্সে তোলা রয়েছে যে বের করে এনে দিলেই হল!

অভিভাবক হেসে বলেন, ছেলে যেমনধারা বলে, তাতে তো মনে হয় তাই—আপনার বাক্সের নম্বর।

কাজের কথা এবারে, মহিম গম্ভীর হলেন: কম সময়ের ভিতর কাজ দেখাতে হবে। এর আলাদা রেট—কণ্ট্রাক্টের কাজের মতন।

রেট শুনে অভিভাবকের চক্ষু কপালে ওঠে: শিক্ষক আপনারা, ছাত্র-শিক্ষা দিয়ে পুণ্যকর্ম করছেন। নিতান্ত কাটথ্রোটের মতন হয়ে যাচ্ছে যে মাস্টারমশায়।

দু-বছর ধরে টিউটর রেখে যা পেতেন, তিনটে মাসে তাই আদায়

হয়ে যাচ্ছে। মাইনেটা ছু-বছরের হিসাবে ধরুন, খুব সস্তাই ঠেকবে।

সত্যিই অদ্ভুতকর্মা মহিম। অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস মাস্টার—বেঁটেখাতায় লিসার মারতে চিত্তবাবুর বড় সুবিধা। বলেন, গোলআলু—ঝাল-ঝোল-চচ্চড়িতে যেমন খুশি লাগিয়ে দেওয়া যায়, ভাবতে হয় না। মহিম ভেবে ভেবে কয়েক ধরনের অঙ্ক কষবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম বের করেছেন—মাথা ঘামাতে হয় না, ছকে ফেলে দিলে আপনি হয়ে যায়। আর যেন একটা তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে—ফাইন্যাল পরীক্ষায় কি কি আসতে পারে দাগ দিয়ে দেন, তারই পনের আনা এসে যায়। এক-আধ বারের কথা নয়, বছর বছর এমনি হয়ে আসছে। তাতেই আরও নাম হয়ে গেল ছেলেমহলে।

লাইব্রেরি-ঘরে টিফিনের সময় দাশু জিজ্ঞাসা করেন, এবারে কত-গুলো গাঁথলেন মহিমবাবু ?

সামান্য—

ডজন পুরল ?

হ্যাঁ, তাই বুঝি পারে মানুষে !

হুবহু সলিলবাবুর মুখের কথা। একবার মহিম চোখ বুলিয়ে নিলেন অন্যান্য মাস্টারের উপর। কতজনে একটা ছুটো টুইশানিও জোটাতে পারে না, তাঁর বেলা এমন হয়েছে ঠেলে সরিয়ে কূল পাচ্ছেন না।

ক'টা হল, বলুন না—

আসছে যাচ্ছে, জোয়ার-ভাঁটার খেলা—এর কি হিসাব থাকে দাশুবাবু ?

গঙ্গাপদবাবু দেহ রেখেছেন, দাশু তাঁর জায়গায় নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বেশি টুইশানি করলে ইস্কুলের কাজ হয় না, এই দাশুর ধারণা। বলেও থাকেন তাই। পতাকীচরণ চুপিচুপি বলেন, নিজে পায় না বলে হিংসে। অমন ফাঁকিবাজ মাস্টারকে কে ডাকবে ?

খোশামুদি করে কমিটির মন ভেজানো যায়, কিন্তু ছেলের বাপ ভিজবেন ছেলে যদি কিছু শিখতে পারে তবেই।

একটা জিনিস মহিমকে বড় ভাবিয়ে তুলছে। দাশুকে বলেন, চোখ দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। কী করা যায় বল দিকি?

দাশু এককথায় জবাব দেন : চোখ খাটাচ্ছেন যে বড্ড। বিশ্রাম নিন। টুইশানির—অর্ধেক নয়, বারো আনা ছেঁটে ফেলুন।

পতাকীচরণ টিপ্পনী কেটে ওঠেন : চোখের খাটনি কিসে? মহিম বাবুর পড়াতে চোখ লাগে না। সবই ওঁর মুখস্থ—চোখ বুজে বুজেই উনি পড়ান।

কথা মিথ্যা নয়। পড়িয়ে পড়িয়ে এমন হয়ে গেছে—অ্যালজাব্রা না দেখেই বলতে বলতে ক্লাসে ঢোকেন, তিনশ-ছিয়াত্তরের পাতায় সাতান্ন নম্বরের অঙ্ক লিখে নে। এ-কিউবড থ্রাইস এ-স্কোয়ারড বি···দীর্ঘ অঙ্কটা বলে যাচ্ছেন। বই খুলে মিলিয়ে দেখ, একটুকু হেরফের নেই।

মহিমের বাসা আগে ইস্কুলের কাছাকাছি ছিল, এখন সেই সানগরের দিকে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, অত দূরে কেন মাস্টারমশায়? কাছাকাছিই তো বেশ ছিল। অনর্থক হয়রানি।

শুধুমাত্র ছাত্রের বাড়ি ছাড়া মহিম কথবার্তা ইদানীং কমিয়ে দিয়েছেন। ফুসফুস যন্ত্রকে বিনামূল্যে খাটাতে যাবেন কেন? মৃদু হেসে তিনি বলেন, হুঁ—

দুই রকমের হাঁটনা মহিমের। সব টিউটরেরই। এক সময় দেখবে, গতিবেগে মোটরগাড়ি হার মেনে যাচ্ছে। ছাত্রের বাড়ি চলেছেন সেই সময়। এক বাড়ি সারা করে অন্য ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছেন, গতিবেগ ডবল হয়ে গেছে তখন। আবার একসময় সেই মানুষ ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার মতন খুটখুট খুটখুট পা ফেলে চলেছেন।

সেটা নিশিরাত্রে। বুঝে নেবে, কাজকর্ম শেষ করে ঘরে ফিরছেন এবারে।

একতলার ছাতে চিলেকোঠায় মহিমের নিরিবিলি ঘর। একা শোন ওই ঘরে। ঘুম থেকে উঠে পড়েন, পুরোপুরি দিনমান নয় তখনও। পোহাতি তারা পশ্চিম আকাশে জ্বলজ্বল করছে। ওই শেষরাত্রেই স্নান করে রান্নাঘরে চালের কলসি থেকে গোণা বারো-চোদ্দটি চাল মুখে ফেলে ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে কাঁধে চাদর ও হাতে ছাতা তুলে নেন। দুর্গা-দুর্গা—বলে দেয়ালে টাঙানো পটের দিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েন এবার। যাওয়ার সময় মেয়ের নাম ধরে ডেকে যান, ওরে দীপালি, দুয়োর খোলা রইল। ওঠ এইবার তোরা। বেলা হয়েছে, উনুনে আগুন-টাগুন দে।

ডাকলেন এইমাত্র—তাকিয়েও দেখলেন না তাঁর আহ্বান কানে গেল কি না। দেখার ফুরসত কই? টং করে সাড়ে-চারটে বাজার আওয়াজ হল কোন বাড়ির ঘড়িতে—কে যেন সপাং করে চাবুক মারল মহিমের পিঠে। হাঁটা নয়—দৌড়চ্ছেন একরকম। এমন শক্তি শীর্ণ দীর্ঘ পা-দুটোর!

পাড়াটা তীরবেগে অতিক্রম করে মহিম তিন মিনিটে চৌমাথায় এসে পড়েন। দিনের প্রথম পড়ানো এইখানে—ডান দিকের দোতলা বাড়িটায়। ছাত্রের নাম প্রবোধ। আগের বছর ফেল হয়েছিল, তার পরেই মহিম-মাস্টারের খোঁজ পড়ে। মহিম বলেছিলেন, গায়ে ফুঁ দিয়ে কেউ পাশ করতে পারে না বাবা। বিশেষ করে তোর মতন অঘা ছেলে। রাত থাকতে উঠে পড়বি। চারিদিক ঠাণ্ডা থাকে তখন, খুব মুখস্থ হয়। পড়েই দেখ না ক'দিন—হাতে হাতে ফল পাবি।

প্রবোধ অসহায়ের ভাবে বলে, ইচ্ছে তো করে মাস্টারমশায়, কিন্তু উঠতে পারি নে। ঘুম ভাঙে না কিছুতে।

তাই তো! বাড়ির লোককে বলে রাখতে পারিস, তাঁরা তুলে দেবেন।

আমার উপর দিয়ে যান তাঁরা। আমি যদি উঠি সাতটায়, বাবা ওঠেন আটটায়। মা সাড়ে ন'টায়।

মুশকিল তবে তো! একটুখানি চিন্তা করে মহিম বললেন, আচ্ছা, নিচের ঘরে—এই পড়ার ঘরে শুবি তুই। শেষ রাতের দিকে উঠিস তো একবার—খিলটা তখন খুলে রেখে দিবি। আমি এসে ডেকে তুলব।

আপনি সার এই শীতের রাত্রে—শীতটা বেশি পড়ে গেল হঠাৎ আজ ক'দিন—

কি করব বাবা, উপায় নেই। ভার নিয়েছি যখন, তোর বাবার কাছে কথা দিয়েছি পাশ করিয়ে দেব।

মহিম-মাস্টারের কর্তব্যজ্ঞান দেখে প্রবোধের বাড়ির সকলে অবাক হয়ে গেছে। মাস্টার এসে পড়িয়ে যান, কেউ তা জানতে পারে না। প্রবোধ তারপর থেকে গলা ফাটিয়ে পড়তে লাগে। কিন্তু শেষরাত্রি থেকে না ধরলে মহিম যে কোনরকমে সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। এতগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন, নিদেনপক্ষে এক ঘণ্টা করে পড়াবেন তো প্রতি জায়গায়। না হল পঞ্চাশ মিনিট। মুশকিল হয়েছে, বিধাতা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় দিনরাত্রি করেছেন—এর ভিতর থেকেও খাওয়া ও ঘুমে ঘণ্টা আষ্টেক বাজে খরচ হয়ে যায়। আবার ইস্কুল আছে সাড়ে-দশটা থেকে চারটে।

প্রবোধকে শেষ করে মহিম পথে বেরোন, রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো। কালীঘাট মুখো ছুটেছেন। এবারের বাড়িটায় সুবিধা আছে—কর্তাবাবু ভোরবেলার ট্রামে উঠে চাঁদপালঘাটে বড়-গঙ্গায় নাইতে যান। তার আগে নিজের হাতে কড়া তামাক সেজে খেয়ে নেন একছিলিম। শয্যাত্যাগ করে উঠে ছেলেকেও ডেকে তুলে দেন। মহিমের কড়া নাড়া শুনেই ছাত্র এসে দুয়োর খুলে দেয়।

পড়বার ঘর উপরে—দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়, এই এক হাঙ্গামা। আর কিছু না হোক, ওঠানামায় খানিকটা সময় নষ্ট তো বটে!

সেখান থেকে ছুটলেন সিংহিবাড়ি অভিমুখে। সিংহিরা নাম-করা বড়লোক, কিছু সাহেব-ঘেঁষা। পৌনে-আটটা থেকে পড়াবার কথা। অল্পসল্প রোদ উঠেছে, মহিম ছাতা খুলেছেন। ছাতা সর্বক্ষণ মহিমের হাতে, ছাতা বাদ দিয়ে মহিম-মাস্টারকে ভাবা যায় না। একই ছাতা বছর ছয়েক ঘুরছে তাঁর হাতে, আরও ছ-বছর ঘুরবে এমন আশা করা যায়। ছাতার কাপড়ের কালো রংটা কেবল ধূসর হয়ে গেছে, তা ছাড়া অন্য কোন খুঁত নেই। শীত-গ্রীষ্ম বসন্ত-বর্ষা সর্বঋতুতে সমান এই ছাতার ব্যবহার। বর্ষায় ছাতা মেলেন বৃষ্টির জন্য, অন্য সময় রোদ ঠেকাতে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রাত্রিবেলাও ছাতা খুলে চলেন। মাথার উপরে ছাতা ঠিক খাড়া থাকে ছবিতে-দেখা পৌরাণিক রাজছত্রের মতন। খোলা ছাতা কাঁধের উপর ঠেসান দিয়ে চলা তাঁর অভ্যাস নয়। ছাতা দেখেই দূর থেকে বুঝতে পারা যায়—ছেলেরা বলে, মহিম-মাস্টার আসছেন।

সিংহিবাড়ির বুড়ো কর্তা চন্দ্রভূষণ সিংহ বারাণ্ডায় টেবিলের ধারে খবরের কাগজ পড়েন। মহিমকে উঠতে হয় বারাণ্ডার অন্য প্রান্ত দিয়ে। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকান সেই সময় চন্দ্রবাবু। পৌনে-আটটার পরে দুটো মিনিট হয়ে গেলে অমনি হাঁক ছাড়বেন, শুনে যান মাস্টারমশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কাছে এলে দেরি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দু-এক কথায় শেষ করে চলে যাবেন সে উপায় নেই। চন্দ্রবাবু এক সময়ে বড় উকিল ছিলেন—রিটায়ার করেছেন, কিন্তু জেরার অভ্যাস যায় নি। দু-মিনিট দেরির জন্য যথোচিত কৈফিয়ৎ দিয়ে পড়ার ঘরে যেতে মিনিট দশেক লেগে যায়। অবশ্য তাড়াতাড়ি গিয়ে যে কোন লাভ আছে, তা নয়। জলি সিংহ পড়ে না প্রায়ই। বলে, আজকে থাক সার। শরীরটা বেজুত লাগছে। বসুন, চায়ের কথা বলে আসছি। চায়ের কথা বলতে

জলি বেরিয়ে যায়। চা সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে, কিন্তু জলি হয়তো আর ফিরে এল না।

অথবা ফিরে এসে বলল, মাস্টারমশায়, আপনি পড়ে যান—আমি শুনি। শুনে শুনেই শিখে ফেলব। বলে সে ইজিচেয়ারে সটান গড়িয়ে পড়ে। মহিম পড়িয়ে যাচ্ছেন, ছাত্র ওদিকে খেলার ক্যাটলগের এ-পাতা ও-পাতা উল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে মহিমের মনে বিবেকের দংশন-জ্বালা জাগে—এখন এই গোলামির বেহদ্দ, আর একদিন তিনি সাতু ঘোষের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বড্ড রাগ হয় নিজের উপরে। আর এই ছেলেটার উপরেও বটে! থাপ্পড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুখে এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করবার উপায়ও নেই। বাড়ির একমাত্র ছেলে—সকলের আদরের। মাইনে ভালই দেয়—সুতরাং যা করে চুপ করে সয়ে যেতে হবে। সিংহিবাড়িতে পড়ানো নয়—মোসাহেবি অনেকটা।

একটার পর একটা সেরে যাচ্ছেন, আর ইস্কুলের দিকে এগোচ্ছেন ক্রমশ। ছাত্রের বাড়ি হিসাব করে মহিম এমনিভাবে পর পর টুইশানি সাজিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে সানগরে বাসা ভাড়া করাও সেই কারণে। সিংহিবাড়ির পরে বলরাম মিত্তির লেনে রবীনকে পড়ান। সকালবেলার এই শেষ। মণি ঘোষের ছোট ভাই রবীন—মাস্টারির প্রথম দিন গার্জেন ভেবে মহিম যাকে খাতির করেছিলেন। এম. এ. পাশ করে গেছে মণি, স্বাস্থ্য সেই আগের মতোই ফেটে পড়ছে। কিন্তু হলে কি হবে—সংসার করল না, দেশের কাজ নিয়ে মেতে আছে। মহিমকে দেখলে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয়। সাতু ঘোষের অসাধু কাজ ছেড়ে দিয়ে ইস্কুল-মাস্টারি নেবার কথা কার কাছে শুনেছে সে—মহিমই কোন দিন বলে থাকবেন। সেই থেকে তার বড় সম্ভ্রম। বলে, আপনারাই তো সার আলো দেখান, বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি পাই। মণিদের বাড়ির অবস্থা ভাল। রবীনকে পড়ানোর ভার মণির জন্যেই নিতে হয়েছে।

এই এক মজার বাড়ি। খুব ভাল ছেলে রবীন—পড়াশুনোয় ভাল, ব্যায়াম-চর্চা করে মজবুত গড়ন শরীরের, একটা মিথ্যেকথা পর্যন্ত কখনো বলে না। রবীনের মায়ের কিন্তু সন্তোষ নেই। পূর্বদিন থেকে আজকের এই অবধি রবীনের যাবতীয় অপরাধের ফিরিস্তি পাঠিয়ে দেন চাকর অথবা ছোটমেয়েকে দিয়ে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কখনো বা এক টুকরো কাগজে স্বহস্তে আনুপূর্বিক লিখে পাঠান। সেই সঙ্গে মোটা বেতের লাঠিও আসে। ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট। অতএব কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম সমাধা করে ঠিক দশটার সময় মহিম উঠলেন ও-বাড়ি থেকে।

মেস সামান্য দূরে, এবং ইস্কুল তার পরেই। রবীনের বাড়ি থেকে সোজা মেসে এসে ঢুকলেন। রান্নাঘরের সামনে বারাণ্ডার ফালিতে আসন পাতা আছে ব্যবস্থামতো। গেলাসে জল দেওয়া। মহিম জুতো খুলে টাঙানো দড়ির উপর কাঁধের চাদর ছুঁড়ে দিয়ে আসনে বসে পড়লেন। ভাতের থালা এসে গেছে ইতিমধ্যে—ডাল-মাছ-তরকারি সমস্ত ঠাকুর একবারে সাজিয়ে নিয়ে আসে। বারংবার এসে দেবার ফুরসত হবে না। এইবারে হাতের খাটনি মহিমের—থালার ভাত অতিদ্রুত মুখ-বিবরে পৌঁছে দেওয়া; এবং মুখের খাটনিও—দ্রুত চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে পরের আমদানির জন্য জায়গা খালি করে ফেলা। দুই অবয়বে পাল্লা চলেছে যেন—সে এক দেখবার বস্তু। খাওয়া অন্তে জোরে একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে হাতে-মুখে হুড়হুড় করে মগ দুই জল ঢেলে চাদর কাঁধে ফেলে জুতো পায়ে ঢুকিয়ে মহিম সাঁ করে বেরিয়ে যান। ওয়ার্নিং-বেল পড়ে গেছে ইস্কুলে। নাম সই করে খড়ি আর স্কেল হাতে মহিম চেঁচাতে চেঁচাতে ক্লাসে ঢুকলেন: আঠাশের থিয়োরেম—একশ-বারোর পৃষ্ঠা খুলে ফেল। লেট এ-বি-সি বি এ ট্রায়েঙ্গেল—

খড়ি দিয়ে খটাখট ত্রিভুজ এঁকে ফেললেন ব্লাকবোর্ডের উপর। পড়ার ঐ ধরতা দিয়ে দিলেন—তারপরে ডেকে ডেকে তুলবেন একে

ওকে তাকে। এক জনের দুটো লাইন বলা হয়েছে কি না—তাকে বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে তুলবেন। আগের জন যে জায়গায় ছেড়েছে—বাক্য শেষ না হয়ে থাকলে সেই মাঝের শব্দ থেকেই বলতে হবে পরের জনকে। লাইন ধরে পর পর ডেকে তুলছেন তা নয়—এখান থেকে একটি, ওখান থেকে একটি। ক্লাসের সব ছেলেকে তটস্থ থাকতে হয় সেইজন্য—পড়া টনটনে মুখস্থ করে কান পেতে থাকতে হয়। কী জানি, তারই বা ডাক পড়ে এবারে!

ব্লাকবোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে মহিম অবিরত পড়া ধরছেন: স্টাণ্ড আপ—ইউ, ইউ সেকেণ্ড বয় অব দ্য সেকেণ্ড বেঞ্চ। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। বলে যাও তারপর থেকে। ভেরি গুড, সিট ডাউন। নেক্সট—থার্ড বয় অব দ্য লাস্ট বেঞ্চ। কি হে, শুনতে পাচ্ছ না, লাস্ট বেঞ্চির ওই মোটা ছেলেটা—

সে ছাত্র ওঠে না কিছুতে। এত বার বলছেন, ঘাড়ই তোলে না। তার মানে, কিছু করে আসে নি বাড়ি থেকে। ফাঁকিবাজ ছেলে, ন্যাকা সেজে আছে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে—

মহিম গর্জন করে ওঠেন: স্টাণ্ড আপ আই সে। তবু সে বধির হয়ে আছে। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, স্টাণ্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ—বেঞ্চির উপর দাঁড়াও দুর্বিনীত ছোকরা।

ক্লাসের সমস্ত ছেলে মরে আছে যেন। টু শব্দটি নেই। স্কেল নিয়ে মহিম ছুটে আসেন ক্লাসের শেষ প্রান্তের সর্বশেষ বেঞ্চিতে। দেবেন স্কেলের একটা-দুটো ঘা কষিয়ে—হাল আমলের আইন-টাইন মানবেন না। কান ধরে তারপর তুলে দেবেন বেঞ্চির উপর।

একেবারে কাছে গিয়ে উঁচিয়ে-তোলা স্কেল নামিয়ে নিলেন: আপনি সার?

হেডমাস্টারই ঘাড় নিচু করে বসে আছেন ছেলেদের মধ্যে। কোন কথা না বলে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ-ও এক কায়দা মাস্টারদের কাজকর্ম দেখবার। ছেলে হয়ে

বসে থাকা। তবে মহিমের মতো ক্ষীণদৃষ্টি না হলে আগে থাকতে দেখে ফেলে। বাইরে এসে দাশুকে হেডমাস্টার বলেন, আপনি যা বললেন ঠিক অতখানি নয়। মহিমবাবু ক্লাস ফাঁকি দেন না। তবে পড়ানো একেবারে পুরানো ধাঁচের। ছেলেদের মুখস্থই করান, বোঝাতে কই তো দেখলাম না।

দাশু টিপ্পনী কাটেন : ক্লাসেই সব বুঝে গেল তো বাড়িতে ডাকবে কেন ? বিদ্যে ছাড়েন ওঁরা টুইশানির সময়।

হেডমাস্টার ঘাড় নেড়ে বলেন, মতলব করে কিছু করেন, সেটা মনে হল না। তবে চোখের দৃষ্টি বড় খারাপ। কাছে গিয়েও চিনে উঠতে পারেন না।

বলতে বলতে হেসে ফেললেন : আমার সত্যি ভয় হয়েছিল দাশুবাবু। স্কেলের এক ঘা মেরেই বসেন বা। মোটের উপর আপনার কথাই মানি আমি। নতুন রুটিনে উঁচু ক্লাস দেওয়া চলবে না। চোখের এই অবস্থায় কষ্ট হবে ওঁর। চিত্তবাবুকে তাই বলে দেব।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে মহিম তেতলায় যাচ্ছেন। থার্ড ক্লাস ই-সেকসনে এবার। আরও ক-জন উঠছেন তেতলায়। গগনবিহারী বলেন, কাল ছাব্বিশে জানুয়ারি—স্বাধীনতা-দিবস। স্ট্রাইক হবে নাকি ইস্কুলে। আপনি কিছু শুনেছেন মহিমবাবু ?

পাশ থেকে জগদীশ্বর বলে ওঠেন, ফুলচন্দন পড়ুক মশায় আপনার মুখে। ছুটিছাটা নেই—নিরম্বু ক্লাস চলল সেই মার্চ অবধি। এইসব আছে বলে তবু বাঁচোয়া।

মহিম চিন্তিত ভাবে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, চোখ নিয়ে তো মুশকিল হল গগনবিহারীবাবু। বড্ড খারাপ হয়ে পড়ছে। কাছেও এখন ঝাপসা দেখি। বিপদ ঘটাল দেখছি।

গগনবিহারী বলেন, ছানি পড়েছে বোধ হয়। কাটিয়ে ফেলুন, ঠিক হয়ে যাবে।

জগদীশ্বর বলেন, শীতকালে এইতো হল কাটাবার সময়। হাসপাতালে চলে যান। সেকেণ্ড-বি'র সুশীল সরকারের বাপ হলেন সার্জন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন গিয়ে।

মহিম বলেন, ওরে বাবা, রক্ষে রাখবে তা হলে! এই সময় হাসপাতালে গিয়ে উঠলে ছেলেরা আর তাদের বাপ-দাদারা তেড়ে গিয়ে পড়বে না?

হেসে একটু রসিকতা করেন: মরে গেলে সাবিত্রীর মতন যমরাজের পিছন পিছন ধাওয়া করবে। বলবে, ফাইন্যাল এগজামিনটা কাটিয়ে দিয়ে তবে যান।

থার্ড-ই ক্লাসের সামনে এসেছেন। জগদীশ্বর মহিমের হাত এঁটে ধরলেন: দাঁড়ান না মশায়। কী হয়েছে!

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মহিম ব্যস্ত হয়ে বললেন, উঁহু, তিন মিনিট হয়ে গেছে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্লাসে।

জগদীশ্বর বিরক্ত হয়ে বলেন, ক্লাস যেন আমাদের নেই! ক্লাস আছে বলেই ঘোড়দৌড় করতে হবে? বিদ্যে-দান সেই ধরুন শেষরাত্তির থেকে চলছে, ঘেন্না ধরে না মানুষের!

জগদীশ্বর আর গগনবিহারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। কালকের স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ। প্রাচী শিক্ষালয় তো ছুটি দিয়ে দিচ্ছে শুনলাম। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে সোজাসুজি বলতে পারে না—হেডমাস্টারের পিশি না কে মরেছে, সেই ছুতো নিয়ে মোর্নিং-ডে। আমাদের এতজনের খুঁজলে কি মরা-ছাড়া একটা পাওয়া যেত না? ইস্কুল খুলে রেখে নিরর্থক ঝামেলার সৃষ্টি।

গগনবিহারী বলেন, খুলে কি ইচ্ছে করে রাখে! ছেলেরা ছুটি চায়, আমরাও দিতে চাই। গোল বাধায় হতভাগা গার্জেনগুলো। যত বেটা খয়ের-খাঁ ইস্কুলে ছেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা-দিবস বলে ছুটি দিলে কলজে ফেটে চৌচির হবে না?

জগদীশ্বর বলেন, দেখুন তাই। ব্রিদস্ দেয়ার এ ম্যান হুজ সোল সো ডেড—কিন্তু বলে দিচ্ছি মশায়, ইস্কুল কাল কিছুতে হবে না। মাঝে থেকে সকাল সকাল খেয়ে এসে ছেলেগুলো পার্কে ঢুকে গুলি খেলবে।

গগনবিহারী বলেন, আর কতক টালিগঞ্জে সিনেমা স্টুডিও-য় গিয়ে দরজায় ভিড় করবে স্যুটিং দেখবার জন্যে। কত উন্নতি যে হয়েছে!

দাশু হঠাৎ হনহন করে তেতলায় চলে এসেছেন। পিছনে জমাদার। উভয়ে সরে পড়ছিলেন, দাশু তার আগে এসে গেলেন।

আরে মশায় জগদীশ্বরবাবু, ফিফথ ক্লাস ছিল আপনার আগের ঘণ্টায়। অত আগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লেন—

জগদীশ্বর আকাশ থেকে পড়েন : কে বলল? এইতো—এইমাত্র এসেছি। অ্যাঁ, কি বলেন গগনবিহারীবাবু?

দাশু বলেন, পাশের ক্লাসে পড়ানো যাচ্ছিল না গণ্ডগোলের চোটে।

বনোয়ারি বলেছে? কোটনার কথায় কান দিও না দাশুবাবু। নিজে ক্লাসের মধ্যে থাকে, তখনই তো হাট বসে যায়। আমরা তার জন্যে পড়াতে পারি নে। কি বলেন গগনবিহারীবাবু, অ্যাঁ?

এ পিরিয়ডেরও পাঁচ-সাত মিনিট হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা গল্প করছেন।

বলে দাশু আর দাঁড়ান না। কোথায় ওদিকে একটা ছেলে বমি করেছে। বমি পরিষ্কার করতে হবে, ছেলেটাকে লাইব্রেরি-ঘরের টেবিলে নিয়ে শুইয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। দৃষ্টির আড়াল হলেই জগদীশ্বর ফেটে পড়লেন। গগনবিহারীকে বলেন, ছুটছেন কেন মশায়, অত ভয় কিসের? হাতে মাথা কাটবে নাকি? ফিফথ ক্লাস আগে ছেড়ে থাকি তো থার্ড ক্লাসে এই পরে যাচ্ছি। চুকেবুকে গেল। মুখে এসে গিয়েছিল, তা যেন চেপে নিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

হয়ে নিজে তো একটা ক্লাসেও যায় না। কাজ হচ্ছে কপরদালালি আর মাস্টারদের পিছনে লাগা।

চারটের শেষ ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মহিম আবার টুইশানিতে চলেছেন।

জগদীশ্বর পিছন থেকে ডাকেন, ও মহিমবাবু, নোটিশ দেখলেন? প্রাচী শিক্ষালয় অবধি ছুটি দিয়ে দিল, আমাদের উল্টো। এক ঘণ্টা আগে সাড়ে ন'টার সময় কাল হাজিরা।

ততক্ষণে মহিম অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে হুঁ— বলে দিলেন। বাক্যটুকু শোনা গেল না, ঘাড় নাড়াটা দেখা গেল শুধু।

দৌড়চ্ছেন যে মশায়, কে তাড়া করল? পতাকীচরণ হি-হি করে হাসছেন। বলেন, না দেখেশুনে পার হতে গিয়ে একটা লোক সেদিন চাপা পড়ল মোড়ের মাথায়। আপনার তো আবার চোখ খারাপ।

এবারও ঘাড় নেড়ে মহিম বললেন, হুঁ—

কথা বলার ফুরসত নেই। চাপা পড়লেও দেখেশুনে ধীরেসুস্থে রাস্তা পার হবার সময় হবে না। পার হয়ে গিয়েই গোয়ালপাড়া লেন বেরিয়েছে বড়রাস্তা থেকে। একটা হিন্দুস্থানি খাবারের দোকান সেখানে। কচুরি ভাজছে দেখা যাবে। মহিম-মাস্টারকে চেনে তারা। রাস্তা পার হচ্ছেন দেখতে পেয়েই শালপাতার ঠোঙায় খানিকটা আলু-কুমড়ার ঘ্যাঁট ও তিনখানা কচুরি দিয়ে এগিয়ে ধরবে। ঠোঙা হাতে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে মহিম ছুটেছেন গলি ধরে। ছুটছেন আর কচুরি কামড়ে নিচ্ছেন। গলি শেষ হয়ে হরি চাটুজ্জে স্ট্রীট। খাওয়া শেষ হয়ে যাবে সেই সময়—ঘড়ি ধরে যেন হিসাব করা। সেই মোড়ের উপর কল আছে। ঠোঙা ফেলে দিয়ে কল টিপে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিলেন মহিম। দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে

বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ি একটা। ছাত্রটি বাইরের ঘরে বই খুলে বসে আছে। আগে থেকে দাগ দিয়ে রেখেছে কোনটা কোনটা বুঝে নিতে হবে মাস্টারের কাছ থেকে। সময়ের অপব্যয় নেই। সত্যি ভাল ছেলে, নইলে বিকালবেলা না বেরিয়ে খেলাধুলো না করে বই খুলে বসে মাস্টারের অপেক্ষায় থাকে!

এর পরে একটি মেয়ে—সুলতা। বাড়িমুখো মুখ ফিরিয়েছেন এবার। আর যত টুইশানি, শেষ করতে করতে বাড়ির দিকে এগোবেন। সুলতার পড়ানোর মধ্যেই রাস্তায় ওদিকে গ্যাস জ্বেলে দিয়ে গেছে। যাবার সময় মেয়েটা এককাপ চা এনে দেয়। গরম চা খেয়ে তাজা ভাবটা ফিরে আসে। বেশ খানিকটা গিয়ে এইবারে সাতু ঘোষের বাড়ি। অলক পড়বে। ভোরবেলাকার প্রথম সেই গতিবেগ ফিরে এসেছে আবার চায়ের গুণে।

রাত্রি সাড়ে দশ বাজে। শেষ ছাত্রের বাড়ি সশব্দে বই বন্ধ করে মহিম উঠে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আজকে সেটা হল না। ত্যাঁদড় ছেলে জ্যামিতির তিনটে এক্সট্রা বের করে বসল—বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে। কাল হবে বলে চাপা দিয়ে আসতে হয় এমনি ক্ষেত্রে। অন্য সময় করেনও তাই। কিন্তু ছাত্রের বাবা বসে আছেন এই ঘরে—এত রাত্রি অবধি অফিসের কি কাগজপত্র লিখছেন। অতএব দরদ দেখিয়ে বসে পড়তে হল আবার। এগারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিল। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। পথ অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু মহিম অন্যদিন ট্রামে ফিরে যান এই পথটুকু।

পা দুটো যেন অসাড়—বেতো ঘোড়ার মতন কিছুতে এগুতে চায় না। ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক মারে, কাঁধের চাদর পাকিয়ে দড়ির মতো করে দুই ঠ্যাঙের উপর দেবেন নাকি ঘা কতক? থপথপ করে যাচ্ছেন। পথ বেশি-বেশি লাগছে। রাত্রিবেলা কোন কুহকমন্ত্রে পথ যেন মহিম মাস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়ে উঠছে।

বায়োস্কোপ ভেঙে লোকজন বেরিয়ে আসছে। হাস্যমুখ এতগুলো নরনারী—কোন এক আলাদা তুনিয়া যেন।

জনতার মধ্যে দাশুকে দেখে চমক লাগে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এই জায়গায়! একা নয়, পাশে মেয়েলোক একটি—দাশুর বউ। নিশিরাত্রে বউ নিয়ে টকি-বায়োস্কোপ দেখতে এসেছে।

মহিম ডাকছেন, দাশুবাবু—

কলকাতায় প্রথম যখন বাসা করেন, সরসীবালাকে নিয়ে মহিম এসেছিলেন একদিন। কিন্তু মাস্টার মানুষের ছেলে পড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার জো আছে! বেইজ্জতি হতে হয়। তারপরে আর কখনো টকি দেখেন নি।

এই যে দাশুবাবু, এদিকে—এদিকে—

দাশু আগেই দেখতে পেয়েছেন, না দেখার ভান করে সরে পড়ার তালে ছিলেন। রাত্রি অনেক। বউ দাঁড় করিয়ে রেখে ভ্যানর-ভ্যানর করবার সময় এখন নয়। কিন্তু টুইশানি-ফেরত বাড়ি চলেছেন মহিম—তুটো কথাবার্তা না বলে কি অমনি ছাড়বেন? সাড়া না পাওয়া অবধি ডাকাডাকি চলবে।

বায়োস্কোপ দেখা হল বুঝি? বিজ্ঞানের কী অসাধ্য-সাধন! তোমার বউদিদিকে নিয়ে আমি একবার এসেছিলাম। কী পালা ভাল, নাম মনে পড়ছে না। ছবিতে তড়বড় করে কথা বলতে লাগল। দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী ফসফস করে একের পর এক আবির্ভূত হচ্ছেন। যত বুড়োবুড়ি গদগদ হয়ে মা-মা করছে। কিন্তু ফষ্টিনষ্টি আছেও তো আবার! অন্ধকার করে দিয়েছে, সিটি মারছে ঠিক আমার পিছনে। অসভ্য কথাবার্তা বলছে। খানিক পরে আলো জ্বললে দেখি আমাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস সি-সেকশনের তুটো ছেলে। বলে, নমস্কার সার! লজ্জায় আমি মুখ তুলে তাকাতে পারি নে। তোমার বউদিদি

এখনো বলে, আর একদিন দেখে আসি চল না। রক্ষে কর, একদিনে যথেষ্ট হয়েছে, আর কাজ নেই।

দাশু বলেন, রাত্রের শো-তে ছেলেপুলে থাকে না। তাছাড়া আমি যখন গিয়ে বসেছি, হলের মধ্যে টুঁ-শব্দ করার তাগত আমার ইস্কুলের কারো হবে না।

বউ একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিকে চেয়ে দাশু বলেন, এই যাচ্ছি। চল, রিকশাই করা যাক একখানা।

চলে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও ছাড়বেন কি মহিম! বললেন, কী নাকি নোটিশ বের করেছ আজ তোমরা, আমি কিচ্ছু দেখি নি।

এক ঘণ্টা আগে কাল হাজিরা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে'র ঝামেলা। বাইরের লোক এসে গেট আটকাবে, তার আগেই গেটে চেপে থেকে ছেলে ঢোকাতে হবে আমাদের।

বলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দাশু বলে উঠলেন: নোটিশ দেখবেন কেন! ইস্কুলের কোন-কিছু দেখেন কি চোখ তাকিয়ে? মন উড়ু-উড়ু—ঘণ্টা বাজতে না বাজতে ছুটতে শুরু করে দেন।

রাগ না করে মহিম কাতর হয়ে বলেন, যা বলেছ দাশুবাবু। আর পারছি নে, সত্যি কথা বলছি। বি. এ. পাশ করলাম ভাল ভাবে, অঙ্কে অনার্স পেলাম। ইস্কুল-কলেজে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ করি নি কোন দিন—খালি পড়েছি। এখন দেখছি, অনার্সের জন্য মরণ পণ না করে টু-টোয়েন্টি আর ফোর-ফরটি রেস ছুটো রপ্ত করে রাখলে ভাল হত। যত পড়াই, তার তেছুনো দৌড়ই। ছেড়ে দেব, বুঝলে ভায়া, ছ্যা-ছ্যা—শিক্ষিত লোকের কাজ নাকি এই!

রিকশা একটা যাচ্ছিল অদূরে। দাশু তাড়াতাড়ি ডাকলেন। বউকে বলেন, উঠে পড়, রাত হয়ে গেছে। বউকে তুলে নিজে উঠে পাশে বসলেন। পায়ে হেঁটে যেতেন বাড়ি অবধি। কিন্তু ওঁর খপ্পর থেকে বেরবার জন্য রিকশা নিতে হল। গচ্চা গেল আনা তিনেক।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। দীপালি জেগে বসে আছে। আহা, কী কষ্ট এইটুকু মেয়ের! ভিতরে গিয়ে মহিম দেখলেন, শুভব্রতও আছে দিদির সঙ্গে। রাত বড্ড হয়ে গেছে, তারা এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিল।

দীপালি কেঁদে পড়ে: এই খানিক আগে কী কাণ্ড মাকে নিয়ে! পুণ্যকে খাইয়ে দিয়ে বামুনমাসি চলে গেলেন। শুভোর পড়া-টড়া হয়ে গেলে তারপর আমরা দু-জনে খেতে বসেছি। দুম করে এক আওয়াজ। ছুটে এসে দেখি, মা মেজেয় পড়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না—চোখ ঘুরিয়ে কেমন করে তাকায়, আর গোঁ-গোঁ করে। শুভো কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছুটল। তিনি ভাগ্যিস বাড়ি ছিলেন, এসে অষুধ-টষুধ দিলেন। সকালবেলা তোমায় দেখা করতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু।

মহিম ব্যস্ত হয়ে বলেন, এখন আছে কেমন রে? জেগে না ঘুমিয়ে? তাই তো, ছেলেমানুষ তোদের হিল্লেয় রেখে যাওয়া—আমারও তেমনি মরণ-বাঁচন এই তিনটে মাস, নিশ্বাস ফেলার ফাঁক দেয় না। বেহালায় গিয়ে তোদের পিসিমাকে নিয়ে আসব, তা এমনি হয়েছে—

বকতে বকতে তাড়াতাড়ি জুতো-জামা খুলছেন। ঘরের মধ্যে বড় তক্তাপোশের মাঝখানটায় সরসীবালা—একপাশে বাচ্চা মেয়েটা, অন্য পাশে পুণ্যব্রত। পুণ্যও দেখা যায় চোখ পিটপিট করছে, ঘুমোয় নি। কিংবা ঘুমিয়ে ছিল, জেগেছে শব্দ-সাড়া পেয়ে। মায়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছে—মুখে চোখে এখনো আতঙ্কের ভাব।

মহিম বলেন, শরীর খারাপ করল আজ?

সরসীবালা ম্লান হাসি হাসল: ওদের যেমন কথা! আজকে বরঞ্চ ভাল অন্য দিনের চেয়ে। আমিই একটা অন্যায় করে বসলাম। মেয়েটা মুখে রক্ত তুলে খাটে, খেতে বসেছে ওরা—বলি, ভাল যখন আছি, একটু জল ফুটিয়ে রূপালির ফুডটা হাতে হাতে বানিয়ে

নিইগে। যেই মাত্র ওঠা, মাথার ভিতর চিড়িক দিয়ে উঠল। ডাক্তার-টাক্তার এনে খুব হৈ-চৈ করেছে ওরা। ছেলেমানুষ তো!

গায়ে হাত দিয়ে মহিম বলেন, গা পুড়ে যাচ্ছে তোমার।

ও কিছু নয়। রাত্তিরবেলা মাথায় জল ঢালাঢালি করেছে। দুর্বল শরীর তো—তাই একটু গরম লাগে।

বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে পুণ্যব্রতের দিকে চেয়ে সকৌতুকে বলে, কে বল্‌ দিকি পুণ্য?

মহিম বলেন, কী যে বল! আমায় যেন চেনে না!

চিনবে কি করে? দেখতে পায় কখন বল। ভোর না হতে বেরিয়ে যাও, তখন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। রাত্তিরবেলা ফেরো, তখনও ঘুমোয়। একটা দিন রবিবার—পোড়া টুইশানির সেদিনও ছাড়ান নেই। বাপে ছেলেয় দেখা হবে কেমন করে?

মহিম বলেন, কী করি, তবু তো খাপ খাওয়াতে পারি নে। কতক টুইশানি হপ্তায় চারদিন করে। সোম থেকে শনির মধ্যে তিন দিন সেরে দিই। বাড়তি একদিন রবিবারে। মবলগ টাকার দরকার—মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা, ছেলে মানুষ করবার টাকা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না হওয়া অবধি এইরকম, তার পরে খানিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে।

বলতে বলতে একটু দেমাকও এসে যায় কথার ভিতরে: ইস্কুলে ক্লাস পড়াবার রুটিন করে। আমায় টুইশানির জন্যে রুটিন করতে হয় তেমনি। অথচ দেখগে, একটা টুইশানির জন্য কত মাস্টার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু পায় না।

দীপালি আর শুভব্রতের দিকে নজর পড়ে মহিম তাড়া দিয়ে উঠলেন: তোরা হাঁ করে কেন দাঁড়িয়ে? শুয়ে পড়গে যা। রাত জেগে তোরাও একখানা করে বাধা, কাজকর্ম ছেড়ে হাতপা-ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বাড়ি বসে থাকি আমি তখন।

সরসীবালা বলে, দেখ, দীপালি একলা আর কত পারে! ঠাকুরঝিকে কদ্দিন থেকে আনবার কথা হচ্ছে—

চিঠি লেখা আছে তারক-দা'কে। যেতে পারছি নে। দেখছ তো অবস্থা! তুমি এই পড়ে আছ, এক দণ্ড একটু কাছে বসতে পারি নে। দেখি, কাল শুনছি স্ট্রাইক হবে। ফাঁকতালে যদি ছুটি পাওয়া যায়, কালই দিদিকে নিয়ে আসব।

মহিমের ডান-হাতখানা দু-হাতের মুঠিতে ধরে আছে সরসীবালা। চোখের কোণে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে জল মুছে সরসী বলে, দেখ, একটা কথা বলছি তোমায়। আর বলতে পারি না পারি—

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নেয় : প্রায় তো সেরে উঠেছি। সেরে গিয়ে তখন মনে থাকে না থাকে—সেইজন্যে বলে রাখি। আমার শুভো আর পুণ্য কক্ষণো যেন মাস্টার না হয়।

মহিম উত্তেজিত হয়ে বলেন, ওরা বলে কেন, কেউ কক্ষণো ইস্কুল-মাস্টার না হয় যেন। অতি-বড় শত্রুর জন্যেও ওই কামনা করি নে। ছ্যা-ছ্যা—একটা জীবন নাকি!

বলতে বলতে অন্য কথা এসে পড়ে : সেরেসুরে ওঠ, টকি-বায়োস্কোপে নিয়ে যাব। সেই যে গিয়েছিলে, মনে নেই—কালী-তারা-ভুবনেশ্বরীরা সব আসতে লাগলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা চুকে-বুকে যাক—রাখি তো সন্ধ্যের দিকে মাত্তর একটা টুইশানি রাখব। সেইটে সেরে টকিতে গিয়ে বসব দু-জনে। বেশি রাত্রে ছাত্রের ঝামেলা থাকে না। মাস্টারদের সময় তখন।

টং-টং করে কাদের ঘড়িতে বারোটা বাজে। কাজ বাকি আছে মহিমের। ঢাকা নামিয়ে ভাত ক'টা গবগব করে গিলে ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলেন। আলো জ্বেলে আরও অনেক ক্ষণের কাজ—আলো চোখে পড়ে অন্যের ঘুমের অসুবিধা হয়, সেজন্য এই ঘরে সরু একখানা তোষকের উপর বসে কাজ করেন। কাজের শেষে গড়িয়ে পড়েন সেখানে। কাজ এখন সারা দিনের জমাখরচ লেখা। দীপালি মোটামুটি টুকে রেখেছে—হিসাবের পাই-

পয়সা অবধি বড়-খাতায় লিখে রাখবেন এবারে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর লিখে যাচ্ছেন এমনি। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষর। সমস্ত জমাখরচের খাতা সযত্নে রাখা আছে শিয়রে কাঠের বাক্সের ভিতর। অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের জন্য মহিম যেন নির্ভুল কৈফিয়ৎ রচনা করে যাচ্ছেন। জীবনের একটা মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করেন নি, একটা পয়সাও অন্যায় পথের উপার্জন নয়, এক পাই-পয়সারও অপব্যয় হয় নি কোনদিন—তার এই অকাট্য দলিল।

জমাখরচ হয়ে গেলেও চিলেকোঠার আলো জ্বলে কোন কোন দিন। পড়াশুনো করেন—নেসফিল্ডের গ্রামার, ভূগোল, মেকানিক্স। টুইশানির জন্য দেখে নিতে হয় মাঝে মাঝে। ভাল দেখতে পান না, বই তাই একেবারে চোখের উপরে নিয়ে পড়েন।

॥ একুশ ॥

হুকুম হল, সাড়ে ন'টায় ইস্কুলে হাজিরা—সময়ের ঠিক একঘণ্টা আগে। কর্তারা ভাবলেন, ঘণ্টাগুলো মাস্টারদের নিজের এক্তিয়ারে—ইচ্ছে করলেই আগুপিছু করা যায়। একটি ঘণ্টা হেরফেরের জন্য বিশ গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে হবে—কি হয়েছিল মাস্টারমশায়? পরীক্ষার আগে এক একটা দিন যে এখন এক মাসের সমান! তা সে যা-ই হোক, মূল ইস্কুল আগে বজায় রাখতে হবে, টুইশানির ডালপালা পরে। টুইশানি কত আসছে যাচ্ছে, ইস্কুল অনড়। ইস্কুলের কাজটা আছে বলেই টুইশানি। রবীন ঘোষকে পড়ানো এবং মেসের আহারটা বাদ দিয়ে মহিম ইস্কুলে ছুটলেন।

তবু একটু দেরি হয়ে গেছে। লোকারণ্য রাস্তায়। ভিড় ঠেলে এগুনো যায় না। যাচ্ছেন কোন রকমে। গেটের কাছাকাছি

হয়েছেন—নানান দিক থেকে বলছে, ঢুকবেন না সার—ঢুকবেন না সার। কিন্তু যেতেই হবে। না গেলে বলবে, মহিম-মাস্টার তলে তলে স্বদেশি—স্ট্রাইক করে আজ ইস্কুলে আসে নি। স্বদেশি হওয়া একটা খারাপ গালাগালি চাকরির ক্ষেত্রে। কনুই ঠেলে এগুচ্ছেন মহিম। ছেলেরা গেট জুড়ে শুয়ে পড়েছে। বলে, আমাদের মাড়িয়ে ঢুকতে হবে সার, এমনি যেতে দেব না। একটি ওদের মধ্যে চেনা—ধ্রুব। এখান থেকে পাশ করে গিয়ে কলেজে পড়ছে। বড় অফিসারের ছেলে, বাপের হাজার টাকার উপর মাইনে।

হকচকিয়ে গেলেন মহিম। অনেক মাস্টার ঢুকে গেছেন ইতিমধ্যে, ভিতর উঠানে তাঁদের দেখা যাচ্ছে। খোলা গেটের এদিকে আর ওদিকে মানুষে মানুষে পাঁচিল গেঁথে আছে যেন। বাইরে ভলন্টিয়াররা আটকে আছে—ছাত্র-মাস্টার কাউকে ঢুকতে দেবে না। ভিতর দিকে মাস্টার আর দরোয়ান-বেয়ারাদের নিয়ে দাশু রয়েছেন—ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া বাইরের কেউ কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়তে না পারে। লড়াইয়ে দু-পক্ষের সৈন্য যেন মুখোমুখি। হেডমাস্টার আর চিত্তবাবু দোতলার জানলায়—সেনাপতিরা রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন বোধ করি এমনি উঁচুতে দাঁড়িয়ে। এমনি দূরবর্তী থেকে।

এ বড় ফ্যাসাদ হল তো! মহিমের মন খারাপ। সেই এক বাড়ি পড়ানো বাদ গেল, অথচ কাজের কাজ কিছু হয় না। হেডমাস্টার নজর রাখছেন কে কে ইস্কুলে এসেছে, কারা এল না। গোপন খাতায় হয়তো বা টুকে রাখছেন। আরও ঘণ্টাখানেক আগে এলে ঢোকা যেত। কিন্তু টুইশানি কামাই হত আর এক জায়গায়। কামাই করলেই হয় না, আবার তা পুষিয়ে দিতে হবে। সময় কোথা? রবিবারের দিনটাও তো পনের আনা ভরতি হয়ে আছে।

হেডমাস্টার উপর থেকে হাঁক দিয়ে উঠলেন: বেয়ারা, ঘণ্টা দিয়ে দাও। সাড়ে দশটা বাজল। মাস্টারমশায়রা যে যার ক্লাসে চলে যান এইবারে।

মহিম ছটফট করছেন। ব্যূহভেদ করে কোন কৌশলে ঢুকে পড়েন? ভূদেব কোন দিক দিয়ে এসে হাত ধরলেন। চাপা গলায় বলেন, চলে আসুন না মশায়। হাওয়ার গতিক বুঝতে পারেন না? ঢুকতে পারি নি বলে কি ফাঁসিতে লটকাবে?

মহিম আর ভূদেব শুধু নন, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন কিছু দূরে নিরাপদ ব্যবধানে। ইস্কুলের ছেলে একদল ভিড় করে আছে। ভূদেব বলেন, ঢোকা গেল না, কিন্তু বাইরে থেকেও তো কাজ করা যায়। দোতলা থেকে ওই দেখুন দু-জোড়া চক্ষু তাক করে রয়েছে। কাজ দেখান মশায়রা, কাজ দেখান—

বলে সেই উপরমুখো মুখ করে ভূদেব চেঁচিয়ে উঠলেন, ভিড় কোরো না ছেলেরা। পুলিশ এসে টিয়ার-গ্যাস ছাড়বে এখনই। ভিতরে ঢুকে যাও। ঘণ্টা পড়ে গেল, ক্লাস আরম্ভ এইবারে, যাও, যাও—ঢুকে পড়।

দু-একটা ছেলেকে ধাক্কাধাক্কিও করছেন। ধাক্কা উল্টো মুখো। গলা নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বাড়ি চলে যা হতভাগারা। উঁ, ইস্কুলে গিয়ে বিদ্যেসাগর হবেন সব! ছুতো পেলি তো বাড়ি গিয়ে খেলাধুলো কর্‌গে।

হঠাৎ এক কাণ্ড। তেতলার ছাতের উপরে রব উঠল—বন্দে মাতরম্। আলসের উপরে উঠে জোয়ান ছেলে তেরঙা নিশান তুলে ধরেছে। উজ্জ্বল রোদ পিছলে পড়ে গৌর দেহে। বহু দূর থেকে, বোধকরি ট্রামরাস্তা থেকেও, দেখা যাচ্ছে তাকে। কে আবার! মণি ঘোষ—জীবনের যে পরোয়া করে না। নিশান পতপত করে উড়ছে। বাজ না পড়ে সেজন্য দেয়াল ফুঁড়ে রড বের করা—নিশান ধীরেসুস্থে সেই রডের সঙ্গে বেঁধে দিল। মণি তার পরে নেমে এল তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায়, একতলা থেকে রাস্তায়—সকলের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে। রাস্তার উপরে ছেলেবুড়ো ভিড় করে আছে নিশানের দিকে তাকিয়ে।

মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। ইস্কুলের তরফের সবাই একেবারে চুপ। জানলায় কেউ নেই। ইস্কুলের ভিতরেই আছে কিনা সন্দেহ হয়।

নিশান তুলে দিয়ে রণ-জয় করে ভলন্টিয়াররা চলে গেছে। মহিম ভূদেব ও অন্যেরা ঢুকে পড়েছেন। রাস্তা ফাঁকা। গেট বন্ধ হয়ে ডবল তালা পড়েছে। হেডমাস্টার ক্ষিপ্তপ্রায়। সবগুলো বেয়ারাকে ডাকিয়ে এনে হাঁকাহাঁকি করছেন তাদের উপর: বাইরের লোক কেমন করে ঢুকল কম্পাউণ্ডের ভিতরে? ঢুকেছে অত বড় ফ্লাগ নিয়ে। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলে গেল, কারো একটু নজরে পড়ল না। চোখ বুঁজে থাক সব। দেখাচ্ছি মজা—সেক্রেটারিকে বলে দলসুদ্ধ তাড়াব।

চিত্তবাবু বেয়ারাদের পক্ষ হয়ে বলেন, ওরা কি করবে? কী রকম ত্যাঁদড় মণি ঘোষটা—এইখানে পড়ে গেছে তো! চালার ভিতর রাঁধাবাড়া করছিল ওরা, ঘর খুলে রেখে জমাদার ঝাঁটপাট দিচ্ছিল, পিছনের নিচু পাঁচিল টপকে সেই সময় বোধহয় ঢুকে পড়েছে। ঢুকে লুকিয়ে বসে ছিল—সামনের রাস্তায় লোকজন জুটলে সময় বুঝে বুক চিতিয়ে আলসের উপর উঠে দাঁড়াল।

নবীন পণ্ডিত হাতের খবরের কাগজ পাকাতে পাকাতে বলেন, পিনছার মুভমেন্ট—আগে পিছে যুগপৎ আক্রমণ। তাইতে কাবু হয়ে গেলাম। সামনে দিয়ে তো একটা মাছি গলতে পারে নি।

চিত্তবাবু বলেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখনকার উপায় ভাবুন।

ভাবাভাবির কী আছে! দাশু গর্জন করে ওঠেন: সার একটা মুখের কথা বলে দিন, নিশান টেনে নামাচ্ছি।

হেডমাস্টার চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন: উঁহু, ছাতের উপরের ব্যাপার। লোকে দেখে ফেলবে। লোক জমে যাবে পতাকার অপমান হচ্ছে বলে। খবরের কাগজে উঠবে।

চিত্তবাবুও সায় দেন: সত্যি কথা। গোঁয়ার্তুমির কাজ

নয় দাশু। সমস্ত দিন উড়ুক অমনি, বেয়ারারা রাত্তিরে সরিয়ে ফেলবে।

হেডমাস্টার হায়-হায় করছেন: কী সর্বনাশ বলুন দিকি! এদিককার কোন ইস্কুলে যা হয় নি। প্রাচী শিক্ষালয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিউ মডেল খোলা আছে। নিউ মডেলের নয়নবাবু জাঁক করছিলেন, বড় বড় লোকের ছেলে পড়ে—বন্দে মাতরম্ আমাদের ইস্কুলে সেঁধুতে পারবে না। কালাচাঁদবাবু, একবার ঘুরেফিরে দেখে আসুন কোথায় কি হল। অন্য জায়গায় হলে কমিটির কাছে বলবার তবু মুখ থাকে। শিক্ষকদের মাইনে-বৃদ্ধির দরখাস্ত ঝুলছে এই সময়টা—বিপদ দেখুন!

মহিম ক্লাসের দিক থেকে ঘুরে এসে বললেন, ছেলে তো অষ্টরম্ভা। কি করব বলুন চিত্তবাবু, বাড়ি চলে যাই?

ভূদেব বলেন, চলে যাবেন কি মশায়! চা আসছে নবীন পণ্ডিত মশায়ের ওখানে। গগনবিহারীবাবুর মার্কসিট হারিয়ে যায়, ফকিরচাঁদ খুঁজে দিয়েছিল। সেই বাবদে তাঁর কাছ থেকে এক টাকা আদায় হল। চা আনতে বেরিয়ে গেছে।

করালীকান্ত বলেন, ক্ষেপেছেন? চা খাওয়ার জন্য বসে থাকবেন মহিমবাবু? ছুটো বাড়ি সেরে নেবেন ততক্ষণে।

মহিম শুষ্ক মুখে বলেন, পড়ানো নয়। বাড়িতে অসুখবিসুখ চলছে বড্ড। ছুটি পেয়ে যাই তো বেহালা গিয়ে বড়বোনকে বাসায় নিয়ে আসি।

রুটিনের চার্টটা তুলে ধরে চিত্তবাবু আঙুল বুলিয়ে নিরীক্ষণ করছেন: সেকেণ্ড-বি। ফার্স্ট-এ। তারপরে হলগে ফোর্থ-ডি। না, এসব ক্লাসে ছেলে আসে নি। টিফিনের পরে এই যে—থার্ড-বি ক্লাস রয়েছে এই। থার্ড-বি'তে গুটি পাঁচ-ছয় এসেছে, দেখে এলাম।

তিন-চারজনে সমকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, টিফিনের পরেও ইস্কুল চলবে নাকি?

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে বললেন, চারটে পর্যন্ত ইস্কুল। অবিশ্যি যাঁদের ক্লাসে মোটে ছেলে নেই, তাঁরা চলে যেতে পারেন। ক্লাসের ভিতর একটা ছেলে থাকলেও পড়াতে হবে।

রুটিন দেখতে দেখতে চিত্তবাবু বলে উঠলেন, আপনারও তো থার্ড-বি ভূদেববাবু। এই ঘণ্টায়। ক্লাসে যান নি, বসে আছেন—

ভূদেব আকাশ থেকে পড়েন : আমার? কই—না না, আমার কেন হতে যাবে!

পকেট থেকে ছোট্ট একটু খাতা বের করে মিলিয়ে দেখেন। হপ্তায় দুটো দিন থার্ড-বি—আজকেই আছে বটে! জমাটি আড্ডার মধ্য থেকে ভূদেব বিরস মুখে উঠলেন : ওরে বিনোদ, আফ্রিকা আর দক্ষিণ-আমেরিকার ম্যাপ দুটো ক্লাসে পাঠিয়ে দাও।

ক্লাসে গিয়ে মুখের উপর একটুখানি হাসি টেনে এনে ভূদেব বললেন, এই ক'জন এসেছ তোমরা? বেশ, বেশ। কোনও ক্লাসে কেউ এল না, তোমরা তো বেশ এসে গেছ।

ছেলেরা এ ওকে ছাড়িয়ে বাহাদুরি নেবার জন্য ব্যস্ত : কী করে যে ঢুকেছি সার! গেটের সামনে সব শুয়ে পড়েছে—তখন মাথায় এল, পিছন দিকে নিচু পাঁচিল আছে তো। পাঁচিল বেয়ে উঠে টুপটুপ করে সব লাফিয়ে পড়ি। চার-পাঁচ জন পড়তে ভলন্টিয়াররা টের পেয়েছে। রে-রে করে এসে পড়ল। তার পরে আর কেউ পারে নি। আমরাই ক'জন শুধু।

ভূদেব উচ্চকণ্ঠে তারিপ করেন : ভাল, ভাল। নিষ্ঠা আছে তোমাদের।

কৃতিত্বের কাহিনী আরও কিছু ফলাও করে বলতে যাচ্ছিল, ভূদেব থামিয়ে দিলেন : গল্প নয়। কত কষ্ট করে এসেছ, পড়া হবে এখন। আফ্রিকার ম্যাপটা টাঙিয়ে দাও বোর্ডের উপরে।

ছেলেরা বলে, আফ্রিকা তো ফোর্থ ক্লাসে সারা করে এসেছি।

সেই পড়া ধরব। পড়ে-শুনে প্রোমোশান নিয়ে এলে, গোড়াটা কি রকম আছে দেখে নিতে হবে না? আফ্রিকা হয়ে গেলে দক্ষিণ-আমেরিকা—তারও ম্যাপ এনেছি। ম্যাপ পয়েন্টিং হবে—এক-একটা জায়গার নাম করব, মুখের কথা মুখে থাকতে ম্যাপে দেখাবে। এই যাঃ, পয়েণ্টার আনা হয় নি তো। নিয়ে আসছি। কারো যদি একটা ভুল হয়, আগাপাস্তলা পেটাব পয়েণ্টার দিয়ে। থার্ড ক্লাসে উঠে বড্ড বাড় বেড়েছে। ভুল হলে বুঝব, টুকে পাশ করে এসেছিস। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলব, আসছি দাঁড়া—

রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। আবার মুখ ফিরিয়ে বলেন, চুপচাপ বসে বসে বই দেখ ততক্ষণ। ম্যাপের জায়গাগুলো দেখে রাখ—হ্রদ, নদী, পর্বত, রাজধানী এই সমস্ত।

বিনোদের কাছ থেকে ভূদেব পয়েণ্টার নিয়ে নিলেন একটা। পয়েণ্টার হল কাঠের বেঁটে লাঠি, মাথার দিকে সুঁচাল করা। ম্যাপ দেখাতে হয় ওই বস্তু দিয়ে, দরকার মতো বেতের কাজও হয়। ক্লাসে বেত আনা বন্ধ, কিন্তু পয়েণ্টার স্কেল এইসব অস্ত্র চালু রয়ে গেছে।

হেডমাস্টার আর চিত্তবাবু ইতিমধ্যে কামরায় ঢুকে গেছেন। সেক্রেটারির কাছে কি পরিমাণ রেখেঢেকে আজকের রিপোর্ট যাবে, তার সলাপরামর্শ হচ্ছে। অতএব ওদিকটা আপাতত বাঁচোয়া। ভূদেব উঁকিঝুঁকি দিয়ে নবীন পণ্ডিতের ওখানে ঢুকলেন। চা এসে গিয়েছে। আফিমের ডেলা মুখে ফেলে পণ্ডিতমশায় একটু একটু চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর লড়াইয়ে হারতে হারতে ইংরেজ কোন কায়দায় জিতে গেল, সেই তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। বসবার জায়গা নেই এ-ঘরে, খান দুই মাত্র চেয়ার। মাস্টাররা তবু ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন নবীন পণ্ডিতকে ঘিরে।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পণ্ডিত

বলেন, হেঁ-হেঁ, খবরের কাগজ তো অনেকেই কেনেন—পড়তে পারেন ক'জনে শুনি? পড়তে জানা চাই। যা ছাপা থাকে, সমস্ত মিথ্যে। সত্যি খবর ছাপে না কাগজে, ছাপবার জো নেই। ছাপা জিনিসের ভিতরে আকারে-ইঙ্গিতে বলে, মনোযোগ করে পড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে বের করে নিতে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে টু রিড বিটুইন দ্য লাইনস। উপরে নিচে তুটো লাইনের মাঝখানে তো ফাঁক—সেই ফাঁকের মধ্যে সত্যি খবর সাদা কালিতে ছাপা থাকে।

চোখের উপরে কাগজখানা মেলে ধরে নবীন পণ্ডিত অনর্গল বলে যাচ্ছেন সেই সাদা কালির ছাপা সত্য: হিটলার শুদ্ধি করে হিন্দু হয়েছিল, বাহুতে স্বস্তিকচিহ্ন ধারণ করত। বগলামুখী কবচও ছিল কোটের নিচে; মাইনে-করা জ্যোতিষী ছিল। কাশী এসে একবার মদনমোহন মালবীয়কে প্রণাম করে গিয়েছিল লড়াই বাধবার অনেক আগে…

হাতে চায়ের বাটি নিয়ে ভূদেবও মগ্ন হয়ে শুনছেন। কিন্তু ঈর্ষী লোকের অন্যের সুখ সহ্য হয় না। দাশু বলে উঠলেন, আপনি যে ক্লাস নিচ্ছিলেন ভূদেববাবু। ক্লাস ছেড়ে চলে এলেন?

ও, হ্যাঁ—যাচ্ছি। ম্যাপ পয়েন্টিং হবে, পয়েন্টার নিতে এসেছি।

লাইব্রেরি-ঘরে মহিম একাকী চোখ বুঁজে বসে আছেন। সময়ের অপব্যয় করেন না, কাজকর্ম না থাকলে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেন। দরকার মতন দাঁড়িয়েও ঘুমতে পারেন বোধহয়। আজ কিন্তু ঘুম নয়, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন বুঝি। কী যেন নেশায় পড়েছেন ওই মণি ঘোষ ছেলেটাকে নিয়ে। জ্যোতির্ময় ছেলে। ছাতের আলসের উপর দাঁড়িয়ে ছিল নিশান হাতে। বীরমূর্তি। ঠাকুর-দেবতার ছবিতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি রোদের আলো পড়েছিল তার মুখখানা ঘিরে। দীপালিকে ঐ ছেলের হাতে দেবেন। মণির মা দরজার আড়াল থেকে কথা বলেন, তাঁর কাছে কথাটা তুলবেন একদিন। দীপালি নিন্দের মেয়ে নয়, কনে পছন্দ

হয়ে যাবে ওঁদের। মহিমকে মণি বড় মান্য করে, সে-ও নিশ্চয় 'না' বলবে না। ছেলেটাকে বাড়ি ডেকে নিয়ে সরসীবালাকে একদিন দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

ভূদেব এসে দাঁড়ালেন। মুখে হাসি ধরে না। মহিমকে বলেন, চলে যেতে পারেন মহিমবাবু। পয়েণ্টার নিতে এসেছিলাম, থার্ড-বি সেই ফাঁকে ভেগে পড়েছে। চালাক ছেলে সব, বুঝে নিয়েছে। আমিও যথেষ্ট সময় দিয়েছিলাম।

মহিম বলেন, কিন্তু গেট তো তালা-বন্ধ। গেল কি করে?

গেট দিয়ে তো ইস্কুলে আসে নি। এসেছিল পাঁচিল টপকে, গেছেও সেই পথে। ছুটি করে দিলাম, একদিন চা খাওয়াতে হবে।

সুধাকে নিয়ে মহিম বাসায় যাচ্ছেন। ট্রামে যাচ্ছেন। সারা পথ কেবল ওই মণি ঘোষের কথা : তুমি যাচ্ছ দিদি, ভাল হয়েছে, ছেলেটাকে বাসায় এনে তোমাদের দেখিয়ে দেব। বর আর কনের বয়সের তফাৎটা ভাবছ। কিন্তু চোখে দেখ একবার মণিকে, বিদ্যে-বুদ্ধির কথা শোন, তার পরে ওসব কিছু মনে আসবে না। কোন এক অজুহাতে বাসায় ডেকে আনব, আমি বললে ঠিক সে আসবে। মেয়েমানুষের মতন চোখ তো পুরুষের নয়—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিও যত খুশি। তোমরা ননদ-ভাজে ছেলে পছন্দ করলে তারপরে আমি কথা পাড়ব। আগে কিছু বলছি নে। দীপালির চেহারা ভাল —ওদেরও ঠিক চোখে লেগে যাবে।

সুধার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে বলেন, মাস্টার মানুষ বটে, তা বলে নিতান্ত শুধু-হাতে মেয়ে দেব না দিদি। রাতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটি—সে ওই মেয়ের বিয়ের জন্য, আর ছেলে দুটো মানুষ করার জন্য। গয়নায় নগদে যদ্দুর পারি সাজিয়েগুছিয়ে দেওয়া যাবে।

পাড়ায় ঢুকতে গোবিন্দ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ডাক্তার বেরিয়ে

পড়েছেন। মহিমকে দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, এই এখন বুঝি আসছেন মাস্টারমশায়? যান।

কথার ধরন ভাল লাগে না। শুষ্ককণ্ঠে মহিম বলেন, খবর কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার খিঁচিয়ে ওঠেন: অত বড় রোগি বাচ্চা ছেলেমেয়ের উপর ফেলে রাতদিন পয়সা-পয়সা করে ঘুরছেন। শিক্ষিত মানুষ আপনি—দেখুন কিছু মনে করবেন না, বস্তির মিস্ত্রি-মজুরের মধ্যেও একটা কর্তব্যজ্ঞান থাকে, এতদূর পাষণ্ড তারা নয়। কাল বলে এসেছিলাম, সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। করেছেন?

গাড়ি বেরিয়ে গেল। মহিম ব্যাকুল হয়ে বলেন, কী বলে গেলেন দিদি, মানে কি ওসব কথার? কাল রাত্রে তোমাদের বউ টরটর করে কত কথা বলল। কত গল্প। বলল, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। তবে ডাক্তার গালিগালাজ করেন কেন?

বাড়ি ঢোকবার দরজা হা-হা করছে। পাশের ভাড়াটেদের বড় বউয়ের কোলে বাচ্চা মেয়েটা—সরসীবালার সাধের রূপালি। আরও তিন-চারটে মেয়েছেলে দেখা যাচ্ছে। পাড়ার ছোকরা কয়েকটি। মহিমকে দেখে শুভো-পুণ্য-দীপালি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

সরসীবালার আধেক-বোঁজা দৃষ্টি। মারা গেছে, মনে হবে না। ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। কাল রাত্রেও এত কথা—কথা সে আর বলবে না।

॥ বাইশ ॥

পরের দিন সারা বেলাস্ত মহিম বাসায় শুয়ে-বসে কাটালেন। দশ-বারো বছরের মধ্যে এ রকম হয়েছে, মনে পড়ে না। খুব যখন কম ভিড়, তখনও রবিবারে দু-এক বাড়ি যেতে হয় অন্তত। সরসীবালা মরে গিয়ে একটা দিনের পুরো ছুটি দিয়ে গেল। হাত-পা মেলে জিরানোর ছুটি।

সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছেন—কী আশ্চর্য, সাতু ঘোষের গলা। বড়লোক হয়েও, দেখ, বিপদ শুনে ছুটে এসেছেন। তাড়াতাড়ি মহিম দরজা খুলে দিলেন। মোটরে চড়ে ছেলে অলককে সঙ্গে নিয়ে বাসা খুঁজে খুঁজে এসেছেন। মহিম তাঁদের দেখেন না তাঁদের মোটরগাড়িখানা দেখেন, ভেবে পান না। কত বড় অবস্থা আজ সাতু ঘোষের! আর সেই প্রথম বয়সে সাতুর চাকরি ছেড়ে দেবার পর মহিম মায়ের কাছে বলেছিলেন, উঠে যাবে সাতুর ব্যবসা; অধর্ম করে ব্যবসা হয় না। বইয়ে ভাল ভাল উক্তি পাঠ করে সবে পাশ করে বেরিয়েছেন, সূর্যকান্তর কাছে পড়ে এসেছেন—ঘোরটা কেটে যায় নি তখনো। অধার্মিক সাতুর উন্নতি চেয়ে দেখ আজ চক্ষু মেলে।

সাতু ঘোষ বললেন, কাল পড়াতে যাও নি কেন? দেখ, ইস্কুল থেকে পাঠাত না—সে একরকম। পাঠিয়েছে যখন, ছেলে ফাইন্যাল এগজামিনে বসতে যাচ্ছে—বের করে ওকে আনতেই হবে। ওর পিছনে টাকা তো কম খরচ করছি নে!

এক অঞ্চলের মানুষ, মহিমের বাপের কাছে একদিন উপকার পেয়েছেন। তাঁর মুখে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথার প্রত্যাশা ছিল। কী বলবেন মহিম, চুপ করে আছেন।

রুক্ষ গলায় সাতু বলছেন, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে যাচ্ছি। দু-দুটো মাস্টার রেখেছি। কালাচাঁদবাবু এক নম্বরের ফাঁকিবাজ—

একদিন এলেন তো দু-দিন আসেন না। আমি বাড়ি না থাকলে ঢকঢক করে এক কাপ চা গিলেই সরে পড়েন। চেনা-জানা মানুষ বলে তোমায় রাখলাম, তুমিও দেখছি ওই দলের। তাই আজ নিজে এসে পড়লাম। না এলে যা করতে সে তো জানি। আরও দু-এক দিন কাটিয়ে দিয়ে চান না করে দাড়ি না কামিয়ে উপস্থিত হতে—কী ব্যাপার ? না, অসুখ করেছিল। ছুতো বানাতে তোমাদের জুড়ি নেই। এই জন্যে কিছু হয় না মাস্টারদের—সারা জন্ম দুয়োরে দুয়োরে বিদ্যে বিক্রি করে বেড়াতে হয়। নাও, ওঠো গাড়িতে।

যেন আকস্মিক বজ্রপাত। পিছন দিকে দীপালি কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, বাবা যাবেন না।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, যাবে না মানে ? দয়া করে পড়ায় নাকি ? মাসে মাসে মাইনে খায়—যাবে না অমনি বললেই হল ! ওই বুঝেই গাড়ি নিয়ে নিজে চলে এসেছি—আজেবাজে বলে কাটিয়ে দিতে না পারে।

মানুষের সুখ-অসুখ থাকে। যেতে পারবেন না আজ বাবা। কঠিন ভাবে কথাগুলো বলে মেয়ে বাপের হাত ধরে টানল।

মহিম আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন। নিয়ে দীপালির মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। বলেন, কিছু মনে করবেন না দাদা। ওদের মা মারা গেছে। ছেলেমানুষ, কেমন ভাবে কথা বলতে হয় জানে না। আপনারা ঘরে এসে বসুন।

সাতু নরম হয়ে গেলেন : ইস, সে খবর তো জানি নে ! কি হয়েছিল ? কবে মারা গেলেন ? তা হলে অবিশ্যি যেতে পারা যায় না।

কাল কামাই হয়েছে, আজকেও যেতে পারছি নে দাদা। ছেলে-মেয়ে সবগুলোই অপোগণ্ড—বড্ড কান্নাকাটি করছে। আবার মুশকিল—কেঁদে কেঁদে ছোট ছেলেটার জ্বর এসেছে, জ্বরে হাঁসফাঁস করছে। একশ-চার পয়েন্ট ছয় এখন।

সাতু ঘোষ বললেন, আচ্ছা, কাল যেও তবে। একজামিনই এসে পড়েছে। একেবারে শিরে-সংক্রান্তি কিনা, নয়তো বলে দিতাম রবিবার অবধি থেকে সোমবারে যেও একেবারে।

তারপর নিশ্বাস ফেলে দার্শনিকসুলভ কণ্ঠে বলেন, যে চলে যায় সে-ই শুধু থাকল না। বাকি সমস্ত পড়ে থাকে, সব-কিছু করতে হয়। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে বরঞ্চ কেটে যায় ভাল, শোকতাপে কাবু করতে পারে না। কাল সন্ধ্যাবেলা যাবে, এই কথা রইল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, এই বুঝি বড় মেয়ে? মেয়ে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। দেখতেও খাসা। টান খুব তোমার উপর—কী রকম মারমুখি হয়ে পড়ল! আমি তো কিছু জানতাম না, জানলে কি আর বলতাম? কি নাম তোমার মা?

আজকে আর শেষ-রাত্রে নয়, ফর্সা হয়ে গেলে তবে মহিম পড়াতে বেরলেন। প্রবোধকে ডেকে তুলতে হল না, নিজেই সে উঠে বই নিয়ে বসেছে। পড়াতে শুরু করে মহিম হঠাৎ চুপ করে যান। বারংবার হচ্ছে এই রকম। অবাধ্য মনটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে হচ্ছে। বৃত্তান্ত শুনে প্রবোধ বলে, আপনি চলে যান মাস্টার-মশায়। কিছু কাজ দিয়ে যান, করে রাখব।

এর পরের ছাত্রের বাড়ি আর গেলেন না। ছুটতে পারছেন না, থপ-থপ করে যাচ্ছেন। সিংহিবাড়ির সময় হয়ে এল। দু-দিন কামাইয়ের অপরাধ, তার উপরে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে কৈফিয়তের বোঝা বিষম ভারী হয়ে দাঁড়াবে। সিংহিবাড়ির বিশেষ সুবিধা, পৌঁছলেই হয়ে গেল। আর খাটনি নেই, জলি পড়ে না। খানিকটা সময় কাটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন। এর পরে তো রবীন—রবীনকে আজ মারলেন না। নেপথ্যবর্তিনী মাকে বললেন, বাড়িতে অশৌচ, কয়েকটা দিন এখন মারধোর রেহাই দিতে হবে মা।

ইস্কুল থেকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে ট্রামে চেপে সোজা বাসায় চলে এলেন। বিকালের ছুটোও পড়াবেন না আজ, যা হবার হোকগে। ভোরবেলা পুণ্য ঘুমচ্ছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেছেন—জ্বর ধাঁ-ধাঁ করছে। গোবিন্দ ডাক্তার আবার কি গালিগালাজ করবেন—বিকালের টুইশানি ছেড়ে তাই বাড়ি এসে বসলেন।

একগাদা কমলালেবু আর বেদানা, একবাক্স বিস্কুট—ও দিদি, তোমার কিছু পয়সা আছে জানি, তাই বলে পাহাড় কিনে এনে তাকের উপর তুলেছ! এক বাচ্চা অত খাবে ক'মাস ধরে?

সুধা বলেন, আমরা কিনি নি। সাতু ঘোষের ছেলে তোমার ছাত্র অলক হাতে করে এসেছিল। বাপের মতন চশমখোর নয়, ছেলেটা বড় ভাল।

অলকের প্রশংসায় সুধা শতমুখ: অমন ছেলে হয় না। কী মিষ্টি মুখের কথা! পিসিমা বলে আমায় গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, ফলটল আমি কেন আনতে যাব পিসিমা, আমি কি জানি? মা সমস্ত শুনেছেন, তিনি এসব পাঠিয়ে দিলেন। গোবিন্দ ডাক্তারবাবু এসে প্রেস্কৃপসন লিখে দিলেন, শুভোর হাত থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে অলক ছুটল। বলে, গুরুদশা চলছে—খালি পায়ে ধড়া-গলায় শুভোর রাস্তায় যেতে হবে না। ওষুধ নিয়ে এসে দামের কথা কিছুতে বলে না, হবে-হবে করে কাটান দেয়। দুপুরবেলা থেকে এতক্ষণ ধরে কত গল্প—এই একটু আগে উঠে গেল। বলে, মাস্টার-মশায় গিয়ে পড়বেন এইবার, আমায় না পেলে ভয়ানক রেগে যাবেন।

মহিম বলেন, এমনিও রেগেছি। কিচ্ছু তো জানে না বোঝে না—মাথা-ভরা গোবর। তার উপর এই রকম আড্ডা দিতে লাগলে কোন পুরুষে ওর পাশ করতে হবে না।

সুধা তাড়াতাড়ি বলেন, এ নিয়ে তুমি কিছু বলতে যেও না

অলককে। খবরদার, খবরদার! খাসা ছেলে। ওর মা পাঠিয়েছিলেন, ও কি করবে? পরের অসময়ে যারা দেখে, ভগবান তাদের ভাল করেন। পড়ার ক্ষতি-লোকসান ভগবান পূরণ করে দেবেন। রোজ কি আর আসতে যাচ্ছে এখানে?

চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে মহিম এবার উঠলেন। সোজা সাতু ঘোষের বাড়ি—অলকের কাছে। ছেলেটা বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে। অত্যন্ত সহজ জিনিসটাও হাতুড়ি পিটিয়ে পেরেক বসানোর মতো করে ওর মাথায় ঢোকাতে হয়। কিন্তু আজ অলককে নতুন চোখে দেখছেন। মাথা না থাক, মস্ত বড় হৃদয় আছে ছেলেটার।

বললেন, আমাদের বাসায় তুমি গিয়েছিলে, দিদি খুব প্রশংসা করছিলেন।

ইস্কুল থেকে বাসা হয়ে এলেন বুঝি?

মহিম বলেন, পুণ্যর আবার অসুখ করে বসল, মন খুব খারাপ, তাই একবার দেখে এলাম ছেলেটাকে। মায়ের বড্ড ন্যাওটা ছিল কিনা, মা-মা করে সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে জ্বর হয়েছে। জ্বরের গতিকও ভাল নয়। কিন্তু তুমি বাবা ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দিয়ে দাম নিলে না কেন?

অলক অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, নেওয়া যাবে পরে, তার কি হয়েছে!

না বাবা, এটা ঠিক নয়। ফল-টল দিয়ে এলে—মা-জননী পাঠিয়েছেন, মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু তুমি ছাত্র-মানুষ, কি জন্য পয়সা খরচ করতে যাবে?

অলক বলে, ছাত্র তো ছেলের মতন। সামান্য আট-দশ আনা পয়সার জন্য আপনি মাস্টারমশায় পীড়াপীড়ি করছেন, আমি না হয়ে গুভো হলে কি করতেন?

এমন করে বলছে, ঠিকমতো উত্তর মুখে জোগায় না। মহিম অন্য কথা পাড়েন: তোমার উঁচু মন, বিপদে ছুটে গিয়ে পড়লে।

কিন্তু এক এক মিনিট এখন যে এক ঘণ্টার সমান। বারংবার গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না, আমি তাহলে নিজেকে অপরাধী মনে করব।

পুণ্যব্রতের জ্বরটা বাঁকা পথ নিল। টাইফয়েড—একেবারে আসল বস্তু নয়, প্যারা-টাইফয়েড। কাজকর্মে তাই বলে কতদিন ফাঁক কাটানো চলে! এগজামিন ঘনিয়ে আসছে। ইস্কুল থেকে মহিম টুইশানিতে সোজা বেরিয়ে পড়লেন আগেকার মতো। সেই যে ছেলেটা বই-খাতা নিয়ে বাইরের ঘরে তৈরি হয়ে থাকত, সে নেই। খেলাধুলো করে না, বেড়ায় না—গেল কোথায় তবে? চাকরটা বলে, কোন এক কোচিং-ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, সেইখানে যাচ্ছে কাল থেকে।

ইদানীং অলিতে-গলিতে কোচিং-ক্লাস। পাইকারি হারে প্রাইভেট পড়ানো। যেমন ধর, রেলের কামরায় দশজনে একসঙ্গে বসে যায়; আবার বড়লোক কেউ রিজার্ভ করে নেয় একলার জন্যে। একটি ছেলের জন্য এক ঘণ্টার টিউটর রিজার্ভ করার মতো মানুষ কমে আসছে। কোচিং-ক্লাসের পাইকারি পড়ানোর বেশি চাহিদা। পড়ানো তো কচু—একজন মাস্টারকে সামনে বসিয়ে রেখে দশ-বিশটা ছেলের হট্টগোল। তবে সস্তায় হয়। চার-পাঁচ দিন মহিমকে না পেয়ে ছেলে কোচিং-এ ঢুকে পড়েছে, সস্তার স্বাদ পেয়েছে। আর ফিরে পাওয়া যাবে না। গেল এটা।

স্নুলতার টুইশানিও গেছে। গিয়ে দেখলেন, নতুন মাস্টার এসে তোলপাড় করে পড়াচ্ছে। এটা লিখছে, ওটা বোঝাচ্ছে, লাল পেন্সিলে দাগ দিচ্ছে ওখানটা। নতুন নতুন এমনি করতে হয়। মহিমও করেন। তারপরে উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। চার-পাঁচটা দিন বিকালে অবহেলার দরুন পৃথিবী উল্টে যাওয়ার ব্যাপার। টিউটর যেন পড়িয়ে যাবার কল একটা—সংসারধর্ম নেই তার, সংসারে অসুখ-অশান্তি থাকতে নেই। যাকগে, ভালই হল। দেহ কেমন

যেন শিথিল, খাটতে মন লাগে না। ইস্কুল থেকে ফিরে পুণ্যর কাছে। বসবেন একটু। সংসারের খবরাখবর নেবেন, দিনের জমাখরচ লিখে রাখবেন বরঞ্চ বিকালের এই সময়টা।

প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন রচনা করেছেন—য়্যুনিভার্সিটির কর্তারা গোপনে ছাপা শেষ করে অতি-সাবধানে সিন্দুকে তালা এঁটে রেখেছেন, প্রশ্ন পাচার হয়ে না যায়। সেই প্রশ্ন আগেভাগে বের করে এনে উত্তর লিখে ছাত্রকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন—মহিমদের এই কাজ। সিন্দুক ভেঙে চুরি করা নয়, প্রশ্নকর্তার মনের ভিতর সেঁধিয়ে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজা। বুদ্ধির খেলা—ওঁরা কতদূর লুকতে পারেন, ইনি কতটা বের করতে পারেন। অনেক রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে হিসাব লেখা শেষ করবার পর মহিম ছাদের উপর পায়চারি করে বেড়ান। গতবার এই এই প্রশ্ন এসেছিল, তার আগের বার এই রকম—এবারে কি কি আসবে? ভেবে ভেবে ব্যাসকূট ভেদ করে ফেলেন। বছর বছর করে আসছেন। মহিম-মাস্টারের সেইজন্যে নামডাক—এত টুইশানি তাঁর কাছে আসে। অন্য ছেলেরা ঘুন-ঘুন করে মহিমের ছাত্রের কাছে: বল না ভাই কোনটা কোনটা দেগে দিলেন। মহিম যা দেবেন, ছাত্রেরা নিঃসংশয়, তার ভিতর থেকেই প্রশ্ন এসে যাবে। মহিমের ছাত্র মিথ্যে করে উল্টোপাল্টা বলে। অথবা সোজাসুজি হাঁকিয়ে দেয়: মাসের পর মাস মাইনে গণে তবে আদায় হয়েছে, হরির লুঠের মতন ছড়িয়ে দেবার বস্তু নয়।

এমন হয়েছে, এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টা ধরে ঘুরছেন ছাতের উপরে। চটির ফটফট আওয়াজ ঘুমের মধ্যে নিচের লোকের কানে যাচ্ছে। সরসীবালা উঠে এলেন হয়তো বা। সিঁড়ির দরজার উপর থেকে শিকল দেওয়া—দরজা ঝাঁকাচ্ছেন। মহিম দরজা খুলে দেন: কী ব্যাপার?

রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়।

মহিম বললেন, শোব—

এক্ষুণি শোও। তাই দেখে তবে আমি যাব। আবার তো এক পহর রাত থাকতে ছুটবে। এতে শরীর থাকবে না।

সরসীবালা নেই—প্রশ্ন ভেবে ভেবে আজকে সারা রাত ধরে পায়চারি করলেও সিঁড়ির দরজায় ঝাঁকাঝাঁকি করবে না কেউ। ইচ্ছেও করে না—পড়িয়ে এসে একটু-কিছু মুখে দিয়েই মহিম শুয়ে পড়েন। অনভ্যাসে সকাল সকাল ঘুম আসে না। সময়ের অপব্যয় হচ্ছে, এপাশ-ওপাশ করছেন। উঠতে ইচ্ছে করছে না তবু, আলস্য লাগে।

ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেল। ফাঁকা এখন। শুধু মাত্র রবীনের টুইশানিটা আছে। আস্তে আস্তে আবার এসে জমবে। কত ছেলে বলে রেখেছে, হাত খালি হলে আমায় নিতে হবে কিন্তু সার। দু-একটি গার্জেনও এসে দেখা করে গেছেন। পরীক্ষা হয়ে যাওয়া এবং রেজাল্ট বেরনো—এরই মধ্যে নিশ্বাস ফেলার ফাঁক মেলে কয়েকটা দিন।

বেড়াতে বেড়াতে মহিম সিংহিবাড়ি গেলেন। জলিটা এমনি বেশ চালাক। সবগুলো পেপার জড়িয়ে মোটের উপর কি দাঁড়াল, আলোচনা করে দেখবেন। পরীক্ষা যতদিন চলতে থাকে, তার মধ্যে করতে নেই। কোন একটা ভুল হয়েছে দেখলে ছেলে মুশড়ে পড়ে।

চন্দ্রভূষণের নজরে পড়েছে। বারান্দা থেকে হাঁক পাড়ছেন, শুনুন মাস্টারমশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কোয়েশ্চেন দেখেছেন তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

কেমন দেখলেন ?

এ জেরা কোথায় নিয়ে পৌঁছয়—মহিম শঙ্কিত হচ্ছেন। ভাসা-ভাসা জবাব দিলেন, মন্দ কি !

আর আপনি যা সব দেগে দিয়েছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়।

মহিম আমতা আমতা করে বলেন, একটা-দুটো জিনিস তো নয়! অত মনে থাকবে কি করে?

বই-খাতা নিয়ে এসে আমি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম। যা-কিছু দেগেছেন, সমস্ত ভুয়ো। একটাও মেলে নি।

কথা সত্যি। মহিম-মাস্টারের এত দিনের নাম ডুবতে বসেছে। প্রশ্নকর্তা যেন তাঁর যাবতীয় ছাত্রের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে ঠিক সেইগুলোই বাদ দিয়ে প্রশ্ন ফেঁদেছেন। অজ্ঞতার ভান করে মহিম বলেন, তাই নাকি? আন্দাজি ব্যাপার বুঝতে পারছেন—প্রশ্ন তো দেখে আসি নি আগেভাগে!

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলেন, টাকা দিয়ে মাস্টার রাখা কেন তবে? ছেলে একনাগাড় সমস্ত পড়ে যাবে—সে কাজ ইস্কুলেই হয়ে থাকে। বেছেগুছে দুটো-চারটে মোক্ষম বলে দেবেন, রপ্ত করে দেবেন সেইগুলো—

তাই তো দিয়ে থাকি সব জায়গায়।

অন্য জায়গার খবরে গরজ নেই। জলিকে দিয়েছেন ঠিক আসলগুলো বাদ দিয়ে। পলিসি মাস্টারমশায়, সে কি আর বুঝি নে?

হকচকিয়ে গিয়ে মহিম বলেন, পলিসি কি বলছেন?

লং-টার্ম পলিসি। পাশ করলেই তো হয়ে গেল—ফেল করিয়ে করিয়ে ছাত্র জিইয়ে রাখা। চাকরি পাকা হয়ে রইল। এমন সুখ কোন বাড়িতে পাবেন! লেট করে করে আসবেন—মাস কাটাতে পারলেই পুরো মাইনে। এখন তদ্বিরে এসেছেন—ফেল হবার পর আবার যাতে ডাকে আপনাকে। অন্য মাস্টারের কাছে না যায়। সেটা হচ্ছে না, আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম।

এর পরে আর জলির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় না। বেরিয়ে এলেন। প্রবোধের বাড়ি যেতে হবে একটি বার। তিন মাসের মাইনে বাকি। বাপের সঙ্গে দেখা হয় না, তাগিদ প্রবোধের

মারফতে করতে হত। আজ নয়, কাল—করতে করতে দিব্যি এগজামিন অবধি কাটিয়ে দিল। আর দেরি করলে মোটেই আদায় হবে না।

প্রবোধের বাপকে পাওয়া গেল আজ। বললেন, মাইনের জন্য এসেছেন? পরীক্ষার খাতায় পাতার পর পাতা রসগোল্লা পাবে, ছেলে বলছে।

মহিম ঘাড় নাড়লেন : তা কেন—

পাবে তাহলে হীরে-চুনি-পান্না? রেজাল্ট বেরক। আটশ ফুল নম্বরের মধ্যে হাজার দেড় হাজার কত পায় দেখা যাক। তখন আসবেন। একসঙ্গে হিসাবকিতাব করে টাকা নিয়ে যাবেন।

বলতে বলতে আগুন হয়ে ওঠেন : মাস্টার রাখা গোখুরি কাজ হয়েছে। এটা আসবে ওটা আসবে—দাগ দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন ছেলের। ও সেইগুলো মুখস্থ করে মরেছে। হলে বসে চোখে অন্ধকার। এমনি হয়তো পড়ত কতক কতক—দু-দশ মার্ক পেত। কিন্তু রাতের কুটুম চুপিসারে এসে ওই যে কোন বুদ্ধি খাটিয়ে সরে পড়তেন, তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। ন' মাসের মাইনে তো নিয়েই নিয়েছেন—আমার এতগুলো টাকা বরবাদ।

রাতের কুটুম বলা হয় চোরকে। মহিমকে ভদ্রলোক চোর বলে দিলেন। বছরের পর বছর ধরে যশের সৌধ গড়ে তুলেছিলেন—মহিম-মাস্টারের হাতে ছেলে ফেল হয় না। একটা ঝড়েই ভেঙে সমস্ত চুরমার।

অপমানের পর অপমান। কার মুখ দেখে বেরিয়েছেন না জানি। তবু একবার যেতে হয় সাতু ঘোষের বাড়ি। অলকের খবর নিতে নয়। খবর যা হবে সে তো সকলের জানা। সাতু ঘোষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনিও কি জানেন না? অন্য জরুরি ব্যাপার আছে—সাতু ঘোষের ভারি বিপদ। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। সরসীবালার মৃত্যুর পর তাঁর বিপদের দিনে অলক গিয়ে পড়েছিল

বাসায়। কত করেছে! মহিমেরও সাতুর বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

গিয়ে কিন্তু বিপদের লক্ষণ কিছু দেখেন না। সাতু ঘোষ পাশা খেলছেন। কচ্চে বারো—হাঁক শোনা যায় রাস্তা থেকে। মহিমকে দেখে সাতু একগাল হেসে বলেন, বোসো। অলক তো খুব লিখে এসেছে বলল। নাকি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করবে। তুমি সমস্ত তৈরি করিয়ে দিয়েছিলে। বোসো একটুখানি, সব কথা শুনব। এই হয়ে গেল—এক ঘুঁটি আছে, এক্ষুণি ঘরে উঠে যাবে।

খেলা শেষ হয়ে গেলে সাতু ঘোষ উঠে এলেন। মহিম বলেন, কল্যাণশ্রী ফেল হয়েছে, কাগজে দেখলাম।

সাতু হেসে বলেন, তাতে তোমার কি? টাকাকড়ি রেখেছিলে নাকি? আমায় তো কোনদিন কিছু বল নি।

না দাদা, মাস্টারি করে ব্যাঙ্কে রাখবার টাকা কোথায় পাব?

সাতু বলেন, তাহলে ভাল। ন্যাড়ার নেই বাটপাড়ের ভয়। টাকাকড়ি পাজি জিনিস। আমি ডিরেক্টর—আমার কিছু নয়। কত জনে টাকা রেখেছিল ব্যাঙ্কে—তাদেরই মুশকিল। একেবারে যাবে না, পাবে হয়তো কিছু কিছু। কিন্তু লিকুইডেটরের হাত গলে কোন্ যুগে বেরুবে, সে কিছু বলা যায় না।

গলা নামিয়ে বললেন, শোন, ব্যাঙ্কে কিছু থাকে তো তুলে ফেল তাড়াতাড়ি। ব্যাঙের ছাতার মতন ব্যাঙ্ক গজিয়েছে, লড়াই অন্তে এবার ডুবে যাবে একে একে।

অলকের পরীক্ষার কথা উঠল। সাতু বললেন, শুনে তো তাজ্জব লাগে ভাই। ওর বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ পাশ করে নি—ও কি করে ফার্স্ট ডিভিসনে যাবে, ভগবান জানেন।

মহিমের পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পারত না। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সন্দেশ কিনে তোমার বাসায় গেল। বলে, পায়ের ধুলো নিয়ে আসি মাস্টারমশায়ের।

বাসায় ফিরে মহিম দেখলেন, তখন অবধি রয়েছে অলক। সন্দেশ খাওয়াখায়ি আর খুব গুলতানি হচ্ছে। এর পরে প্রস্তাব আছে, সুধা আর দীপালিকে নিয়ে অলক সিনেমায় যাবে। শুভব্রত ভাল ছেলে, সে যাবে না পড়াশুনা ছেড়ে। পুণ্য যেতে পারে মহিম যদি অনুমতি দেন।

মহিমকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে অলক পায়ের ধুলো নিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে দেখেছি। পঁচাশি নম্বর রাইট। আশির নিচে পাব না। অঙ্কে নিশ্চয় লেটার পাব মাস্টার-মশায়।

মহিম বলেন, তাই তো শুনে এলাম সাতু-দার কাছে। হল কি করে বল তো ? টুকে মেরেছিস নিশ্চয়।

অলক আহত স্বরে বলে, কি বলছেন সার! আপনিই তো করে দিলেন সমস্ত।

আমি? সজোরে নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, বরাবর তাই তো হয়ে এসেছে বাবা। কিন্তু এবারে কি হল—দীপালির মা নিজে গেল, আমাকেও মেরে রেখে গেছে একেবারে।

অলক তর্ক করে: আপনি ভুলে গেছেন। অঙ্ক কষে দিয়েছেন, গ্রামারে দাগ দিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাস সংক্ষেপ করে লিখে দিয়েছেন। যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। হুবহু সেইসব লিখে দিয়ে এসেছি। পিসিমাকে তাই বলছিলাম, ফার্স্ট ডিভিসন কেউ রুখতে পারবে না।

সকল ছাত্র গালিগালাজ করছে: মহিম-মাস্টারের আর কিছু নেই। চোখের দৃষ্টি যায় নি শুধু, মাথার ঘিলুও শুকিয়ে গেছে। অলকের মুখে উল্টো কথা। সকলকে বাদ দিয়ে গুহ্য পাঠ একলা অলককেই দিলেন কেবল? স্বপ্নে বলে দিয়েছেন? কিছু না, ধুরন্ধর ছেলে টুকে মেরেছে। নিজের বিদ্যেয় করেছে, কেউ বিশ্বাস করবে না। মহিমের গুণগান করে সামাল দিচ্ছে এখন।

॥ তেইশ ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরল। মহিমের কাছে যারা প্রাইভেট পড়েছে, সবগুলো ফেল। অঙ্কে তো অলকের আশি পাবার কথা, নম্বর আনিয়ে দেখা গেল আট পেয়েছে। এবং কোন বিষয়েই পাশ-নম্বর নেই। তা বলে দৃকপাত নেই ছেলেটার। মহিমের বাসায় এখনো আসে। সুধাকে বলে, কী জানি, বুঝতে পারছি নে পিসিমা কিসে কি হয়ে গেল। অঙ্কের উত্তর সমস্ত আমি মিলিয়ে দেখে-ছিলাম। খাতা যে আমায় দেখতে দেবে না—তা হলে বুঝতে পারতাম। যাকগে, পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না তো! এবারে হল না তো আসছে বার। মা'কে বলে রেখেছি, মহিমবাবু মাস্টার-মশায় ছাড়া অন্য কারো কাছে আমি পড়ব না।

কিন্তু মহিমই যাবেন না আর ওখানে। সব বিষয়ে ফেল, কোন মুখ নিয়ে সাতু ঘোষের কাছে দাঁড়াবেন? নতুন টুইশানি একটাও আর আসে না। ছাত্র আর গার্জেন কত জনে বলে রেখেছিল, একটি প্রাণীর এখন দেখা নেই। শুধুমাত্র রবীন আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যায় বদল করে নিয়েছেন তাকে—সন্ধ্যাবেলার এই একটু-খানি কাজ। রবীন আসছে-বছর ফাইন্যাল দিয়ে বেরিয়ে যাবে —তারপরে যে রকম গতিক, হাত-পা ধুয়ে বাড়ি বসে থাকতে হবে সমস্ত সময়। আজকে সরসীবালা নেই—তখন একটা মিনিট চোখের দেখা দেখতে পারেন নি। সারা জীবন তাই নিয়ে কত অনুযোগ। কত মুখভার করেছে কতদিন। আজ যদি বেঁচে থাকত, সকাল-বিকাল সারাক্ষণ তার শয্যার পাশটিতে বসে থাকতাম।

কিন্তু রবীনের টুইশানিও সেই ফাইন্যাল অবধি থাকে কিনা দেখ। একদিন পড়াতে গিয়ে মহিম শুনতে পেলেন, দুই ভাই মণি আর রবীনে কথাবার্তা হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে কথা, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে

নিলেন একটুখানি। মহিমের কাছে আর পড়তে চায় না রবীন: অন্য কাউকে দেখ দাদা। অলক্ষুণে মাস্টার। এত জনের মধ্যে একটা ছেলেও পাশ করল না ওঁর কাছ থেকে।

মণি বলছে, মহিমবাবুর মতো শিক্ষক অন্য কোন ইস্কুলে আছে জানি নে, তোদের ইস্কুলে তো নেই। পুরো তিনটে বছর পড়েছি ওঁর কাছে। যে-কোন ক্লাসে গিয়ে যে-কোন সাবজেক্ট পড়িয়ে আসতেন। সে কী পড়ানো! সবাই মগ্ন হয়ে শুনত, ক্লাসের ভিতর একটা সূঁচ পড়লে শোনা যেত।

রবীন বলে, কবে কী ছিলেন, জানি নে। এখন ফিফথ ক্লাসের উপরে ওঁর রুটিন নেই। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—তাই সামলাতে হিমসিম হয়ে যান। উপর ক্লাসে কি পড়ানো হয়, একেবারে কিচ্ছু জানেন না। উনি থাকলে কখনো আমি পাশ হব না।

মহিম আর দেরি করলেন না। গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকে পড়লেন। দেরি হলে আরও কত কি শোনাবে কে জানে! সে আমলের এই একটি ছাত্র—মণি তাঁর ক্ষমতার সাক্ষি। নিন্দেয় নিন্দেয় মণিরও কান ভারী করে তুলছে—মহিম যতক্ষণ পারেন, সেটা ঠেকিয়ে রাখতে চান।

পড়ানোর পরে আজ চিত্তবাবুর বাড়ি চললেন। পুরানো আমলের আর একজন। চিত্তবাবুরই কত ক্লাস পড়িয়ে এসেছেন—ক্ষমতা জানেন তিনি মহিমের। কিন্তু কোথায় চিত্তবাবু এখন! পড়াতে বেরিয়ে গেছেন। মহিমের মতো নিষ্কর্মা নন। মহিমের চেয়ে চিত্তবাবু বয়সে অনেক বড়। অথচ কেমন শক্তসমর্থ। চির-দিন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটালেন, সেজন্য চশমাটাও লাগে না এতখানি বয়সে। হাতে কাজ আছে বলেই টুইশানির ডাক। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টার মানুষ—জানে, এই লোকের কাছে প্রাইভেট পড়লে টেস্টে পাশ হয়ে অন্ততপক্ষে ফাইন্যাল

পরীক্ষায় গিয়ে বসতে পারবে। সেই অবধি নিশ্চিন্ত, পরের ভাবনা পরে।

কাঁচা নর্দামার উপর কালভার্ট—চিত্তবাবুর বাসায় ঢোকবার পথ। নাকে কাপড় চেপে সেই কালভার্টের উপর মহিম বসে আছেন। রাত দুপুর হয়ে গেল—ব্যাপার কি! পড়ানোর পরে কোন আড্ডায় জমে গেলেন নাকি চিত্তবাবু?

কে?

অবশেষে দেখা পাওয়া গেল। মহিম বলেন, অনেকক্ষণ বসে আছি চিত্তবাবু।

চিত্তবাবু বলেন, ঘরে আসুন। ওখানে কি জন্যে বসে? বললেই দুয়োর খুলে দিত।

বসতে হবে না। সামান্য একটা কথা। কথাটা বলবার জন্য কখন থেকে পথ তাকিয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়ে যাবে।

ঢোক গিলে নিয়ে বলেন, নতুন রুটিনে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোন দোষঘাট হয়েছে বলুন। আপনি যখন যে ক্লাসে দিয়েছেন, কোন দিন তো আপত্তি করি নি। বলুন, করেছি কি না।

প্রবীণ শিক্ষক রাত দুপুরে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এমনি করছেন, চিত্ত গুপ্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। বলেন, আমি কি করব বলুন। আমার হাতে কিছু নেই। কাকে কোন ক্লাস দিতে হবে, হেডমাস্টার সমস্ত বলে দেন, আমি জুড়ে-গেঁথে দিই এই মাত্র।

মহিম হাহাকার করে ওঠেন: অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছি। ফিফথ ক্লাসের উপরে পড়াবার বিদ্যে কি নেই আমার? বলুন।

বিদ্যে নিয়ে কথা নয়। পড়ানো চায় না তো ইস্কুলে। মুশকিল কি জানেন—আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না মোটে। ফিফথ ক্লাসেও তো গণ্ডগোল—হেডমাস্টারের কাছে হরবখত রিপোর্ট এসে যাচ্ছে।

চোখে ঠাহর করতে পারি নে, ছানি পড়েছে। চোখ ভাল থাকলে

দেখে নিতাম বিচ্ছুগুলোকে। আগে হয়েছে এমন? এই শীতকালে ছানি কাটিয়ে ফেলব। আমায় মারবেন না চিত্তবাবু।

খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন। বলেন, সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছি। একটা টুইশানি জোটে না। গার্জেন খবর নেয় কোন ক্লাসের মাস্টার। ফিফথ ক্লাসের মাস্টারকে কে ডাকে বলুন, ক'টাকাই বা দেয়? একটা-ছুটো উঁচু ক্লাসে নেহাত বুড়ি ছুঁইয়ে রাখুন—লোককে যাতে বলতে পারি।

চিত্তবাবু হাত এড়াবার জন্যই বললেন, আচ্ছা, এবারে যা হবার হয়ে গেছে। দেখা যাক, আসছে-বছরের রুটিনে কি করতে পারি।

আসছে-বছর লাগাত ধূলিসাৎ হয়ে যাব চিত্তবাবু। বউ মরেছে, ছেলেমেয়ে ক'টাও না খেয়ে মরবে। রুটিনে না হল, বেঁটেখাতায় মাঝে মাঝে মারুন। আপনার ছুটো-একটা ক্লাসে দিয়ে দেখুন না। আগে যেমন দিতেন।

কী করেন চিত্তবাবু! বাড়ি বয়ে এসে পড়েছেন। রাজি হতে হল।

সেই শুভক্ষণ এল দিন চারেক পরে। বেঁটেখাতার মারফতে উঁচু ক্লাসে। চিত্তবাবুরই অঙ্কের ক্লাস। এমন-কিছু উঁচু নয়—থার্ড ক্লাস বি-সেকসন। মহিমের কাছে তাই আজ এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা। ফিফথ ক্লাসের ছু-ছুটো ধাপ উপরে। ভাল কাজ হলে আবার গিয়ে খোশামুদি করবেন আর এক ধাপ উপরে তুলতে। ছেলেরা জানবে, হাঁ, উঁচু মাস্টার বটে!

মাস্টারির প্রথম দিন এই থার্ড ক্লাসেই অঙ্ক কষিয়েছিলেন মহিম। বজ্জাত ছেলেগুলো অঙ্ক কষার কায়দা দেখে মোহিত হয়ে গেল। একটা পিরিয়ডের ভিতরেই রণ-বিজয়। আজকে কিন্তু জুত হচ্ছে না সেদিনের মতো। কাল বদলেছে, বয়স বেড়ে গেছে। ছেলেদের

দোষ কি—ক'টা দাঁত পড়ে গেছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যায়। তারা কথা বুঝতে পারে না।

আবার বলুন সার—

গলায় যত জোর আছে, সর্বশক্তিতে মহিম পড়াচ্ছেন। চোখ এত খারাপ হয়েছে—কী সর্বনাশ! ব্লাকবোর্ডের মোটা মোটা লেখাও ঝাপসা।

আলজাব্রার বই বদল হয়ে গেছে, এ নতুন বইয়ের ভিন্ন পাতায় আলাদা রকমের অঙ্ক। পাতা না খুলে আগের দিনের মতন মুখস্থ বলে যাবেন, সে উপায় নেই। পাতা খুলেও তো বলতে পারেন না, না পড়তে পারলে কি বলবেন?

বেঞ্চিতে বসা সারি সারি ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন। ছাত্র নয়, নিষ্ঠুর বিচারক। মুখ তাদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না—কিন্তু এটা জানেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মহিমের অঙ্ক কষার দিকে। দেখেশুনে রায় দেবে। কী ছাই কষবেন তিনি—এটা-ওটা লিখে সময় কাটানো, ঘণ্টা কাবার করে দেওয়া। মহিমের পা দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে, ঘাম ফুটেছে সর্বাঙ্গে।

মিউ—

মহিম আগুন হলেন: বেরাল ডাকছ তোমরা? আমি মহিমা-রঞ্জন সেন, অঙ্কে অনার্স সহ গ্রজুয়েট—থার্ড ক্লাসের এইটুকু-টুকু ছেলে ইয়ার্কি করছ আমার সঙ্গে? মূর্খস্য মূর্খ, তোমরা বুঝবে কি—তোমাদের বাপ-দাদাদের জিজ্ঞাসা কোরো মহিম-মাস্টারের কথা। আমি যে কায়দায় অঙ্ক কষে দেব, খোদ নিউটন তা পারবেন না। আমি যে অঙ্ক দাগ দিয়ে দেব, য়্যুনিভার্সিটি থেকে বাপের ঠাকুর বলে ঠিক সেই ক'টা অঙ্ক কোয়েশ্চেন-পেপারে বসিয়ে দেবে।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে। কী সব দিন গিয়েছে! থার্ড ক্লাসে এসে হিমসিম খাচ্ছেন, আর ফার্স্ট ক্লাসে সেকসনের পর সেকসনে রাজচক্রবর্তীর মতো পড়িয়ে ফিরেছেন একদিন।

বাঘা বাঘা মাস্টার অনুপস্থিত—চিত্তবাবু বলছেন, যাবেন নাকি মহিমবাবু ?

বললে কেন যাব না ?

জিওগ্রাফি কিন্তু—

হবে।

রুটিন দেখে সংশোধন করে চিত্তবাবু বলেন, উঁহু, ভুল হয়েছে। জিওগ্রাফি নয়, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন।

তা-ও হবে।

হেসে ফেলে চিত্তবাবু বলতেন, পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃতের ক্লাস হয় যদি ?

তা-ই পড়াব।

থার্ড ক্লাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—শুভব্রতের চেয়ে অনেক ছোট, বিড়াল ডাকে আজ সেই মানুষের ক্লাসে !

ছেলেরা কিন্তু বিড়াল ডাকে নি। সত্যি সত্যি এক বিড়ালছানা জানলা দিয়ে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দরোয়ান বিড়াল পোষে, তার ছা-বাচ্চা। ডাকছিল সত্যিকার বিড়ালেই—চোখে দেখেন না বলে মহিম ছেলেদের অকারণ গালিগালাজ করলেন।

আর, সেই জন্য পেয়ে বসল তারা।

মিউ-মিউ—

মহিম ক্ষেপে গেলেন। স্কেল নিয়ে ছুটোছুটি করছেন আওয়াজ আন্দাজ করে। এবারে ছেলেই ডাকছে। কিন্তু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে স্কেলের বাড়ি খাবে, এমন আহাম্মক ছেলে নয়।

মিউ-মিউ—মিউ-মিউ—

একজন থেকে চার-পাঁচটা জুটেছে। দিব্যি এক খেলা দাঁড়িয়ে গেছে—কানামাছি খেলার মতো। মহিম পাক দিচ্ছেন, তারা পলাপলি খেলছে। পাগলের মতো হয়ে মহিম শাপশাপান্ত করছেন: সর্বনাশ হবে বুঝলি, মুখে রক্ত উঠবে। বাড়ি গিয়ে সকলের মরা-মুখ দেখবি।

তখন আর একটা ছেলেও বাকি নেই, সারা ক্লাস জুড়ে চলেছে : মিউ-মিউ, মিউ-মিউ, মিউ-মিউ—

ছুটোছুটির ক্লান্তিতে অবশেষে মহিম ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

আর আসব না তোদের ক্লাসে। মাস্টারি আর করব না। গুখুরি করেছি এমন কাজে এসে। ছ্যা-ছ্যা, এ কি ভদ্রলোকের কাজ!

একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে, অন্যায় রাগ করছেন সার। ডাকছে বেরালই। বেরাল আপনার কোটের পকেটে। সেখান থেকে ডাকছে।

গলায় চাদর, গলাবন্ধ ঢিলে কোট গায়ে। মাস্টারির পোশাক —ডি-ডি-ডি যে রেওয়াজ রেখে গেছেন। কোটের পকেটের ভিতরে সত্যিই কখন বিড়ালছানা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ইস্কুল থেকে মহিম ট্রামে উঠলেন না। সকাল সকাল বাসায় এসে কি করবেন? কি কাজ? অকারণ পয়সা-খরচ শুধু। লজ্জাও করে ছেলেমেয়েদের কাছে হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। বড় হয়েছে তারা; ভাববে, বাবাকে কেউ ডাকে না আজকাল—বাতিল করে দিয়েছে। মহিম হেঁটে হেঁটে চললেন তাই। বলরাম মিত্তির লেনে রবীনকে অমনি সেরে যাবেন। অঢেল সময়, আস্তে আস্তে চলেছেন।

কী ভেবে ডাইনের গলিতে বাঁকলেন। পুরানো দিনের এক ছাত্রের বাড়ি। পাশ করার কোনই আশা ছিল না। পাশ করলে ছাত্রের বাপ নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁকে। ঢুকে গেলেন সোজা সেই বাড়িতে।

ভূপতিবাবু আছেন?

ভূপতি সবে অফিস থেকে ফিরেছেন। অবাক হয়ে বললেন, কি খবর মাস্টারমশায়?

আপনার ছোট ছেলে তো এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল। টিউটর রাখবেন না ?

রয়েছেন একজন।

দক্ষ লোক রাখুন মশায়। অমিয় পাশ করলে আপনি বলে রেখেছিলেন, মিহিরকেও পাশ করিয়ে দিতে হবে।

খবরাখবর না নিয়েছি, তা নয়। সহসা কণ্ঠে কোমল দরদের সুর এনে ভূপতি বললেন, শরীরটা আপনার বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে মহিমবাবু। কদ্দিন আর উঞ্ছবৃত্তি করবেন ? বিস্তর খেটেছেন, এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এসেছেন যখন, একটা মিষ্টি খেয়ে যান।

মিষ্টি খেয়ে ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে মহিম আবার হাঁটছেন। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো রাস্তায় রাস্তায়। এক দল ছেলে, রংবেরঙের জার্সি-পরা, খেলা করে ফিরছে মাঠের দিক থেকে। ছড়া কাটছে, মহিম শুনতে পেলেন—

মহিম সেনের চোখ কানা
পকেটে তার বিড়ালছানা।

দৃষ্টি নেই, চিনতে পারেন না ছেলেগুলোকে। থার্ড-বি'র গুণধর কেউ কেউ আছে, সন্দেহ নেই। ঘণ্টা তিন-চার আগেকার ব্যাপার— এর ভিতরেই ছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। ছোঁড়াগুলো স্বভাব-কবি দেখা যাচ্ছে, পদ্য গাঁথতে দেরি হয় না।

রবীনের পড়ানো শেষ করে বাসায় ফিরে এলে সুধা বললেন, সিঁদুর-কোটো এনেছ ?

সিঁদুর-কোটো কেন ? ও হ্যাঁ, তাই তো—

তারক করের ছেলে মন্মথর বিয়ে হয়ে গেছে পরশুদিন। বিয়ের দিন মহিম সুধাকে নিয়ে বেহালায় গিয়েছিলেন। বর-বিদায়ের পর তক্ষুণি আবার ফিরে আসতে হল। রূপালিকে নিয়ে মুশকিল, সে কার কাছে থাকে ? দিনমান আর অল্প সময় বলে দীপালির কাছে

রেখে গিয়েছিলেন, তাতেই দীপালি হিমসিম খেয়েছে। বউভাতে বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন। কাল বৃহস্পতিবার বউভাতের তারিখ বটে।

সুধা বলেন, ভুলে গিয়েছ? সকালবেলা তবে কিনতে হবে। আজকেও মন্মথ এসেছিল—দীপালি শুভো পুণ্য সবাই যাতে যায়। বলে দিলাম, বাচ্চা মেয়েটা রয়েছে, রাত্রে তো থাকতে পারব না। কাজের বাড়ি বাচ্চা নিয়ে যাওয়াও যায় না। দুপুরের পর গিয়ে রাত্রিবেলা আমরা ফিরে আসব। কাল তুমি সকাল সকাল ছুটি নিয়ে এস মহিম। রূপালি তোমার কাছে থাকবে।

মহিম বললেন, যাবই না কাল ইস্কুলে। ইস্কুলে যাওয়া কবে যে একেবারে বন্ধ হবে, তাই ভাবি।

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন রাত্রে মহিম চিলেকোঠায় ঘুমচ্ছেন। ঘুমের ভিতর মনে হয়, কে যেন ছায়ার মতো ঘুরঘুর করছে ঘরের মধ্যে। ছায়া যেন তাঁর শিয়রে এসে বসল।

কে, কে তুমি?

ছায়া তাঁর কপালে হাত বুলায়, মাথার স্বল্প চুল ক'টা কোমল আঙুলে চিরুনির মতন নাড়াচাড়া করে।

ঘুমস নি তুই দীপালি?

ঘুম হচ্ছিল না বাবা। ঘরের মধ্যে বড্ড গরম। ছাতে উঠে বেড়াচ্ছিলাম। দেখলাম, ঘুমের মধ্যে বড্ড এপাশ-ওপাশ করছ। হাত-পা টিপে দিই একটু?

সিঁড়ির দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। খুললি কি করে তুই?

কাঠি ঢুকিয়ে খোলা যায়। আমি পারি।

দীপালি পা টিপতে লাগল। মহিম-মাস্টারের মনটা কেমন করে

ওঠে। ক্লাসের ছেলেরা নাস্তানাবুদ করেছে তাঁকে। ছড়া কেটে পথের উপরে অপমান করেছে। টুইশানির আশায় পুরানো ছাত্রের বাড়ি উপযাচক হয়ে গিয়ে মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলেন। কোন-কিছুই চোখে জল আনতে পারে নি। কিন্তু মা-মরা মেয়ে ঘুমের মধ্যে এসে পড়ে এই মমতা দেখাচ্ছে, অত্যাচারিত অসহায় একটি শিশুর মতন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করছে—মহিম-মাস্টারের চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে উঠল অতঃপর। পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল দীপালি। কী একটু ভাবল। বলে, কাল আমরা তো সব বেহালায় বউভাতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না বাবা?

বুড়োমানুষ, চোখে দেখতে পাই নে। আমি কোথা যাব কাজের বাড়ির ভিড়ের মধ্যে? বিয়ের দিন একবার তো দেখা দিয়ে এসেছি।

একা থাকবে বাসায়?

আমি আর রূপালি—একলা কিসে হল মা? সে-ই বা কতটুকু সময়! রাত্রিবেলা তোরা সব ফিরে আসছিস।

ক'দিন পরের কথা। বেঁটেবইটা চোখের কাছে নিয়ে মহিম ঠাহর করে দেখে নিচ্ছেন। দাশু খুব হাঁকডাক করছেন ওদিকে: মাস্টারের নামে ছড়া লেখে—কী আস্পর্ধা! ক্লাসের দেয়ালে লিখে রেখেছে। পায়খানায় লিখেছে। কাগজে লিখে নোটিশ-বোর্ডের উপর সেঁটে দিয়েছে। আমার হাতে নিস্তার পাবে না, ঠিক ধরে ফেলব। ধরতে পারলে রাস্টিকেট করা হবে ইস্কুল থেকে।

মহিমকে দেখেই যেন বেশি চেঁচাচ্ছেন। কথাগুলো সহানুভূতির, কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসি। অমন গগনভেদী চিৎকারের অর্থ: হেডমাস্টার চিত্তবাবু এবং মাস্টারদের কারো যদি নজর এড়িয়ে

থাকে, কানে শুনে নিন। এবং স্বচক্ষে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে আসুন লেখাগুলো নষ্ট হবার আগে।

একটা জায়গার লেখা মহিমকে ডেকে নিয়ে দেখাচ্ছেন : কী বাঁদর ছেলেপুলে মশায়! ধরে আগাপাস্তলা ঠেঙালে তবে রাগ মেটে।

মহিম আর পারেন না—তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, বাহাদুরি আমাদেরই দাশুবাবু। নর গড়তে বাঁদর গড়ি। বাহাদুর কারিগর আমরা। বিশ্বকর্মা কত বড় কারিগর, হাতপা-ঠুঁটো জগন্নাথের মূর্তি গড়ায় তা মালুম।

বলতে বলতে দ্রুত ক্লাসে চললেন। নাইন্থ ক্লাস—যার নিচে আর নেই। চিত্তবাবু লিসার মেরে এখানে দিয়েছেন। তাঁর দোষ নেই, জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহিমকে। প্রবীণ শিক্ষক বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঁচু ক্লাসের জন্য এত করে বললেন—কিন্তু উঁচু ক্লাসে পাঠিয়েও তো ফ্যাসাদ। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করতে হল : চারজন মাস্টার আসেন নি, থার্ড পিরিয়ডটা নিতে হবে মহিমবাবু। ফোর্থ-বি'র ইতিহাস কিংবা নাইন্থ-এ'র বাংলা—কোনটা দেব ?

নাইন্থ ক্লাস মশায়। আর নিচু থাকলে তাই আমি চেয়ে নিতাম।

নাইন্থ ক্লাসের নিতান্ত অবোধ শিশুগুলো। মহিমের কেমন যেন আক্রোশ—মনে মনে বলছেন, দাঁড়াও না বাছাধনেরা, ক'টা বছর সবুর কর। কী মাল বানিয়ে দিই বুঝবেন তোমাদের গার্জেন। বুঝবে তোমরা বড় হয়ে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বই খুলে ফেল। গোড়া থেকে দশ পৃষ্ঠা খাতায় লেখ। ধরে ধরে লিখবি—বানান ভুল না হয়, লাইন না বাঁকে। মেরে ভূত ভাগাব তা হলে।

নিশ্চিত জানা আছে, চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে দশ পৃষ্ঠা কি তার অর্ধেক পাঁচ পৃষ্ঠাও লেখা হবে না। রামকিঙ্করবাবুর কাছে সেই প্রথম দিনের শিক্ষা। পুণ্যাত্মা শিক্ষক স্বর্গলাভ করেছেন। মহিম-মাস্টার নিশ্চিন্তে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিলেন, চোখ বুঁজলেন।

কিন্তু হবার জো আছে! বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে এসে হাজির। হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন।

জ্বালাতন! ঘণ্টার পরে গেলে চলত না? ক্লাস ছেড়ে গেলে কাজকর্ম হয়! আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্ছি।

বেজার মুখে উঠে ছেলেদের বললেন, বসে বসে লেখ। জায়গা ছেড়ে উঠেছিস কি মুখে একটা কথা বেরিয়েছে—পিটিয়ে তক্তা করব ফিরে এসে।

হেডমাস্টারের কামরায় এসে মহিম দেখলেন, সাতু ঘোষ অপেক্ষা করছেন। হেডমাস্টারের ডাক তাঁর গরজেই। সাতু রেগে আগুন হয়ে আছেন। বলেন, এখানে নয়—এখানে কথাবার্তা হবে না। বাইরে এস।

সজোরে মহিমের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চললেন।

অলক লিখেছে, পড়। এলাহাবাদ ডাকঘরের ছাপ—শয়তান-শয়তানী এলাহাবাদ অবধি পৌঁছে গেছে। ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, ভাবনায় পড়েছিলাম। এ চিঠির পরে ভাবনা-চিন্তা থাকল না।

একটা খামের চিঠি মহিমের হাতে দিলেন। তিক্তকণ্ঠে বললেন, কী ডাকিনী মেয়ে তোমার! ছি-ছি-ছি, ভদ্রলোকের মেয়ে এমনধারা হয়! আমার একমাত্র ছেলে—বিয়ে দেব বললে কত বড় বড় জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসত। সমস্ত বরবাদ করল। ঘন ঘন যাতায়াত তোমার বাসায়, মাস্টার বলতে ভক্তিতে গদগদ—ষড়যন্ত্র অনেক দিন ধরে চলছে, কেমন?

বলে সাতু ঘোষ এমনভাবে তাকালেন, মহিমও যেন সেই ষড়যন্ত্রের ভিতর।

মহিম বললেন, দীপালির ভাগ্য খারাপ, তাই সে এক গাছমুখ্যু বাঁদরের ধাপ্পায় ভুলে গেল। আমি মামলা করব। আপনার ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

বেহালায় তারক করের বাড়ির বউভাতে গিয়েছিল, অন্য সকলে রাত্রে চলে এল, দীপালি রয়ে গেল সেখানে। নতুন বউ দীপালির সমবয়সি—বাড়ির মধ্যে একজন সঙ্গিনী পেলে বউয়ের ভাল লাগবে। এই সমস্ত ভেবে তারকই বলেছিলেন কয়েকটা দিন থাকবার জন্য। সুধা তাকে রেখে এসেছেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে বউ বাপের বাড়ি গেলে দীপালি ফিরে আসবে তখন। কিন্তু আর সে ফিরছে না, অলকের চিঠি পড়ে বোঝা গেল। কালীঘাটের মন্দিরে গোপনে মালা-বদল হয়ে গেছে, দু-জনে এখন পশ্চিমে চলল। ষড়যন্ত্র তো বটেই—অনেক দিন ধরে চলেছে ওদের সলাপরামর্শ।

মহিম ক্লাসে ফিরে গেলেন সাতু ঘোষের সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে। গিয়ে চেয়ারের উপর ঝিম হয়ে বসে রইলেন। ছেলেরা স্তব্ধ। হাত নেড়ে একটি ছেলেকে কাছে ডেকে হেড-মাস্টারের নামে এক টুকরা কাগজে লিখে পাঠালেন : মাথা ধরেছে, বাড়ি চললাম।

ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহিম বেরিয়ে গেলেন, হেডমাস্টারের হুকুম আসবার অপেক্ষা করলেন না।

অসময়ে বাসায় চলে এলেন। সুধাকে ডাকলেন : শুনেছ দিদি ? দীপালি জলে ডুবে মরেছে। তারক-দার বেহালার বাড়ি থেকে।

বল কি ?

জলও নয়। পচা পাঁক।

হাতের মুঠোর মধ্যে পাকানো অলকের চিঠি। চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে আর কিছু না বলে মহিম গম্ভীরভাবে ছাতে উঠে গেলেন। সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। ছাতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পায়চারি করছেন অবিরত। মাথা ধরার নাম করে ইস্কুল থেকে এসেছেন—সত্যিই এখন মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শুয়ে পড়লেন চিলেকোঠায় গিয়ে।

শান্ত হয়েছেন এতক্ষণে একটু, ভাবতে পারছেন। মায়ামমতা,

সেবাযত্ন, পুরানো কালের নীতিনিয়ম সমস্ত বুঝি বাতিল এখন—শুধুমাত্র অভিনয়ের বস্তু ! হিমযুগের সঙ্গে ম্যামথের যেমন বিলয় ?

ভাবছেন, বেশ হয়েছে, ভালই তো হয়েছে। নিখরচায় কন্যাদায় কেটে গেল। যা-কিছু সঞ্চয় শুভব্রতের কাজে লাগুক। আসছে-বার সে ফাইন্যাল দেবে। ভাল ছেলে, ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। ভাল ভাবে পাশ করবে, সন্দেহ নেই। স্কলারশিপও পেতে পারে। তারপরে ডাক্তারি পড়াবেন, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেবেন তাকে। সরসীবালার বড় ইচ্ছা ছিল, মাস্টারের ছেলে মাস্টার না হয়ে দশজনের একজন হয় যেন। ক্যাম্বেলে ঢোকাবার তোড়জোড় এখন থেকেই শুরু করবেন। তদ্বিরের জোর ছাড়া জগতে কিছু হয় না। কত ছাত্র কত দিকে আজ কৃতী হয়েছে, তাদের সাহায্য নিয়ে শুভোকে নিশ্চয় ঢোকানো যাবে। দেরি নয়, কাল-পরশু থেকে খোঁজখবর নিতে থাকবেন।

পাশবালিশটা কোলে টেনে নিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখেন তূলোর ভিতরে। জোড়ের মুখে নজর পড়ে চমকে উঠলেন, নতুন সেলাই যেন সেখানে। সেলাই খুলে ফেলেন তাড়াতাড়ি, তূলো টেনে টেনে বাইরে ফেলেন। ব্যাঙ্কের গোলমাল শুনে আঠারখানা একশ টাকার নোট তুলে এনে রেখেছিলেন পাশ-বালিশের ভিতর। বারোটা বছর মাসের পর মাস ধরে জমানো। নোট-ভরা এই পাশবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন। দীপালি টের পেয়েছিল কেমন করে। রাত্রিবেলা ছাতে ঘুরঘুর করে বেড়ানো, বাপের পা টেপা, মাথায় হাত বুলানো—সমস্ত এই জন্যে ?

খলখল করে আপন মনে হেসে উঠলেন মহিম। বরপণের টাকা নগদ আঁচলে বেঁধে তবে মেয়েটা বিদায় হয়েছে। দুহিতা কিনা—যথাসর্বস্ব দোহন করে নিয়ে দু-জনে পশ্চিম অঞ্চলে হনিমুনে বেরিয়ে পড়ল।

॥ পঁচিশ ॥

ঠিক এক বছর পরে।

মহিম আর ইস্কুলে যান না। পড়াবার ক্ষমতা নেই, অথর্ব হয়ে পড়েছেন। চাকরিটা ছাড়েন নি, লম্বা ছুটি নিয়ে আছেন।

শুভব্রত ইতিমধ্যে তিনটে লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করল। স্কলারশিপ অল্পের জন্য ফসকে গেছে। সেক্রেটারির কাছে মহিম হাঁটাহাঁটি লাগালেন : আমার এই অবস্থা, চালাতে পারছি নে সার। ছেলের একটা-কিছু করে দিন।

সেক্রেটারি বলেন, একেবারে ছেলেমানুষ যে! তার উপরে ভারতী ইনস্টিট্যুশনের নিয়ম হয়েছে, গ্রাজুয়েটের নিচে মাস্টার নেওয়া হবে না।

সে আমি জানি নে সার। সারা জীবন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরতে বলেন বুড়ো বয়সে ?

দয়াবান সেক্রেটারি, পুরানো শিক্ষককে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। চাকরি হল শুভব্রতের। ইস্কুলের থার্ড ক্লার্ক—ক্লাসে ক্লাসে মাইনে আদায় করার কাজ। এ ছাড়া সকালে আর বিকালে অ-আ পড়ানোর দুটো টুইশানি। পাঁচ টাকা করে দেয়। তার বেশি কে দিচ্ছে ? প্রাইভেটে আই. এ. পড়ছে শুভো। আই. এ. পাশ করুক, বি. এ. পাশ করুক। গ্রাজুয়েট হলে মাস্টার করে নেবেন, সেক্রেটারি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সানগরের পাকা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মহিম ইস্কুলের কাছাকাছি একখানা টিনের ঘরে আছেন। সুধা বেহালায় ভাসুরের বাড়ি উঠেছেন আবার। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, সাতু ঘোষের রাগ পড়ে গেছে, ছেলে-বউকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়েছেন। নিয়ে থাকেন নিয়েছেন, বড়লোকের ঘরের বউ দীপালি—মহিমের কেউ নয়।

ঝামেলা নেই কিছু এখন। বস্তির টিনের ঘরে দুই ছেলে আর বাচ্চা

মেয়ে রূপালিকে নিয়ে আছেন। রান্নাবান্না করেন মহিম নিজে। খেয়েদেয়ে শুভো বেরিয়ে যায়, তারপরে আর কাজকর্ম থাকে না—পুণ্যব্রতকে নিয়ে বসেন একটু-আধটু। নানান গণ্ডগোলে পুণ্যের এতদিন পড়াশুনো হয় নি। বড্ড পিছিয়ে আছে—প্রথম ভাগ শেষ করে সবে দ্বিতীয় ভাগ ধরল। বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

স্তিমিত দৃষ্টি বইয়ের উপর মেলে ধরে মহিম পড়াচ্ছেন—

সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।

[ঠিক, ঠিক! পরম সত্যবাদী সাতু ঘোষ। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট প্রভাত পালিতও বটে—চরিত্রচর্চার বক্তৃতা করে গিয়েই রেবেকার গৃহে মৃত্যুবরণ।]

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে, সকলে তোমাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না—

[তাই বটে! আমি মহিমারঞ্জন সেন বি. এ.—লেখাপড়ায় আলস্য করি নি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন সত্যপথ ধরে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে—থার্ড-বি'র বেড়াল-ডাকা ছেলেপুলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির।]

পড়াতে পড়াতে মহিম স্তব্ধ হলেন একমুহূর্ত। বলেন, বানান করে করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিস নে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা—

সূর্যবাবু এক কালে যেমন 'ভারতে ইংরাজ-শাসন' পড়াতেন। পড়িয়ে শেষটা বলে দিতেন, মুখস্থ করে রাখ, কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।

এই লেখকের

উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর

'গাঁয়ের ইস্কুলের নিভৃতে সুখবাবু পড়াতেন—আর ভারতী ইনস্টিট্যুশনে আড়ম্বরের পড়ানো কান পেতে শোন গিয়ে। ইস্কুল নয়, কারখানা একটা। মাস্টার নয়—মিস্ত্রি কারিগর। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে কাজ চলছে।'

শিক্ষা-জগৎ শিক্ষক-জীবনের গূঢ়তম উদ্ঘাটন। মহাজগৎ আবিষ্কারের মতোই বিচিত্র ও ভয়াবহ। মেকি সম্মানের বুলির আড়ালে কী লাঞ্ছনা শিক্ষিত মানুষদের! সর্বকালের স্মরণীয় উপন্যাস।

মানুষ নামক জন্তু

রোমান্স হাসিরহস্য-অমায়িকতা—সভ্যতার মাজাঘষা নানান চেহারা। সঙ্কট-মুহূর্তে হঠাৎ সমস্ত ঝরে পড়ে, মানুষ-জন্তুর আসল মূর্তি বেরোয়। হিংস্র আর স্বার্থান্ধ, বীভৎস আর পৈশাচিক। মহৎ শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক লেখনীতে কঠিন বিচিত্র চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন।

রক্তের বদলে রক্ত

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে লাহোর ও কলকাতায়। চিরকালের চেনা মানুষের একেবারে ভিন্ন রূপ। সেই রক্তাক্ত দিনের নৃশংস ছবি। কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি—মানুষ ভালো, মানুষ সুন্দর! বাজিকরের দড়ির উপর দিয়ে চলার মতো শক্তিধর লেখনীর সৃষ্টি এই অনন্য উপন্যাস।

ভুলি নাই

বাংলা দেশের রাজনীতির রুক্ষকঠিন শরীরেও যখন রোমান্টিক আদর্শবাদের একটি অপরূপ স্পর্শ লেগেছিল—সে হল অগ্নিযুগের কথা। সেই মহাযুগের মৃত্যুঞ্জয় সাধনাকে ভিত্তি করে একখানি অসাধারণ-গ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস।

সৈনিক

সৈনিক পান্নালাল। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাঙলায় কারামুক্ত হয়ে এক মুহূর্ত তার বিশ্রাম মিলল না। বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল সৈনিক। সৈনিককে ঘিরে যে সমাজ, যার জন্যে তার সংগ্রাম, কুশলী লেখকের কলম তাকে নিঃশঙ্কভাবে উদ্ঘাটিত করেছে।

আগষ্ট, ১৯৪২

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে '৪২-এর আগষ্ট-আন্দোলন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। সেই আন্দোলনের আবর্তে অগণিত জনগণের আত্মত্যাগপূত এই উপাখ্যান।

বাঁশের কেল্লা

বাঙলার বিপ্লব-ঐতিহ্য অতি-পুরানো। নীলবিদ্রোহ থেকে বিয়াল্লিশের অগ্নিক্ষরা বিপ্লব অবধি কাহিনীর পরিক্রমা। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে কবির বৃহত্তর সত্যদৃষ্টির মিলন ঘটেছে।

নবীন যাত্রা

গ্রামোন্নয়নে নামবার আগে গ্রামকে চিনতে হয়, চিনতে হয় গ্রামে-গ্রামে ছড়ানো দেশের রূপটিকে। বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শের সার্থক সাহিত্যায়ন। লেখকের বহুমুখী প্রতিভার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। 'সস্তা সাহিত্য সংস্থা' বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বৃষ্টি, বৃষ্টি

রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাত বাধল—ফলে সুস্থির থাকতে দিল না ইতিহাসের শান্তিকামী সাধককে। তারই সঙ্গে দুটি চরিত্রের নিভৃতচারী নিবিড় অনুরাগ। বহু চরিত্রের সমাগমে, বহুবিধ ঘটনার জটিলতায় অবশেষে কাহিনী মিলনের সমুদ্রসঙ্গমে এসে সুস্নাত শান্তি লাভ করল।

বকুল

জীবনের দেনা আর যৌবনের দাবি অমরেশ-জয়ন্তীর দাম্পত্য জীবনে যখন জটিল সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, অমরেশের প্রথমা স্ত্রীর শিশুপুত্র বকুলের সেই সময় অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। সমস্ত কাহিনীর মোড় ঘুরে গেল এই বকুলকে কেন্দ্র করে। কোথায় ছিল সে এতদিন!

এক বিহঙ্গী

আকাশচারী এক বিহঙ্গ যেন স্বপনপশারী সেই মেয়ে। সমস্ত দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে বিকশিত তার হৃদয়ের শতদল। তরুণ-তরুণীর মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী-গ্রন্থনে লেখক অনন্যসাধারণ। তারই স্মরণীয় উদাহরণ এক বিহঙ্গী।

জলজঙ্গল

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের হাসি-কান্না আর সংগ্রামের কাহিনী। মাটি জল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে এই উপন্যাসে। জল ও জঙ্গল—তারাও জীবন্ত মানুষের পাশাপাশি চরিত্র হয়ে ফুটেছে। এ হেন উপন্যাস শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের গৌরব।

শত্রুপক্ষের মেয়ে

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে দক্ষিণ-বাংলার নদীবহুল বসতি-বিরল অঞ্চলে উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের দিন তখনও যায় নি। তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে মরমী লেখক যে কাহিনী রচনা করেছেন তা রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর।

ওগো বধূ সুন্দরী

বসন্ত গান-পাগলা মানুষ। সংসারের বন্ধন এড়িয়ে যেতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কেমন করে ব্যর্থ হল, তারই কৌতুকস্নিগ্ধ মনোরম কাহিনী অনুপম দৃশ্য প্রচ্ছদপটে উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই।

সবুজ চিঠি

নাম, যশ, অর্থ এবং প্রতিপত্তি—এই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? দয়িতার প্রেম, সন্তানের মায়া, আপন গৃহের ছায়াছন্ন পরিবেশ—সব ছেড়ে গিয়ে খ্যাতির তপস্যায় জয়ী হয়েও তাই পুরুষসিংহের জীবনের দাব-দাহ মিটল না। মানব-মনের একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আশ্চর্য উন্মোচন ঘটেছে এই উপন্যাসে।

আমার ফাঁসি হল

পরম শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন—"আপনি একেবারে নূতন রকম একটি সৃষ্টি করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নব রসের মধ্যে ভয়ানক আর বীভৎস রস লেখকরা পরিহার করে থাকেন।...আপনার গল্পটির প্রধান অবলম্বন ভয়ানক রস, তার সঙ্গে জল আর জঙ্গলের পরিবেশও আছে। সব সুদ্ধ মিশে গল্পটি মোহময় রহস্যময় অদ্ভুত এবং চমৎকার হয়েছে।"

মনোজ বসুর গল্প-সংগ্রহ

মনোজ বসুর বিচিত্রমুখী ও লীলাকুশলী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় গল্পগুলিতে। গীতি-কবিতার মোহ ও রোমান্সরসের বর্ণবিচিত্র সমারোহের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণ ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবন-প্রজ্ঞা। তাই তাঁর কল্পদৃষ্টি যেমন **বনমর্মরের** নিগূঢ় রহস্যজিজ্ঞাসায় অধীর, তেমনি জীবনের ক্ষণদীপ্ত **খদ্যোত**-মুহূর্তগুলিরও তিনি নিপুণ ভাষ্যকার। 'বনমর্মর' ও 'খদ্যোত, পুরা দুইখানা বই ছাড়াও অতিরিক্ত গল্প 'স্বয়ম্বরা'। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা।

মায়াকন্যা

সর্বাধুনিক গল্পের বই। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মতো কয়েকটি ছত্রের স্বল্পায়তন গল্পে বিপুল ভাব-সমৃদ্ধি। আবার অতীন্দ্রীয় রহস্যলোকে কল্পনার স্বচ্ছন্দ-বিহরণ। বাংলা ছোট-গল্প আজ কত গভীর আর কত বিচিত্র, তার পরিচয় এই একখানা ছোট বইয়ে।

বনমর্মর

বাংলার মাঠ-নদী বন আর তার সঙ্গে একাত্ম মানুষগুলির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন থেকে তুলে নেওয়া কান্না-হাসি-বিরহ-মিলনের আলোছায়ায় স্নিগ্ধ-মধুর গল্পের সংকলন। রেখায়-রেখায় উন্মোচিত মানব-মনের নতুন দিগন্ত।

খদ্যোত

ছোট গল্প গল্পও হবে, ছোটও হবে -প্রমথ চৌধুরীর এই অভিমত আজ সর্বজনবিদিত। দুরূহ এই শিল্পকর্ম। বাহুল্যবর্জিত ঘটনা-পরম্পরায় একটি মূল চরিত্র কি একটি বিশেষ বক্তব্যকে নিষ্ঠাভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উলু

"ছোটখাটো ট্রাজেডি যাহা একটি অখ্যাত মানুষকে বা তাহার পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরে ঘটে তাহার রূপ আমাদিগকে অভিভূত করে। উলু এই রকম অভিভূত-করা ট্রাজেডি গল্প।"

দিল্লি অনেক দূর

স্বাধীনতা পেয়েছি— কত সাধ আর স্বপ্নের স্বাধীনতা! দিল্লি তবু অনেক দূরে রয়ে গেল এখনো। স্বাধীন জনগণের বেদনা-আনন্দ ও অবসাদ-প্রত্যাশার নানা কাহিনী। বাংলা গল্পের পরিক্রমা ক্ষেত্রবিশেষে নিরুদ্ধ নেই—এই গ্রন্থ তার বিস্ময়কর নিদর্শন।

দুঃখনিশার শেষে

অন্যের লেখার দু-এক ছত্র উদ্ধৃতি দিলেই হবে: শনিবারের চিঠি বলেন, বর্তমান গল্প-সংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল।' অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'

পৃথিবী কাদের

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন মেজাজের গল্পের সংকলন। অমৃতবাজার: 'It is a departure in the fiction literature of the Province'

কুঙ্কুম

বাইশটি অতি-ছোট এবং মাঝারি গল্পের এই সংকলনটি বিষয়-বৈচিত্র্যে শুধু নয়, পরিহাসস্নিগ্ধ প্রশান্ত শিল্পদৃষ্টির উদ্ভাসনেও বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। মানুষের অন্তর্জগতের বহুতর রহস্যের আশ্চর্য বাণীরূপ।

কিংশুক

শুধু মন-দেওয়া-নেওয়ার মিষ্টি উপাখ্যান নয়, তারই সমান্তরালভাবে তুলে ধরা হয়েছে তথাকথিত দেশনেতার ভণ্ডামির অবিকল চিত্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভাড়াটে সৈনিকের অন্তিম পরিণামের মর্মন্তুদ কাহিনী। বিচিত্র রসের স্মরণীয় চোদ্দটি অতি-ছোট ও মাঝারি গল্প।

নরবাঁধ

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুটি বড় গল্পের গ্রন্থন নরবাঁধ। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে মোহিতলাল: '...ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি, তিনি আর কিছুই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবি করিতে পারেন।'

দেবী কিশোরী

চেনা মানুষ আর তার চেনা কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি; প্রেম, স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ইত্যাদির মধ্যেই তাঁর শিল্পীমানসের ভিত্তি দৃঢ়মূল। 'দেবী কিশোরী'র গল্পগুচ্ছে এই সত্যেরই আলো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একদা নিশীথ-কালে

ন-টি সরস গল্পের সংকলন 'একদা নিশীথকালে'। এক শান্ত গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত কৌতুকস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য পরিহাসের আভায় উজ্জ্বল। এই গল্প ক'টিতে মনোজ বসুর শিল্পীসত্তার সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ের উন্মোচন ঘটেছে।

কাচের আকাশ

পরিবেশ রচনার অসামান্য দক্ষতায় এবং তার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে সজীব করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতায় এই লেখক প্রায় তুলনারহিত। প্রতিটি গল্পেই সংবেদনশীল কথাকারের মমতার স্পর্শ তথা মানবিক-বোধ অন্তর্লীন

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

বাছাই-করা কতকগুলি গল্পের সংকলন। এই একখানা বইয়ের ভিতরেই মনোজ বসুর আশ্চর্য সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখকের জীবন-কথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা।

ভ্রমণ-কথা

সোভিয়েতের দেশে দেশে

'মনোজ বাবুর সোবিয়েতের দেশে দেশে আমাদের মত গৃহকোণে আবদ্ধ জীবদের ভ্রমণের পিপাসা মেটায়, বৈঠকী গল্পের ক্ষুধা মেটায়, প্রচণ্ড বিতর্ক ও কৌতূহলের বস্তু সোবিয়েত দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়ে দেয়।...বুঝা যায় সোবিয়েত দেশ, অন্ধকার পাতালপুরীও নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার পেয়ে নতুন জগৎ ও জীবন নির্মাণরত একটি বিচিত্র ও বিপুল মানবগোষ্ঠী।' —স্বাধীনতা

চীন দেখে এলাম প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

১৯৫২-৫৪ তিন বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুস্তক হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার-প্রাপ্ত। 'ভ্রমণের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যের রসে স্নিগ্ধ করে নিয়েছেন; মাধুর্যময় ভঙ্গিতে তার একটা আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা সুন্দর, রসোত্তীর্ণ। লেখকের পরিহাস-রসোজ্জ্বল চিত্তের স্পর্শে তা আরও মাধুর্যময় হয়েছে।' —আনন্দবাজার

নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

'জর্মন আকাদেমি অব আর্টস' থেকে চার জন ভারতীয় লেখক নিমন্ত্রিত হন। লেখক সেই দলের একজন। বার্লিন শহর শুধু নয়, জর্মন দেশের অভ্যন্তরে হাজার হাজার মাইল তাঁরা ঘুরেছেন। ভারতের খুব কম লেখকই গেছেন সে-সব জায়গায়।

ইয়োরোপে না গিয়েও আপনি চোখের উপর যুদ্ধোত্তর ইউরোপ দেখতে পাবেন। শুধু মাত্র কলমের ছবি নয়, দুর্লভ ফটোচিত্রও অনেক।

পথ চলি

ডাঙার পথ, জলের পথ, আর আকাশ-পথ। নগণ্য গ্রাম-জীবন থেকে শুরু করে অর্ধেক দুনিয়া লেখকের পায়ের তলায়। কত মানুষ, কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যেন আসর সাজিয়ে বসে মনোরম ভঙ্গীতে বলে যাচ্ছেন।

নাটক

নূতন প্রভাত

পরাধীনতার পাপ যখন ভারতীয় জাতিচরিত্র কলুষিত করতে উদ্যত, তখনই যুগসঞ্চিত পুণ্যের ফলে যুবশক্তি জেগে উঠে অজ্ঞানতার কুয়াশা মোচন করে জাতির জাগরণ ঘটিয়েছিল। তেমনি একদল আলোকবাহী তরুণ-তরুণীর সংগ্রাম, দুঃখবরণ, আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের তীব্র নাটকীয় প্রতিফলন।

বিপর্যয়

হিরণ্ময় চৌধুরির বুদ্ধি ও মেধা ছিল অসাধারণ, আর ছিল অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিন্তু আর কিছু ছিলনা। না, ছিল—ছিল সুনাম। তাই সে বিক্রি করল। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মিলল। কিন্তু ততদিনে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে শান্তি ও আনন্দের সংসার। 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-সফল নাটক।

প্লাবন

নাট্যভারতী মঞ্চে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায় অত্যন্ত জনপ্রিয়, নাটক। একটা বিরাট এবং ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নাটকের চরম মুহূর্ত নিহত; "প্রজাবন্ধু" শেখরনাথের খুন হওয়ার দৃশ্য থেকে আরম্ভ করে প্লাবনের রাত্রে নীলাম্বরের পরিচয় প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্য রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় উত্তেজনায় সমৃদ্ধ।

শেষলগ্ন

বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলী কন্যার প্রতি সমাজের হৃদয়হীন অনুদারতা নিয়ে হাসি-অশ্রুর বিচিত্র টানাপোড়েন। বহুপঠিত 'উলু' গল্পের গৌরীর অশ্রুসজল ট্রাজেডি মননশীল কথাকারের উদ্ভাবন-বৈশিষ্ট্যে সুষ্ঠু মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রঙমহলে শতাধিক রজনী অভিনীত জনসমাদৃত নাটক।

বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

একটা হীন ষড়যন্ত্র থেকে অমিতাকে উদ্ধার করে নীলাদ্রি তাকে বাড়ি পৌঁছতে যাচ্ছিল। পথে মোটর-দুর্ঘটনায় পড়ে তারা দুজনে উঠল 'বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-হাউসে'। তারপর বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মধুর মিলন। মিষ্টি গল্পে মনোজ বসুর যে খ্যাতি প্রায় প্রবাদের মতো, এই লঘুছন্দ নাটকে তার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাখিবন্ধন

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরুদ্ধে রাখিবন্ধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে জেগে উঠেছিল একদা বাংলার যুব-সমাজ। মৃত্যুপণ সেই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা—তার রূপ কি সার্থক হয়ে উঠেছে আজকের এই দ্বিখণ্ডিত বাঙলায়? এই ট্রাজেডির সুর নাটকে অপূর্ব সূক্ষ্মতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

ডাকবাংলো

'বৃষ্টি, বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যকায়িত। স্টার থিয়েটারে বিপুল সমারোহে অভিনীত।